

কার্ল মার্কস

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

Karl Marx

a biography

by Sudhansu Ranjan Ghosh

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

জুন, ১৯৬০

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত, তুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অবলা প্রেস, ১।এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলকাতা-

ক্ষণিকের আলাপ ও করমর্দনেই
যিনি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার
অনেকখানি আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন,
উত্তর ভিয়েতনামের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক
ও অসমসাহসিক মুক্তিযোদ্ধা 'তো হাইকে'
এক শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত ভালবাসার সঙ্গে।

The mode of production in material life determines the general character of the social, political and spiritual processes of life. It is not the consciousness of men that determines their existence, but on the contrary, their social existence determines their consciousness.

Karl Marx ; Critique of Political Economy (1859)

Upon the several forms of property, upon the social conditions of existence, a whole superstructure is reared of various and peculiarly shaped things, illusions, habits of thought and conceptions of life.

Karl Marx : Eighteen Brumaine

কার্ল মার্কস এমনই একজন আলোক-সামান্য অমিতপ্রভব মহাপুরুষ যিনি ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রথম বজ্র-নির্ঘোষে ফেটে পড়েন দুনিয়ার শোষিত ও নিপীড়িত মানুষদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রবক্তা-রূপে যিনি প্রথম বলেন যতদিন কোন না কোন ভাবে শোষণ চলবে পৃথিবীতে তত-দিন শুরু হবে না মানবসভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস, ততদিন ভীষণভাবে শোচনীয় এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের মাঝে অসহায়ভাবে হাতড়ে বেড়াব গুমরে মরব আমরা সবাই। ততদিন ব্যর্থ রয়ে যাবে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের এই অপরিসীম সমারোহ আর অলীক সভ্যতার এই মিথ্যা ফাঁপা অহঙ্কার।

মনীষী মার্কসের চিন্তার আলোর এক অপ্রতিরোধ্য দ্যুতিবেগ আজও তাই সেই শোষণসিক্ত প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চলেছে, আলোকিত করে চলেছে পৃথিবীর প্রতিটি প্রত্যন্তসীমাকে। আজ পৃথিবীর কোন অংশে এমন কোন মানুষ নেই যিনি তাঁর পুঞ্জীভূত জ্ঞানের অহঙ্কার দিয়ে শক্তির অহঙ্কার দিয়ে পুরোপুরিভাবে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন মার্কসীয় চিন্তার সেই সংগ্রামী আলোকবন্যাকে।

মার্কসীয় প্রতিভার কালোত্তীর্ণ বিশালতাকে বিচার করিনি আমি এই বইখানিতে, তাঁর চিন্তা বা আদর্শের আলোর গতি-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে বসিনি আমি ; অকস্মাৎ চন্দ্রালোকবিদ্ধ কোন চকোরের মত উদ্‌ভ্রান্তপ্রাণ আমার অন্তরাত্মা শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে তাঁর প্রতি ॥

গ্রন্থ ঋণ ঃ

Karl Marx : Franz Mehring

Karl Marx : Otto Rheule (Translated by Caler Paul)

Karl Marx, his life and environment : Isaian Berli

Social and Political thought of Karl Marx : Avineri Shlomes

Karl Marx's Interpretation of history ; Bober, Mandell Morton

Theoretical System of Karl Marx ; Lanis Boudinanoff

What is Marxism ; Emile Burns

Karl Marx and British Labour movement : Henry Collins

The Logical influences of Hegel on Marx : Rebeca Cooper

Historical Materialism and Economics of Karl Marx ; Benedetts Croce

Marx as an Economist : Maurice Dobb

Marx's Concept of Man : Erich Fromm

Lectures on Marxist Philosophy ; David Guest

Marx and Hegel ; Guenther Hilmann

Marx, Proudhon and European Socialism John Hampden Jackson :

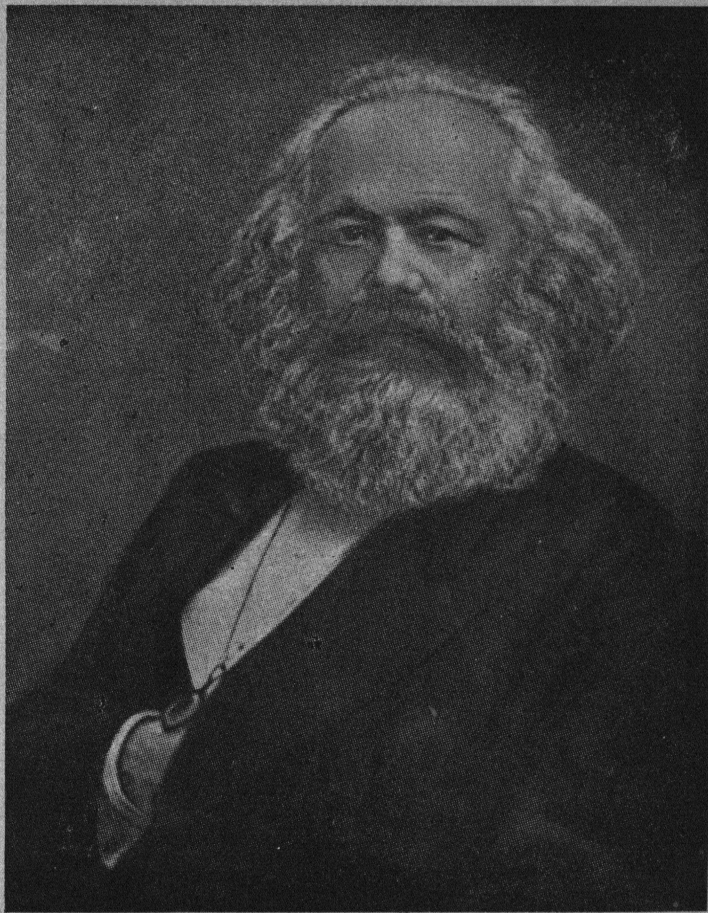
Dialectics The Logic of :Marxism : T. A. Jackson

Marxism, Past and Present ; Robert Nigel Carew

Karl Marx, Founder of Communism : Arnold Kettle

Karl Marx, Frederick Engels, Marxism : . Vladmir I'lich Lenin

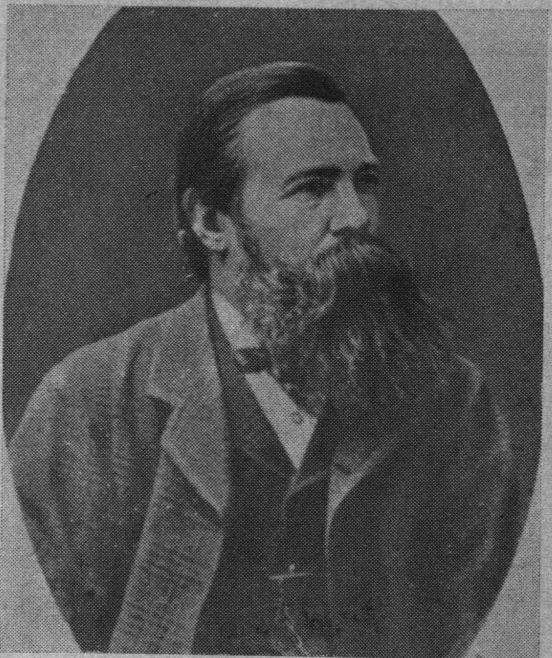
Karl Marx, Frederick Engels : V. I. Lenin
Fundamentals of Marxist Political Economy : Leontyer
Ethical Fond action of Marxism : Engene Kamenka
The life and teachings of Karl Marx ; Lewis John
Marxist Theory of Alienation : Istavan Messaros
Das Capital (Vol. II, & III) : Karl Marx
Selected Works of Marx and Engels : Moscow Publication
Karl Marx : Spargo John
Marxism and Communism : Katherine Sarage
Between Democritean and Epicusean Philosophy of Nature : Karl Marx
Marxist Economic Theory : Ernest Mandel



কার্ল মার্কস



পত্নী জেনি মার্কস



মার্কসের বন্ধু এঙ্গেলস

তখন উনিশ শতকের প্রথম পাদ।

বার বার ফরাসী আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত জার্মানীর রাইন প্রদেশে নেমে এসেছে এক প্রশান্ত স্তব্ধতা। দুরন্ত ঝড়ের প্রহারে জর্জরিত বনস্পতির মতো এক নিবিড় ক্লান্তির মধ্যে ঢলে পড়েছে সারা দেশটা। তবে স্বাভাবিক কাজকর্ম আবার শুরু হয়েছে। ক্ষেতে খামারে কিষাণ আর কলে কারখানায় মজুরেরা যেতে শুরু করেছে আবার আগের মতো।

শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই একটি উন্নত শিল্পাঞ্চল হিসাবে বেশ নাম করেছে তখন রাইন প্রদেশ। অনেক কয়লা ও লোহার খনি থাকায় নানা রকমের কল কারখানা গড়ে উঠেছে চারিদিকে। বেশী মুনাফার আশায় অনেক সামন্ত জমিদার পুঁজিবাদী শিল্পপতি হয়ে উঠেছে রাতারাতি।

নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর ভিয়েনা কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় ফরাসী অধিকৃত এই রাইন প্রদেশ চলে যায় প্রুশিয়া রাজ্যের মধ্যে। ফ্রেডারিক দ্বিতীয় উইলিয়ম তখন প্রুশিয়ার রাজা। গোটা জার্মানী দেশটাই তখন কতকগুলো সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত। এই সব সামন্ত রাজারা সারা দেশের মধ্যে নির্বিবাদে উড়িয়ে চলেছেন তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ধ্বজা। নির্মম পুলিসী অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে ফরাসী বিপ্লবের শেষ স্মৃতিচিহ্নগুলিকে মুছে দিতে চান তাঁরা। সাধারণ মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চান জোর করে। প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন এমনি একজন উদ্ধত আর অত্যাচারী সামন্ত রাজা। আর পাঁচজন সামন্ত রাজার মতো তিনিও তাই চেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের সব কণ্ঠকে নীরব করে দিয়েছিলেন তিনি। দেশের চিন্তাশীল জ্ঞানীগুণী লোকেরাও কোন কথা বলতে পারতেন না রাজশক্তির বিরুদ্ধে।

ফলে অনেক স্বাধীনচেতা জার্মান কবি সাহিত্যিক দেশ ছেড়ে ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড চলে গিয়েছিলেন।

রাইন প্রদেশের মধ্যে মোজেল নদীর ধারে ট্রিয়ের নামে ছোট্ট একটা প্রাচীন শহর আছে। শহর মানে তখন ছিল সেটা আধা শহর আধা গাঁ। আর তার বেশীর ভাগ লোকই ছিল সর্বহারা শ্রমজীবী। কলে কারখানায় কাজ করে কোন রকমে পেট চালাত। এই ট্রিয়ের শহরেই স্যামুয়েল হারসেল নামে একজন ইহুদী ভদ্রলোক ওকালতি করতেন। তাঁর স্ত্রী হেনরিয়েটা ফিলিপস ছিলেন হল্যাণ্ডবাসী হাঙ্গেরীয় ইহুদী। পরে তাঁরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নতুন নাম গ্রহণ করেন।

১৮১৮ সালের ৫ই মে দ্বিতীয় সন্তান এবং প্রথম পুত্রসন্তান জন্ম-গ্রহণ করল স্যামুয়েল পরিবারে। প্রথম সন্তান মেয়ে, নাম সোফিয়া। স্যামুয়েল তাঁর প্রথম পুত্রের নাম রাখলেন কার্ল। ১৮২৪ সালে অর্থাৎ কার্লের বয়স যখন মাত্র ছয় তখন সপরিবারে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন স্যামুয়েল। নতুন নাম ও পদবী গ্রহণ করলেন সঙ্গে সঙ্গে। স্যামুয়েল হারসেলের নতুন নাম হলো হেনরিখ মার্কস। বাবা মার সঙ্গে তাঁদের নতুন পারিবারিক পদবী গ্রহণ করলেন শিশু কার্ল।

হেনরিখের ধর্মান্তর প্রসঙ্গে অনেকে অনেক কথা বলতে থাকে সেদিন। কেউ কেউ বলে, নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর থেকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণের যে ঢেউ জেগে উঠেছে উৎপীড়িত ও সম্ভ্রান্ত ইহুদীদের মধ্যে সেই ঢেউয়েতেই গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন হেনরিখ। যুক্তিবাদী নেপোলিয়নের কাছে কোন জাতিভেদ ছিল না। তাঁর অধিকৃত সব রাজ্যের ইহুদীদের তিনি দিয়েছিলেন সমান নাগরিক অধিকার। তাঁর পতনের পর স্বাভাবিকভাবেই সে অধিকার হারিয়ে ফেলে ইহুদীরা।

আবার অনেকে বলতে থাকে ১৮২৬ সালে জার্মানীতে ইহুদী-বিরোধী আইন পাশের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হেনরিখের। আইন ব্যবসা। তখন থেকেই ধর্মত্যাগের কথা ভাবছিলেন হেনরিখ।

আবার কেউ বলে, এ দুটোর কোনটাই সত্যি নয়। আ., কথা, চিন্তা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল ইহুদীরা এবং খৃষ্টধর্মের মধ্যে মুক্তি ও মানবতাবোধের এক নতুন আস্বাদ পেয়েছিলেন, বলেই সংকীর্ণ জুডাবাদ ছেড়ে দিয়ে খৃষ্টীয় ধর্মমত গ্রহণ করেন হেনরিখ। নির্ভীক স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী হেনরিখ নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য তাঁকে ঘৃণা করতেন।

শুধু নেপোলিয়নকে নয়, প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিককেও ভাল চোখে দেখতেন না হেনরিখ। একদিন একটি ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন তিনি। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনের কথাও বলেন। ফলে পুলিসের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয় তাঁকে। কিন্তু জোর করে তাঁর কণ্ঠকে নীরব করে দিলেও তাঁর একটি উজ্জ্বল বিশ্বাসকে কেড়ে নিতে পারেনি কেউ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন হেনরিখ, মানুষের ইতিহাসে এক নতুন দিন এগিয়ে আসছে। সে দিন হচ্ছে অবাধ আর অফুরন্ত মুক্তির দিন। সমস্ত রকমের অত্যাচার হতে চিরদিনের মতো মুক্ত হবে সব মানুষ। সে মুক্তির অনিবারণীয় আলোর ছটা পেয়ে যত সব রাজশক্তি ও সামন্ত শক্তির দম্ভ আর অহমিকা অপসৃয়মান ভোরের অন্ধকারের মতই পালিয়ে যাবে নিঃশেষে।

সে যাই হোক, সেদিনকার জার্মানীর সমাজ জীবন বা হেনরিখের পারিবারিক জীবনের উপরতলায় মোটের উপর কোন অশান্তি বা উপদ্রব ছিল না। স্ত্রী হেনরিয়েটা লেখাপড়া না জানলেও বড় শান্তি-প্রিয় আর নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন। সুস্থ সবল ও সুগঠিত দেহটি তাঁর সব সময়ই ব্যস্ত থাকত ছেলেপুলে মানুষ করা আর ঘর সংসারের কাজে। একমাত্র টাকা রোজগার ছাড়া সংসারের আর কোন কিছু ভাবতে হত না হেনরিখকে।

সংসারের কথা ভাবতে হত না; কিন্তু আরও অনেক বড় ভাবনা ভাবতেন হেনরিখ। না ভেবে পারতেন না। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অথবা অবসর পেলেই ভাবতেন। ভাবতে ভাবতে দূর দিগন্তের পানে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতেন। তাঁর আপাতশান্ত আর সুখী জীবনের আড়াল থেকে একটি অশান্ত চঞ্চলতা প্রায়ই প্রবল ভাবে নাড়া দিত তাঁকে। এক দূরান্বিত প্রত্যয়ের সুবাসিত পিপাসায় মশগুল হয়ে উঠত তাঁর মনটা।

ট্রিয়েরে এক স্কুলে ভর্তি করা হলো শিশু কার্লকে। অল্প দিনের মধ্যেই পড়াশুনোয় বেশ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল। মাষ্টাররা বলল, অঙ্কে ছেলের মাথা আছে। কিন্তু অঙ্কে মাথা থাকলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাড়তে লাগল কার্লের। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিতে লাগল গরীব দুঃখীদের উপর এক মমতামেশানো আগ্রহ।

যতই দিন যেতে থাকে ততই ক্লাসের ছেলেদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন কার্ল। আবার অনেকে তাঁকে ভয়ও করত। কেউ তাঁর বিরোধিতা করলে তাঁর নামে হাসির কবিতা লিখে তাকে বিব্রত করে তুলতেন।

মার্কস পরিবারে ছেলে মেয়ের সংখ্যা আট। কার্ল হচ্ছেন দ্বিতীয় সন্তান। কিন্তু একমাত্র বড় বোন সোফিয়া ছাড়া অন্য কোন ভাই বোনের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না কার্লের। স্কুলের অন্য সব সহ-পাঠীদের সঙ্গেও কোন নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি তাঁর।

ছোট থেকেই কথা কম বলতেন কার্ল। কারো কথা বিশেষ শুনতেও চাইতেন না। একমাত্র বাড়িতে যখন তাঁর বাবা কোন কথা বলতেন তখন উৎকর্ণ হয়ে তা শুনতেন কার্ল। কারণ যখন যা কিছু বলতেন হেনরিখ বলেন গভীর আবেগ আর নিবিড় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে। ফলে তা শিশু কার্লের মনেও রেখাপাত করত গভীর ভাবে। একটা কথা প্রায়ই বলতেন হেনরিখ, এই যে দেখছ সমাজে মানুষে

মানুষে এত বৈষম্য এত বিভেদ তার মূলে রয়েছে মানুষের ধর্মীয় কু-সংস্কারের পীঠস্থান ক্যাথলিক চার্চ আর প্রতিক্রিয়াশীল রাজশক্তি ও সামন্ত শক্তি। কিন্তু ভয় নেই। সাধারণ মানুষের অগ্রগতির পথে এই সব বাধার অচলায়তন বেশী দিন থাকবে না। যুক্তিবাদের দুর্বার ঢেউ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। অল্পদিনের মধ্যেই দেখবে সে ঢেউ এই সব বাধাকে ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোথায়। তোমরা দেখে নিও এমন একদিন আসবেই যেদিন জাতি, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিগত কোন অসাম্য বা বৈষম্যই থাকবে না। সেদিন সব মানুষ হবে সমান।

এ সব কথা কার্লের মা হেনরিয়েটা বুঝতেন না। এসব কথার প্রতি কোন বুদ্ধিগত কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না তাঁর। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের এসব কথা শুনতে ভাল লাগত না। কিন্তু আর কারো ভাল না লাগলেও কার্লের লাগত। এসব কথার মানে বুঝতেন না কার্ল। তবু তা শুনতে ভাল লাগত। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাবার মুখপানে চেয়ে থাকতেন। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়তেন।

বাড়িতে আর একজনের কথা শুনতে ভাল লাগত কার্লের। তিনি অবশ্য বাড়ির কেউ নন। পাশের বাড়ির ফ্রয়ের লুডউইগ ওয়েষ্ট-ফ্যালেন। রক্তের সূত্রে ওয়েষ্টফ্যালেন আত্মীয় না হলেও তিনি হলেন মার্কস পরিবারের একজন পরম আত্মীয় ও চিরহিতৈষী।

ওয়েষ্টফ্যালেনও কার্লকে ভীষণ ভালবাসতেন। বাইরের বস্তুজগৎ সম্বন্ধে কার্লের তীব্র জ্ঞানগত কৌতূহল ও বুদ্ধিগত গ্রহণ ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যান ওয়েষ্টফ্যালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভাবশিষ্য করে নেন তাঁর। ওয়েষ্টফ্যালেন ছিলেন প্রুশীয় সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত সমাজের লোক। হেনরিখ ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু। কিন্তু কার্ল যত বড় হতে থাকেন, হেনরিখের থেকে কার্লই যেন বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকেন ওয়েষ্টফ্যালেনের।

সকালে বিকালে বেড়াতে যাবার সময় কার্লকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন ওয়েষ্টফ্যালেন। সমবয়সীর মত কথা বলতেন গল্প করতেন কার্লের সঙ্গে। কার্ল যে তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট সে কথা ভুলে যেতেন। কত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। গ্রীক নাট্যকারদের গল্প বলতেন। ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিক কাব্যে ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল ওয়েষ্টফ্যালেনের। একদিকে হোমার দান্তে সেকসপীয়ার, অন্যদিকে গেটে শীলার ও হলডারডিনের কবিতার অন্যান্য লাইন অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন।

কার্লও পথে পাশাপাশি পায়চারি করতে করতে সব শুনতেন। দুজনের মেলামেশা দেখে কারো মনে হত না বাল্যে ও বার্ধক্যে কোন পার্থক্য আছে। মনে হত বালক কার্ল উঠে এসেছেন বৃদ্ধ ওয়েষ্ট-ফ্যালেনের মনের সুউচ্চ স্তরটায় অথবা বৃদ্ধ ওয়েষ্টফ্যালেনই ছোট হয়ে নেমে এসেছেন বালক কার্লের ছোট্ট মনের সীমানাটায়।

স্কুলে একদিন কার্লের মৌখিক চিন্তাশক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যান শিক্ষকরা। একদিন ক্লাসে একটি রচনা লিখতে দেওয়া হয় ছেলেদের। রচনার বিষয়বস্তু ছিল, ছেলেরা কেমন করে তাদের ভবিষ্যতের পেশা ঠিক করে। রচনাটির নাম ছিল, Reflections of a youth upon choosing a profession.

কার্ল লিখলেন, মানুষ যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে এবং যে পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠে তার প্রভাব কাটিয়ে উঠে সে স্বাধীনভাবে কোন পেশা বেছে নিতে পারে না। এইজন্য দেখা যায় ডাক্তারের ছেলে প্রায়ই হয় ডাক্তার আর উকিলের ছেলে উকিল।

এমনি করে ষোলটা বছর কেটে গেল কার্লের। শৈশব ছেড়ে বাল্যে, ক্রমে বাল্য থেকে কৈশোরে পা দিলেন কার্ল। ট্রিয়ের হাই স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেল। হেনরিখের ইচ্ছা, আইন পড়ে কার্লও তাঁর মত আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করুক। তাই আইন পড়ার পরামর্শ দিলেন হেনরিখ।

সে পরামর্শ কার্লও মেনে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৩৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ক্লাসে ভর্তি হলেন। আইন পড়তে শুরু করলেও যে সাহিত্যপ্রীতি ওয়েষ্টফ্যালেন তাঁর মনে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন সে প্রীতি কমল না কিছুমাত্র। কার্ল আইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্লাসে গিয়ে সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতাও শুনতে লাগলেন। বিশেষ করে গ্রীক ও লাতিন কবিতা এবং আধুনিক শিল্পের উপর বক্তৃতাগুলি খুব মন দিয়ে শুনতেন।

তবে স্কুল জীবনের সেই গাম্ভীর্যের ভাবটা অনেকখানি কেটে গেল কার্লের। কলেজে আসার পর ছাত্রসংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কিছু কিছু কাজ করতেন। ছাত্রদের সঙ্গে হাসি খুশি ও আমোদ-আহ্লাদে যোগ দিতেন।

বনে মাত্র একটি বছর রইলেন কার্ল। তারপর চলে গেলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। নতুন পরিবেশে এসে এক নতুন জীবনের আস্বাদ পেলেন যেন কার্ল। ট্রিয়েরের মতো বনও এমন কিছু বড় শহর নয়। কোন বৈচিত্র্য বা বিশালতা নেই তার সমাজ জীবনে। অল্পদিনের মধ্যেই সব কিছু জানা হয়ে গেল তাঁর। তখন বড় একঘেঁয়ে নীরস ও বৈচিত্র্যহীন মনে হল তাঁর জীবন। তখনকার জার্মানীতে বিশেষ করে কোলোন ও ডাসেলডর্ফ শহরে শিল্পোন্নয়নের যে ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল, সে ঢেউ ট্রিয়েরে বা বন শহরে এসে আঘাত হানেনি তখনও।

কিন্তু বার্লিন হচ্ছে এদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ১৮৩৬ সালে বার্লিনে এসে কার্ল দেখলেন, বার্লিন হচ্ছে যেমন বিচিত্র তেমনি বিশাল। আধুনিক জনবহুল নাগরিক জীবনের অভিশাপ এবং আশীর্বাদ দুটোই অঙ্গে মেখে বড় হয়ে উঠেছে বার্লিন। বার্লিন একই সঙ্গে কুৎসিত, কপট এবং জ্ঞানকেন্দ্রিক। কার্ল দেখলেন, একই সঙ্গে একই সময়ে এই বার্লিন শহরের মধ্যে একদিকে সরকারী আমলাদের সহায়তায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি নিজেদের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য

চেষ্টা করে চলেছে, অন্যদিকে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবিরা সেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ফাঁদ থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য চিন্তা করছে।

বার্লিনে আসার কিছু দিনের মধ্যে বাড়ি গিয়ে জেনির সঙ্গে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলতে চাইলেন কার্ল। তাঁর থেকে প্রায় বছর চারেকের বড় হলেও বড় মিষ্টি মেয়ে ছিল জেনি। কার্লের ছেলেবেলার বন্ধু এবং দার্শনিক গুরু ওয়েষ্টফ্যালেনের মেয়ে জেনির জন্ম হয় ১৮১৪ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর পুরো নাম ছিল জোহান্না বার্থ জুলি জেনি ভন ওয়েষ্টফ্যালেন। কার্লের বড় বোন সোফিয়ার বান্ধবী জেনি প্রায়ই খেলা করতে আসত তাঁদের বাড়িতে। ছোটবেলায় কত খেলা করেছেন দুজনে। ক্রমে মেলামেশা থেকে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব ও পরে প্রণয়। দুজনে দুজনকে দেখে আসছেন এতদিন। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেননি ঠিক কখন এই ভালবাসা অজস্র সুবাসিত পাপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে তাদের হৃদয়ের নিভৃতে। বুঝতে পারলেন যখন তখন দেখলেন কেউ কাউকে ছেড়ে আর থাকতে পারছেন না। সহ্য করতে পারছেন না কেউ কারো অদর্শন।

তাই বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফেলতে চাইলেন দুজনেই। কিন্তু কারোরই বাবা মা জানেন না ব্যাপারটা। সোফিয়া কার্লকে একদিন বলল, বাবার মত করানোর ভার আমার উপর ছেড়ে দে। আর জেনির বাবা তোকে স্নেহ করেন, অমত করবেন না নিশ্চয়ই। আর কখনও করলেও বিশেষ কোন ফল হবে না। ও বড় কড়া মেয়ে। একবার যা করব বলবে তা করবেই। কেউ ওকে টলাতে পারবে না।

জেনির রূপের গুণে ট্রিয়ের শহরের প্রায় সব লোকই একরকম মুগ্ধ। এমন সুন্দরী সচরাচর দেখা যায় না। আবার দেহের দিক থেকে যেমন সুন্দর, মনের দিক থেকে একই সঙ্গে তেমনি সরল ও সুদৃঢ়।

বিয়েতে অমত করলেন না কার্লের বাবা। কিন্তু অভিজাত ওয়েষ্টফ্যালেন মত দিতে পারলেন না। তবে কার্লের বাবা হেনরিখ মার্কস শুধু একবার পরীক্ষা করলেন জেনিকে। একদিন ডেকে

বললেন কার্লকে, জান, ওর ভবিষ্যতের কোন কিছু ঠিক নেই, আইন পড়তে পড়তে সাহিত্য দর্শন পড়ে। আবার অঙ্কও ভাল জানে।

নীরবে মাথা নিচু করে রইলেন জেনি। অর্থাৎ একথা তিনি ভাল ভাবেই জানেন। কার্লকে জানতে তাঁর বাকি নেই।

জেনিকে আবার বললেন, কিন্তু এই অনিশ্চিত বিপজ্জনক ভবিষ্যতের সাথে চিরদিনের জন্য পা বাড়াবার আগে আর একবার ভাল করে ভেবে দেখবে।

এবারও মাথা নিচু করে নীরবে সম্মতি জানাল জেনি। এক অনমনীয় দৃঢ়তার মূর্ত-প্রতীকরূপে অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ হয়ে রইল তার মৌনগম্ভীর দেহটি।

পরে একদিন হেনরিখ ছেলেকে বললেন, সত্যিই মেয়ে বটে জেনি। বিশ্বের সেরা রাজপুত্র এলেও সে কোনদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না তোমার কাছ থেকে।

জেনির সঙ্গে বিয়ের কথা পাকা করে বার্লিনে আবার ফিরে এলেন কার্ল। কিন্তু বিয়ে এখন হবেনা। দুজনেই প্রতীক্ষা করলেন উপযুক্ত সুযোগ আর সময়ের। তখন তিনি মাত্র আঠারো বছরের ছাত্র। পড়া শেষ হতে এখনও অনেক দেরি। যাই হোক পড়াশুনা ঠিকই নিয়মিত করে যান। ধীরে ধীরে মিটিয়ে যান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর জ্ঞানগত কৌতূহল। তবে যতক্ষণ পড়াশুনোয় ব্যস্ত থাকেন ততক্ষণ বেশ ভাল থাকেন। কিন্তু অবসর সময়ে অর্থাৎ হাতে কোন কাজ না থাকলেই জেনির কথা মনে পড়ে। তখন একা একা নির্জনে পথ হাঁটতে থাকেন অথবা কোন ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসেন অথবা পাহাড়ে উঠতে থাকেন।

পাহাড়ে ওঠার একটা বাতিক ছিল কার্লের। জেনির মত মেয়েকে প্রণয়িনী হিসেবে লাভ করে জীবনে প্রথম লাভ করেছেন অনাস্বাদিতপূর্ব এক জয়ের গৌরব। কিন্তু আরও অনেক কিছু লাভ করতে হবে তাঁকে, অনেক উপরে তাঁকে উঠতে হবে। আকাশচুম্বী পাহাড়ের প্রস্তরকঠিন

আস্তত্ব আর অনমনায় স্তব্ধতা একথা নতুন করে মনে পড়িয়ে দিত কার্লকে।

এই সময় কিছু কবিতা লেখেন কার্ল মার্কস। তিনটি কবিতা সংকলন বার করে জেনিকে পাঠিয়ে দেন। বিরহের মধ্যে তাঁর প্রিয়তমার প্রতি তাঁর প্রেমের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে আরও নিবিড় করে উপলব্ধি করলেন যেন কার্ল।

এইভাবে একটি বছর কেটে যায় কার্লের। বছরের শেষে তাঁর মনের অবস্থা ও একটি বছরের অভিজ্ঞতার কথা বাবার কাছে একটি দীর্ঘ চিঠিতে জানালেন কার্ল। চিঠিখানি তিনি লেখেন ১৮৩৭ সালের ১০ই নভেম্বর।

প্রিয় বাবা, সব মানুষের জীবনেই এমন একটি সন্ধিক্ষণ আসে যখন তার জীবনের একটা দিক বন্ধ হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দিক খুলে যায়। আর ঠিক এই সময়েই মানুষ তার অতীত ও বর্তমানকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে। শুধু মানুষ নয়, মাঝে মাঝে ইতিহাসও এমনি করে পিছনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় সে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ইতিহাস পিছিয়ে যায় না, অলস আত্মচিন্তার আরাম কেদারায় গাটা এলিয়ে দিয়ে নতুন করে চলার পাথেয় সঞ্চয় করে শুধু।

মানুষ উপযুক্ত মনের অবস্থাতে পড়লেই কবিতা লিখতে শুরু করে। বাড়ি থেকে যখন বার্লিনে আসি তখন আমারও মনের অবস্থা ছিল ঠিক এইরকম। বাইরের যতসব মেলামেশা ছেড়ে দিয়ে ডুব দিলাম নির্জন আত্মচিন্তা আর পড়াশুনোর গভীরে। আমিও অনেক লিখেছি। জেনিকে পাঠিয়েও দিয়েছি। তবে একটা জিনিষ জানবেন, কবিতা আমার সব সময়ের সঙ্গী নয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ আসে, আবার চলে যায়, কবিতা মানে কামনার গান। যে কামনার কোন শেষ নেই, কোন সীমা নেই, সেই সর্বব্যাপী একই কামনা বহু বিচিত্র অনুভূতির

মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কবিতার মধ্যে মোহিনীরূপ ধারণ করে। কিছুক্ষণ কাছে থাকে আবার চলে যায়।

এখন আমি দর্শনের বই পড়ি এবং লেখার চেষ্টা করি। আমি এখন গভীরভাবে অনেক কিছু ভাবি। বিদেশী ভাষার কোন জিনিষ ভাল লাগলে তা অনুবাদ করি। আইন পড়তে গিয়ে আইনের দর্শনের কথাও ভাবি।

কিন্তু দর্শন পড়তে গিয়ে একটা জিনিষ খুব খারাপ লাগে বাবা। বস্তুর আসল অবস্থা কি সেকথা না ভেবে তার কি হওয়া উচিত তাই নিয়েই আদর্শবাদীরা মাথা ঘামায় বেশী। যাই হোক, আমি সমসাময়িক দার্শনিকদের লেখা এবং বিশেষ করে হেগেলের সব দর্শন পড়েছি। বার্লিনে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু রুডেনবার্গের তৎপরতায় আমি ডক্টরস্ ক্লাবের সভ্যও হয়েছি। কিন্তু কোন দর্শনেই আমি যা চাইছি তা খুঁজে পাচ্ছি না। মনে করছি দর্শন পড়া এবার থেকে ছেড়ে দেব; কিন্তু পারছি না।

জ্ঞানের জগতে সত্যের সন্ধান করতে গিয়ে শুধু নেতির জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম। এই সময় জেনির কোন খবর না পেয়ে আরও খারাপ লাগছিল।

সম্প্রতি একজন সহকারী বিচারপতির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আমার তৃতীয় বার্ষিক আইন পরীক্ষার পর তিনি আমায় বিচার বিভাগে যোগদান করার জন্য পরমার্শ দিলেন। প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগে কাজ করা আমিও ভাল বলেই মনে করি। আবার কেউ যদি ডক্টর অফ ল ডিগ্রীটা লাভ করতে পারে তাহলে সে অধ্যাপকের পদও পেয়ে যাবে। যাই হোক, এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে সামনা সামনি কথা বলতে চাই। তাছাড়া আপনার ও এডওয়ার্ডের অসুস্থতা, মায়ের উদ্বেগ প্রভৃতির খবর পেয়ে আমার কেবলি মনে হচ্ছে আর দেরি না করে আমার একবার এখনি বাড়ি যাওয়া দরকার।

জেনিকে দেখলে আমি সত্যিই খুব খুঁশি হব। কিন্তু তাই বলে

ভাববেন না, এটাই আমার বাড়ি যাওয়ার একমাত্র কারণ। কতকগুলি কর্তব্যের খাতিরেই বাড়ি যেতে চাইছি। জেনির চিঠি পেয়েছি। তার চিঠি আমি বারবার পড়েছি। তার লেখার ভঙ্গিমা সত্যিই ভাল। আর কোন মেয়েছেলের এমন লেখা কখনও পড়িনি। জেনিকে আমার ভালবাসা দেবেন। আমায় আপনি ক্ষমা করবেন বাবা। আমি বুঝতে পারছি, আমার হাতের লেখা এবং লেখার ভঙ্গিমা খুবই খারাপ হচ্ছে, কিন্তু কোন উপায় নেই। এখন ঘড়িতে বাজে ভোর চারটে। বাতি নিভে আসছে। রাত্রি জাগরণের অবসাদে ভারি হয়ে উঠেছে সারা দেহ। দু'চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে। আপনার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে না পারলে আমার দেহমনের এই অবসাদ ঘুচবে না বাবা। আমি শান্তি পাব না।

তখন প্রায় দিনই এমনি হত কার্লের। রাত্রির দিকে গভীরভাবে লেখাপড়ার কোন কাজ করতে গেলেই বিপরীতমুখী অজস্র চিন্তা জট পাকিয়ে উঠত মনে। সারারাতের মধ্যে সে জট আর খুলত না। ভাবতে ভাবতে রাত কেটে যেত। অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো ফুটে উঠত পূর্ব দিকে, পাখিরা কলরব করে উঠত সে আলোর ছটায়। ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসত জানালা দিয়ে। আর ঠিক তখনি কিছু ঘুম আর কিছু ক্লান্তির নিবিড়তায় তাঁর দেহটা ঢলে পড়ত পড়ার টেবিলের উপর।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্ল এত করে বাড়ি যেতে চাইলেও বাবা অনুমতি দিলেন না। ছেলের চিঠি পেয়ে তাঁর ধারণা হলো, কার্লের পড়াশুনা কিছুই এগোচ্ছে না। ক্লাসের বক্তৃতা বা পাঠ্যপুস্তকে তার মন নেই। নতুন নতুন তত্ত্বমূলক বই লেখায় সে মত্ত। কিন্তু কোনটাতেই লেগে থাকে না। সপ্তাখানেক ধরে কোন বই লিখে সে বই ছিড়ে ফেলে দিয়ে আবার নতুন বই লেখার পরিকল্পনা করে। তাছাড়া খরচপত্রেরও কোন হিসেব নেই কার্লের। খুব স্বচ্ছল ভাবে প্রচুর পরিমাণে খরচ করলেও যেখানে বড় জোর পাঁচশো থেলার দরকার হয় বছরে। কার্ল সেখানে খরচ করেন সাতশো থেলার।

বাবা বললেন, হবে নাই বা কেন, নতুন তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত ও সময়। দৈনন্দিন হিসেব নিকেশের দিকে তাকাবার মতো অবসর কোথায় তার?

অনেক ভাবনা চিন্তা করে হেনরিখ ছেলেকে লিখলেন, এখন বাড়ি আসা হবে নিছক বোকামি। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ক্লাসে যে সব পড়া হচ্ছে সেদিকে নজর দিচ্ছ না তুমি। কিন্তু মনে রাখবে এর জন্য প্রতিমাসে টাকা খরচ হয়, আমি চাই ছাত্র হিসেবে তোমার কর্তব্যের শালীনতা অন্তত তুমি বজায় রাখবে। আমি পরের কথায় কান দেবার মতো মানুষ নই। কিন্তু পরে কোন কথা বলার সুযোগ পায় এটা আমি চাই না। ইচ্ছা করলে তুমি ইষ্টারে বাড়ি আসতে পারো। তার দিন দশেক আগেও আসতে পারো কিন্তু এখন নয়।

বাবার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিমানে ফুলে উঠল কার্লের অন্তরটা। বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে দিলেন তিনি। এমন কি ইষ্টারেও গেলেন না। ইষ্টারে কার্ল বাড়ি না যাওয়ায় মা ব্যথা পেলেন। কিন্তু বাবা খুশি হলেন। কার্ল নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা দুঃখ পেয়েছে। সে দুঃখের মধ্য দিয়ে নিজের ভুল বুঝতে শিখুক। কার্ল মানুষ হোক। তাহলে তিনি মরেও সুখী হবেন।

ক্রমাগত রোগে ভুগে ভুগে দেহমন দুটোই দুর্বল হয়ে পড়েছিল হেনরিখের। ছেলেকে দেখতে ইচ্ছা করছিল। তবু আসতে লিখলেন না কার্লকে। তার পড়ার ক্ষতি হবে। তখন ১৮৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। পাঁচ সপ্তাহ ধরে শয্যাগত থাকার পর সবেমাত্র একটু ভাল হয়েছেন হেনরিখ। একটু একটু উঠে হাটতে পারছেন। কিন্তু হঠাৎ আবার লিভারের অসুখে পড়লেন। সে অসুখ আর সারল না হেনরিখের। বাবাকে একবার শেষ দেখা দেখতে আসাও হলো না কার্লের। তিন মাস অসুখে ভোগার পর ১০ই মে তারিখে মারা গেলেন হেনরিখ।

দুই

বাবার মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের মে মাস থেকে তিনটি বছর বার্লিনেই রয়ে গেলেন কার্ল। বার্লিনের সেই ডক্টরস্ ক্লাবেও যাওয়া আসা করতে লাগলেন। বার্লিনের যত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্কুল শিক্ষক ও লেখকরা মিলে গড়ে তুলেছিলেন এই ক্লাব। তাঁরা সবাই ছিলেন দার্শনিক হেগেলের শিষ্য।

এঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন কার্লের সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ। তাঁরা হলেন ব্রুনো বয়ার আর ফ্রেডারিক কোপেন। বয়ার ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার আর কোপেন ছিলেন কোন এক স্কুলের শিক্ষক। এই সময় একখানি বই লিখে কোপেন তা উৎসর্গ করেন কার্ল মার্কসকে।

বয়ার এবং কোপেন দুজনেই কার্লের থেকে বয়সে দশ বছরের বড় ছিলেন। কার্লের সঙ্গে তাঁদের মতের বড় মিল হত না সব সময়। তবু তাঁরা খুব ভালবাসতেন কার্লকে। কার্লের অসাধারণ বুদ্ধি ও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিশেষ ভাবে খুশি হতেন। এক শ্রদ্ধা-বিমিশ্রিত ভালবাসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আরও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ফেলতেন কার্লকে।

তাঁর পূর্ববর্তী আদর্শবাদী দার্শনিকদের থেকে হেগেলের মতবাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল। আগেকার আদর্শবাদীদের মতো বাস্তবকে একেবারে অস্বীকার করতেন না হেগেল। তবু হেগেলের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না কার্ল মার্কস। সব বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণের দ্বন্দ্বকেও প্রথম স্বীকার করেছিলেন হেগেল। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন এই সব দ্বন্দ্ব এক পরম ভাবচৈতন্যে বা 'এ্যাবস-লিউট আইডিয়ায়' লীন হয়ে যাবে একদিন। প্রতিটি বস্তুর অন্তর্নিহিত বিপরীত মুখী শক্তিগুলির দ্বন্দ্বই তাকে দান করে এক পরিবর্তনশীলতা,

গতিও তাকে নিয়ে যায় সেই সমন্বয়ধর্মী পরম মহাভাবরাজ্যের দিকে। হেগেল বলতেন, এই পরম ভাব বা এ্যাবসলিউট আইডিয়াটা হতেই বিশ্বের উৎপত্তি।

মার্কস দেখলেন, হেগেলের একটা বড় দোষ তিনি একই সঙ্গে গতি ও স্থিতিতে বিশ্বাস করেন। একই সঙ্গে হেগেল সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রচলিত বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করেন এবং বিশ্ব জগতের গতিশীলতায় বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রকে মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও নীতিবোধের সবচেয়ে পরিপূরক বলে মনে করতেন হেগেল। সে কালের জার্মান রাজতন্ত্রকে তিনি সমর্থন করতেন বলেই তাঁর দর্শন তখন জার্মানীর রাষ্ট্রদর্শনে পরিণত হয়েছিল।

তরুণ হেগেলপন্থীদের অনেকেই কিন্তু প্রচলিত ধর্ম সমাজ ও রাজনীতির বিরোধিতা শুরু করে দিলেন। মার্কস এসে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। ১৯৩৮ সালে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় জন্ম নিল 'হ্যালে জাহরবীচার' (Hallische Jahrbücher) বা জার্মান বার্ষিকী। রুখে ছিলেন এর সম্পাদক। স্ট্রাউস বয়ার ও কোপ্পেন প্রভৃতি বিদ্রোহী হেগেলপন্থীদের মত মার্কসও হয়ে উঠলেন র‍্যাডিকাল মতামত ও নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী।

স্ট্রাউস ও বয়ার দুজনেই খৃষ্টধর্মকে অবিশ্বাস করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন ঈশ্বর ও যীশুর লোকোত্তর মহিমাকে করলেন অস্বীকার। আর মার্কস মন দিলেন চূড়ান্ত বস্তুবাদের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নির্ণয়ে।

এদিকে আইন পড়া শেষ করে মার্কস তখন শুরু করে দিয়েছেন দর্শনশাস্ত্রে গবেষণার কাজ। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরিয়াসের দার্শনিক মতবাদের পার্থক্য।

ডিমোক্রিটাসের মতে পরমাণু থেকেই জগতের উৎপত্তি। জগতের সব বস্তুর মূলে রয়েছে পরমাণু। এই পরমাণু সব সময়েই গতিশীল।

তবে পরমাণুর এই গতিশীলতার পিছনে রয়েছে প্রকৃতিগত কারণ। মানুষের জীবনও পরমাণুর দ্বারা গঠিত। সুতরাং যে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক ঘটনা পরমাণুকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেই প্রকৃতি মানুষের জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করে। পরমাণুর মত মানুষেরও কোন স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

ডিমোক্রিটাস আরও বলেছেন, শূন্য থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না, আবার কোন কিছু একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়ে শূন্যে বিলীন হয়ে যায় না। এক অবস্থা হতে আর এক অবস্থায় বস্তুর রূপান্তর হয় শুধু। এইভাবে সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ধর্ম ও ঈশ্বরের মহিমাকে অস্বীকার করেছেন পরমানুবাদী ডিমোক্রিটাস।

ডিমোক্রিটাসের মত এপিকিউরাসও ধর্ম ও ঈশ্বরের মহিমাকে স্বীকার করেন না। এপিকিউরাস কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাসী। এপিকিউরাস বলতেন মানুষের জীবন কোন দেবতা বা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন আর সে তার এই স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তার জীবনকে পরিবর্তিত করতে পারে।

এপিকিউরাসের এই জীবনতত্ত্বকে মেনে নিলেন মার্কস। কারণ তিনিও বিশ্বাস করতেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে। ডিমো-ক্রিটাসের ধর্মনিরপেক্ষ সৃষ্টি ব্যাখ্যা তাঁর ভাল লাগলেও মানুষের ইচ্ছার অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারেনান মার্কস।

সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক হেগেলের শিষ্য লুডউইগ ছিলেন ডিমোক্রিটাসের মত ধর্মনিরপেক্ষ প্রকৃতিতত্ত্বে বিশ্বাসী। তিনি বলতেন ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেন‌নি, মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বরের উপরে মানুষের মহিমাকে স্থান দিলেন ফয়েরবাখ। তিনি দেখালেন আসলে মানুষের স্বাধীনভাবে কোন কিছু করা বা ভাবার ক্ষমতা নেই। তার ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই; প্রকৃতিই মানুষের জীবনকে আদিকাল থেকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনদিনই বিশ্বাস করতেন না মার্কস। তিনি তাঁর গবেষণা গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, যত সব দেবদেবী আছে তাদের সকলকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু ডিমোক্রিটাস বা ফয়েরবাকের প্রকৃতিতন্ত্রে বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। তিনি বললেন, প্রকৃতি মানুষের জীবনকে কিছুটা প্রভাবিত করলেও মানুষ প্রকৃতির প্রভাব চিরদিন মাথা পেতে নীরবে সহ্য করে আসেনি; নিজেদের সুবিধা মত প্রকৃতিকে বদলে তাকে নতুন রূপ দান করেছে।

ফয়েরবাকের আর একটা কথা মানতে পারেননি মার্কস। ফয়েরবাক মানুষকে সমাজ ও সমাজ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতেন। কিন্তু মার্কস বললেন, এ ধারনা সম্পূর্ণ ভুল। মানুষ হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ কোনদিন একা থাকতে পারে না, তাই তাকে সমাজ গড়ে তুলতে হয়। ধর্মের প্রতি মানুষের যে টান তা কখনই স্বাভাবিক নয়, সামাজিক।

পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীর জন্য যে গবেষণা গ্রন্থ লিখছিলেন মার্কস তার মুখবন্ধে ধর্মকে অস্বীকার করলেন; দর্শনকে খুব উঁচু আসন দিলেন মানুষের জীবনে। তিনি বললেন, দর্শনের কাজ শুধু জগৎকে ব্যাখ্যা করা নয়, জগতের পরিবর্তন করাও দর্শনের কাজ। ধর্ম বা ঈশ্বর নয়, দর্শন থেকেই মানুষ পাবে তার ভাগ্য পরিবর্তনের প্রেরণা, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লাভ করবে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। মানুষের মনোগত দার্শনিক চেতনা থেকেই জন্ম নেয় যত সব বিপ্লব আর বিদ্রোহ। দর্শন থেকে শক্তি লাভ করেই মানুষ তার প্রয়োজনমত জগৎ ও জীবনকে বদলে নেয়।

মার্কস আরও বললেন, দর্শন যেন গ্রীক পুরাণের সেই অভিশপ্ত দেবতা প্রমিথিয়াস যিনি মানুষকে ভালবেসে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে তাকে দিয়েছিলেন জ্ঞানের আলো।

থিসিস লেখার কাজ প্রায় একরকম শেষ হয়ে এল যখন তখন এক নূতন সমস্যায় পড়লেন মার্কস। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা তাঁর থিসিস

পরীক্ষা করবেন তাঁরা সকলেই তাঁর মতের বিরোধী। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে সুবিচার পাবার কোন আশা নেই। তাই শেষকালে বিশ্ববিদ্যালয় বদল করে চলে গেলেন বার্লিন থেকে জেনায়। সেখান থেকে স্নাতকোত্তর গবেষণার ডিপ্লোমা পেলেন ১৮৪১ সালে।

তিন

ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়ে খুশি হলেন মার্কস। দীর্ঘ দিনের শ্রম আর সাধনার ফল হাতের মুঠোর মধ্যে পেলে খুশি হবারই কথা। সে খুশির আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই বিষাদের কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো তাঁর মনে। অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো বড় রকমের একটি আশা। খৃষ্টধর্মের সমালোচনা করার জন্য চাকরি গেল ব্রুনো বয়ারের।

বড় আশা করেছিলেন মার্কস, ডিগ্রীটা লাভ করার পর চাকরি নেবেন বন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের র‍্যাডিকাল মতামত আরও তীব্রভাবে প্রকাশ করার জন্য একটি পত্রিকা বার করবেন দুজনে মিলে। বয়ারও বারবার এ বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে।

কিন্তু সে আশা তাঁদের আর পূরণ হলো না। মনের আশা মনেই রয়ে গেল। ব্রুনো বয়ারের শুধু চাকরি গেলনা বন বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কসের চাকরি হবারও কোন আশা রইল না। কারণ প্রচলিত ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির বিরুদ্ধে মার্কসের বিদ্রোহী মনোভাব বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে এর আগেই দেশের সরকার ও শিক্ষাবিদদের নজরে পড়েছে।

প্রথমে একটু দমে গেলেন মার্কস। কিভাবে কর্মজীবন শুরু করবেন তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। অবশেষে ঠিক করলেন সাংবাদিকতা করবেন। একাজে এর আগেই তাঁর ছাত্রজীবনে বেশ

কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। রুগের সম্পাদনায় 'হ্যালে জাহরবীচারে' নিয়মিত লিখলেন মার্কস। 'হ্যালে জাহরবীচার' তখন বন্ধ হয়ে গেলেও রাইনিশে সাইটুং বা রাইন গেজেট বেশ নাম করেছে। এই কাগজের সম্পাদনার ভার পেয়ে গেলেন মার্কস আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে জড়ো হলেন যত সব নব্য হেগেল পন্থীরা। এলেন ব্রুনো বয়ার, কোপ্পেন, ম্যাক্স ষ্টার্ণার আর হেস হ্বারহেস।

ধর্ম ও দর্শনের কথা ছেড়ে এবার রাজনীতি নিয়ে পড়লেন মার্কস। তীব্র ভাষায় সরকারী অব্যবস্থা, উৎপীড়ন আর দমননীতির প্রতিবাদ করতে লাগলেন তাঁর পত্রিকায়। বিশেষ করে স্থানীয় গরীব জনসাধারণের কতকগুলি অভাব অভিযোগের কথা জোরের সঙ্গে তুলে ধরেন মার্কস। মোজেল উপত্যকার গরীব আঙুরচাষী ও অরণ্যবাসী কাঠুরিয়াদের অধিকার আদায়ের জন্য নালিশ জানাল সরকারের কাছে। এর আগে গরীবদের সমস্যা নিয়ে এমন করে মাথা ঘামায়নি আর কোন লোক।

মার্কসের লেখাগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রুশিয় সরকারের। ফলে আরও কড়া হলো সরকারী সেন্সরশিপ। রাইন গেজেটের যত লেখা ছাপা হবার আগে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একজন বিশেষ সেন্সর নিযুক্ত হলেন। সাধারণ অনুমোদনের পর সেই সব লেখা প্রাদেশিক গভর্ণরের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু কিছুতেই মার্কসকে দমাতে পারল না সরকার। কৌশলে সরকারকে ফাঁকি দিয়ে তাঁর বক্তব্যগুলিকে প্রবন্ধের আকারে একের পর এক করে প্রকাশ করে যেতে লাগলেন মার্কস। একই সঙ্গে আক্রমণ করে যেতে লাগলেন দেশের সরকার, সামন্ত আর ধনিক সম্প্রদায়কে।

মার্কস বললেন, চাষীদের ইচ্ছামত জমি চাষ করে ফসল ফলাবার ও কাঠুরিয়াদের জঙ্গল থেকে কাঠ কাটবার অধিকার আছে। এ অধিকার তাঁদের জন্মগত। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী ধনী জমিদার সম্প্রদায়

নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইন পাশ করিয়ে নিয়েছে। এ বিষয়ে রাইনের গভর্ণরের সঙ্গেও অনেক তর্ক বিতর্ক করেন মার্কস।

এর আগে ড্রেসডেন থেকে রুগে ডয়েশ্চে ইয়ারবুখ নামে যে পত্রিকা বার করতেন সরকার তা বন্ধ করে দিয়েছে। এবার সবাই বলাবলি করতে লাগল, রাইন গেজেটের পরমায়ুও ফুরিয়ে এসেছে। মার্কস তবু দমলেন না। এতটুকু নম্র বা নরম করলেন না তাঁর লেখনীকে।

জ্ঞানরাজ্য থেকে কর্মরাজ্যে নেমে এসেছেন মার্কস। ভাবুক নির্জন দার্শনিক আসন পেতে নিয়েছেন জনচিত্তের মাঝখানে। এই সময় একটি কবিতায় মার্কস কর্মহীন দার্শনিক চিন্তার অসারতাকে উপহাস করে লেখেন,

কাণ্ট ও ফিকটে চেয়েছেন ইথারে ঘুরতে।
দূরান্বিত প্রত্যয়ের এক অজানা দেশের পথে পাড়ি দিয়েছেন তাঁরা।
আর আমি চেয়েছি শুধু বুঝতে, জীবনকে বুঝতে
আমি যে বোধি পেয়েছি রাজপথে।

জীবনকে বুঝতে হলে চিন্তার রাজ্য থেকে নেমে আসতে হবে ধূলি-ধূসরিত জন-জীবনের মাঝখানে। কিন্তু জীবনকে শুধু বুঝলেই চলবে না। সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্ধ লোক যে জীবনকে অবহেলা, অবজ্ঞা, শোষণ ও যন্ত্রণায় ক্ষয় করে দিচ্ছে তিলে তিলে, সেই জীবনকে মুক্ত করতে হবে। তাকে দিতে হবে উপযুক্ত মূল্য আর মর্যাদা। আর একটি কবিতায় লেখেন,

সাধ্য সীমার কোন পরোয়া না করে
সংঘাতকে সাথী করে শুধু এগিয়ে চল
ইচ্ছাশক্তিবর্জিত স্থবিরের মত
বেঁচে থাকা কখনো বেঁচে থাকা নয়।

১৮৪২ সালের সারা বছরটা খুব খারাপ গেল মার্কসের। পত্রিকা সম্পাদনায় অত্যন্ত পরিশ্রম হতে লাগল। জার্মান সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অবস্থার সমালোচনার জন্য অনেক নথীপত্র ও তথ্য সংগ্রহ

করতে হত। বহু শ্রমিক ও কৃষক বস্তীতে গিয়ে তাদের অভাব অভিযোগ শুনতে হত। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন মার্কস। এদিকে জেনির চিঠিতে জানতে পারেন, ব্যারণ ওয়েষ্টফ্যালেনও গুরুতর অসুখে ভুগছেন।

আভিজাত্যগর্বী ব্যারণ ওয়েষ্টফ্যালেন জেনির সঙ্গে তাঁর বিয়েতে আন্তরিক মত দিতে পারেননি; কিন্তু তা সত্বেও তাঁর অসুখের কথা শুনে মনটা খারাপ হলো মার্কসের। ছেলেবেলাকার সেই কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। শেষ বিকেলের ছায়াঘন ধূসর পথ ধরে পাশাপাশি দুজনে পথ হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে মোজেল নদীর ধার পর্যন্ত এগিয়ে যেতেন। দীর্ঘদেহী এক প্রৌঢ় পুরুষের উদাত্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত নির্জন নিস্তব্ধ পথে পথে। একটার পর একটা করে কবিতা আবৃত্তি করে যেতেন ওয়েষ্টফ্যালেন আর মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর মুখপানে চেয়ে থাকতেন শিশু মার্কস। সে কবিতার অর্থ বুঝতে না পারলেও সুললিত সেই সব কথার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিগাম্ভীর্য হতে একটা অস্পষ্ট অর্থ বেরিয়ে এসে এক সুমধুর সূক্ষ্মতায় জড়িয়ে ধরত মার্কসের মনটাকে। সে বন্ধন সে আকর্ষণের প্রবলতায় খেলার সাথীদের ভুলে যেতেন মার্কস।

জার্মান ও ইংরেজ কবিদের কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক নাটকের গল্পও বলতেন ওয়েষ্টফ্যালেন। মার্কস তাঁর গবেষণা গ্রন্থে গ্রীক নাট্যকার এসকাইলাসের যে বন্দী প্রমিথিয়াসের উল্লেখ করেন তার কথাও প্রথম বাল্যে ওয়েষ্টফ্যালেনের কাছ থেকেই প্রথম শোনেন! মানবপ্রেমিক বন্দী প্রমিথিয়াসের দুঃখ কষ্টের কথা শুনে বড় ব্যথা পেত মার্কসের শিশুহৃদয়। সে কথা ভুলতে পারেননি কোনদিন।

দেহে অসুস্থতার সঙ্গে অহোরহ মনে অশান্তি অনুভব করতে লাগলেন মার্কস। রাইন গেজেটের কর্তৃপক্ষ ও অংশীদারদের সঙ্গে ক্রমাগত মতবিরোধ হচ্ছিল। তাঁর সম্পাদনায় সরকার বিরোধী যে সুর

ক্রমশই তীব্র ও কঠোর হয়ে উঠছিল কর্তৃপক্ষ সে সুর নরম করতে বলেছিলেন মার্কসকে। তাঁরা ভয় করছিলেন, তা না করলে এ কাগজও বন্ধ করে দেবে সরকার। কিন্তু মার্কসের সেই এক কথা, আমি তা পারব না। সরকারের ভয়ে আমি আমার নীতি বা আদর্শ হতে এক তিল সরে যেতে পারব না। দরকার মনে করলে তোমরা অন্য সম্পাদক নিযুক্ত করো। আমি সরে যাচ্ছি।

কিন্তু কেউ তা স্পষ্ট করে তাতে মত দিতে পারলেন না।

এই বছরেই এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা হয় মার্কসের। এই দেখা মার্কসের জীবনে সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনা। এই ধরণের এক সংস্কারমুক্ত জ্ঞানী পণ্ডিত ও নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাকে বন্ধুরূপে পাবার কথা মনে মনে ভাবছিলেন মার্কস। এঙ্গেলসকে পেয়ে তাই অনেকখানি শান্তি পেলেন অন্তরে। দেহ মনের সব জ্বালা নিমেষে জুড়িয়ে গেল যেন নিঃশেষে।

রাইন গেজেটে ও অন্যান্য পত্রিকায় মার্কসের লেখা আগেই পড়েছিলেন এঙ্গেলস। মার্কসের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা অনেক আগেই হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সুযোগ ঘটেনি। এবার ইংলণ্ড যাবার পথে কোলোনে নেমে পড়লেন। নেমে সোজা রাইন গেজেটের অফিসে চলে গেলেন। সাক্ষাৎ ও আলাপ করলেন পত্রিকা সম্পাদক মার্কসের সঙ্গে। প্রথম আলাপেই বন্ধুত্ব জমে গেল। অনেক কথা হলো। জার্মানী, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনে শোষিত সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষকদের নবজাগ্রত শ্রেণীচেতনা আর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার-বোধকে দুজনেই শ্রদ্ধা জানালেন কথায় কথায়।

ইংলণ্ডের লায়ন্স কারখানার শ্রমিকদের যে আন্দোলন ১৮৩১ সাল থেকে ১৮৪২ সালে এসে চরম হয়ে ওঠে তার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। এ বিষয়ে দুজনেই একমত হলেন। সর্বহারাদের নবজাগ্রত শ্রেণীচেতনা ক্রমশই শ্রেণীসংগ্রামকে প্রকট করে তুলছে এবং তুলবে সারা ইউরোপে, এ বিষয়ে একমত হলেন দুজনে। কল-কারখানার মাধ্যমে ইউরোপের যে সব জায়গায় পুঁজিবাদ শক্তভাবে

শিকড় গেড়ে বেড়ে উঠছে, সেই সব জায়গায় শ্রমিকশোষণও বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। ফলে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ জমে উঠছে শ্রমিকদের মনে।

এঙ্গেলস বললেন, আমি এখন কিছুদিন ইংলণ্ডে থাকব। সেখানে গিয়ে চিঠি দেব। চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ হবে।

মার্কস বললেন, আপনিও আমাদের কাগজে লিখবেন। তবে এ পত্রিকা আর কতদিন থাকবে তা বলতে পারি না।

মার্কস আরও বললেন, এই কাগজের জন্য সত্যিই আমি অনেকখানি উপকৃত। কারণ এর সম্পাদনা করতে গিয়েই আমি প্রথম দর্শনের ভাবরাজ্য হতে বাস্তব কর্মজগতে নেমে আসি। গরীব চাষী ও মজুরদের হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাই। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে ভাল করে তলিয়ে দেখি।

পরবর্তীকালে রুশনেতা লেনিন মার্কস সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেন, এই সময়েই অর্থাৎ রাইন গেজেট সম্পাদনার সময়েই আদর্শের উচ্চচূড়া থেকে বস্তুবাদের সহজ মাটিতে নেমে আসেন মার্কস এবং বৈপ্লবিক গণতন্ত্রবাদ থেকে সাম্যবাদে দীক্ষিত হন। তিনি বললেন, Here we observe Marx's transition from idealism to materialism. and from revolutionary democratism to communism (V. I. Lenin Works 4th Russian edition, vol. 21, p. 63)

এর আগে মার্কস বস্তুবাদী চিন্তার আলোকে শুধু আদর্শবাদীদের সমালোচনা করে এসেছেন। আদর্শবাদীদের কথায় কথায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই বস্তুবাদের আলোকে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির মূল সূত্রগুলিকে বিচার করে দেখেননি।

কিন্তু এবার তা দেখতে লাগলেন মার্কস। দর্শনকে নামিয়ে নিয়ে এলেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে। তিনি বললেন, সাধারণ মানুষ কোন তত্ত্বকথার ধার ধারে না। কিন্তু সাধারণ জনগণ যখন দেখে কোন তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাদের

স্বার্থ আর জীবনসমস্যা সমাধানের সূত্র তখনই তারা তা বুঝতে পারে এবং সেইমত কাজ করে।

তিনি আরও বললেন, সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীই আনবে মানব সমাজের মুক্তি। সমাজে তারাই সংখ্যায় বেশী, শক্তির পরিমাণও তাদের বেশী। তাদের যে অমিত শ্রমশক্তি সব রকম উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োজিত ও নিঃশেষে ব্যয়িত সেই শ্রমশক্তিই মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক। অথচ তারাই সমাজে সবচেয়ে বঞ্চিত ও শোষিত। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই প্রগতিবাদী জীবনদর্শন ও বৈপ্লবিক আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করতে পারে।

জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে বস্তুবাদী প্রগতিশীল দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে সেই সম্পর্ক। মার্কস বললেন—

Philosophy finds its material weapon in the proletariat, so the proletarian finds its spiritual weapon in philosophy. (Karl Marks and F. Engels' works, vol I)

দুটোরই দরকার আছে সমাজ জীবনে। শ্রম আর দর্শন একে অন্যকে ভিত্তি করে গড়ে তুলবে এক আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন। নির্বিশেষ দর্শনচিন্তা সর্বহারা সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে খুঁজে পাবে বাস্তব প্রয়োগবিদ্যার অস্ত্র আর শ্রমিকশ্রেণী দর্শনের মধ্যে খুঁজে পাবে তাদের আত্মিক শক্তির উৎস।

মার্কস দেখালেন, প্রগতিবাদী দর্শনের একটা বিশেষ কর্তব্য আছে। যে দার্শনিক তত্ত্ব বা চিন্তা মানুষের সমাজ জীবনকে গতির প্রেরণা যোগায় তাই হচ্ছে প্রগতিবাদী দর্শন। এ দর্শন নীরস যুক্তিতর্কের জালের মধ্যে আবদ্ধ রাখে না নিজেকে ; গতিশীল সমাজ জীবনের দুরন্ত স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দেয়। আগেকার দর্শন ছিল মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল কারণ তা মানুষের বাস্তব জীবন সমস্যার কথা না ভেবে অলীক মনগড়া কতকগুলো সমস্যা নিয়ে শুধু মাথা ঘামাত।

তার মধ্যে ধর্মই ছিল প্রধান। মার্কস বললেন, স্বর্গের কথা ছেড়ে এবার মর্ত্যজীবনের কথা ভাবতে হবে দর্শনকে। ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা ছেড়ে তাকে আলোচনা করতে হবে প্রচলিত রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সমাজনীতির কথা। পরে হেগেলের অধিকারবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে এ বিষয়ে আরও অনেক কিছু বলেন মার্কস।

অবশেষে সেই বহু আশঙ্কিত দিনটি এসে গেল। সরকারী খড়্গের চরম আঘাত নেমে এল রাইন গেজেটের উপর। রাইন গেজেট বন্ধ করে দিল অত্যাচারী সরকার। রাইন গেজেটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জার্মান জনগণের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল একেবারে। সরকারী দমননীতির সমালোচনা বা প্রতিবাদ করার মত কোন মাধ্যম রইল না। সেদিন ছিল ১৮৪৩ সালের ১৯শে জানুয়ারি।

মার্কসের চাকরি গেল। কোলোন থেকে ট্রিয়েরে ফিরে গেলেন মার্কস। অনেক দিন পর বাড়ি ফিরে ভাল লাগল তাঁর। দেখলেন, মা ছাড়াও আর একটি হৃদয় নীরব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে আজও। সে হৃদয় আবাল্য সহচরী ও প্রণয়িনী জেনির।

এতদিন প্রবাসে থাকাকালে কর্মের উত্তাপে আর উদ্দীপনায় জেনির কথা ও তার গভীর অনুরাগের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন মার্কস। যে কথা এতদিন ভুলে ছিলেন আজ তা নতুন করে জেগে উঠল। লজ্জা দিল তাঁকে। জেনির কাছে ক্ষমা চাইলেন মার্কস। জেনির কিন্তু কোন অনুযোগ বা অভিমান নেই এ বিষয়ে। শুধু আজ নয়, কোনদিনই কোন ক্ষোভ নেই জেনির। সব সময়েই তাঁর হৃদয় আপন অফুরন্ত সম্পদের প্রাচুর্যে ও পরিপূর্ণতায় তরঙ্গহীন সমুদ্রের মতই প্রশান্ত। অভিযোগের কোন তরঙ্গাভিঘাত বা অভিমানের কোন ফেনিলতা নেই সে সমুদ্রে। বিক্ষুব্ধ অতৃপ্তির নেই কোন তরল উচ্ছ্বাস।

এবার আর কোন বাধা নেই। জেনিকে বিয়ে করলেন মার্কস। দীর্ঘ প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষার অবসানে মিলিত হলো দুটি মহান জীবন।

তখন মার্চ মাস শেষ হয়ে গিয়ে গ্রীষ্ম পড়তে শুরু করেছে। গ্রীষ্ম থেকে শরৎ পর্যন্ত রাইন প্রদেশের ক্রুয়েৎনাক নামে একটি জায়গায় রয়ে গেলেন মার্কস। জেনিও কাছে রইলেন।

কিন্তু জার্মানীতে থাকতে আর মন চাইছিল না মার্কসের। প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের দমননীতি যেখানে সবচেয়ে কঠোর, সেখানে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ কোথায়? সুতরাং সমস্ত কর্ম ও চিন্তাকে অপ্রতিবাদে স্তব্ধ করে রেখে সেখানে বসে থেকে কোন লাভ নেই। তাই কিছু দিন ধরে বিদেশে যাবার সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি।

তবু যতদিন যাবার সুযোগ না হয় ততদিন কিছু না করে থাকতে পারেন না মার্কস। এই সময় হেগেলের অধিকারবাদ কি ভাল করে পড়ে তার একটি সমালোচনা লেখেন। হেগেলের আদর্শবাদী দর্শনের ত্রুটিগুলি আগেই চোখে পড়েছিল তাঁর এবং লুডউইগ ফয়েরবাকের। এবার হেগেলের রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা করেন মার্কস এই রচনায়।

সমালোচনার প্রথমে মার্কস জানিয়ে দিলেন, প্রচলিত সব প্রথা ও সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করাই হলো প্রগতিবাদী দর্শনের কাজ। কারণ কোন প্রথা বা সামাজিক অবস্থা ও আদর্শ বেশীদিন চলতে থাকলে তা ক্রমশই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, বাধা সৃষ্টি করে মানুষের প্রগতির পথে।

তারপর তিনি দেখালেন, রাষ্ট্র সম্বন্ধে হেগেলের চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীল এবং আদর্শবাদী। এ বিষয়ে মার্কসই প্রথম কথা বললেন। এর আগে ফয়েরবাক একজন বস্তুবাদী দার্শনিক হিসাবে হেগেলের জগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কে হেগেলের চিন্তার সমালোচনা করেন। কিন্তু ইতিহাস ও সমাজব্যব স্থারব্যাখ্যায় তাঁর বস্তুবাদী চিন্তার পরিচয় দিতে পারেননি তিনি। একমাত্র মার্কসই প্রথম তাঁর বস্তুবাদী চিন্তা ও দর্শনকে মানব জীবন ও প্রকৃতি জীবনের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেন সার্থক ভাবে।

হেগেলের অধিকারবাদের সমালোচনা লিখতে গিয়ে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি তখন। পরে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির

সমালোচনার ভূমিকা লিখতে গিয়ে হেগেলের অধিকারবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতামতগুলিকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করেন।

মার্কস দেখালেন রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে হেগেলের মত ভ্রান্ত। শুধু হেগেলের নয় আগেকার সব দার্শনিকদের এ বিষয়ে চিন্তা ছিল যান্ত্রিকতাবাদ অথবা ভাববাদে ভরা। সমাজ ও রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসই প্রথমে করলেন বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রবর্তন।

এ সম্বন্ধে হেগেলের সমালোচনা করে মার্কস বললেন, কোন সমাজ বা রাষ্ট্র কখনও মানুষের মন বা ভাবধারার দ্বারা চালিত হয় না। সমাজ-জীবনের বাস্তব অবস্থা অর্থাৎ রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অবস্থা হতেই তার গতিপ্রকৃতি হয় নির্ধারিত।

তবে অবশ্য হেগেলের দর্শনের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতার উপাদান আছে তা গ্রহণ করলেন মার্কস। তবে তিনি দেখালেন হেগেলের এই দ্বান্দ্বিকতা দর্শন এক নতুন জিনিষ হলেও আসলে তা ভাববাদী; সে দ্বান্দ্বিকতার কোন সম্পর্ক নেই বস্তুবাদের সঙ্গে। অবশ্য আগেকার ভাববাদীদের সঙ্গে হেগেলের একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে। আগেকার ভাববাদীরা মনে করতেন জগতের প্রতিটি বস্তুই গতিহীন দ্বন্দ্বহীন পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি সত্তা। ভাববাদী কাণ্ট আবার মনে করতেন বস্তুর স্বয়ংসিদ্ধ সত্তাকে মানুষ কখনও ঠিকমত জানতে পারে না। কিন্তু হেগেলই প্রথম দেখালেন, জগতে কোন বস্তু বা ঘটনা আকস্মিক বা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে রয়েছে গতি এবং বিপরীতমুখী গুণের দ্বন্দ্ব। তাছাড়া বাইরে প্রতিটি বস্তু ও ঘটনা অন্য সব বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু হেগেল আবার বললেন, জগতের সব বস্তু ও ঘটনা, জীবন ও সমাজের মধ্যে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণ ও অবস্থার যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তা নিয়ন্ত্রিত হয় পরম ভাবের দ্বারা। রাষ্ট্র হচ্ছে এই পরম ভাবের পূর্ণ প্রতীক। এইভাবে হেগেল জগৎ ও জীবনের সব দ্বন্দ্ব ও জটিলতাকে অলীক অবাস্তব ভাবের গোঁজামিল দিয়ে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে

আসলে বস্তু কখনও পাল্টায় না ; পাল্টায় মানুষের ভাবসত্তা আর চিন্তার প্রকরণ। এই পরিবর্তিত মানষচিন্তাই যুগে যুগে সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরে নতুন করে রূপ দেয়।

বস্তুর বাস্তবতাকে ছোট করে মানুষের ভাবসত্তাকে বড় করেছেন হেগেল। তাঁর দ্বান্দ্বিকতা ভাবের দ্বান্দ্বিকতা, বস্তুর বা ঘটনার দ্বান্দ্বিকতা। মার্কস বললেন, বস্তুর মধ্যে যে স্বাভাবিক দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে মানুষের ভাব বা মানসচিন্তার দ্বারা তা কখনও মেটে না ; বরং এই দ্বান্দ্বিকতাই মানুষের ভাবজগৎকে করে নিয়ন্ত্রিত। সমাজের বাস্তব অবস্থার মধ্যেই রয়েছে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণের দ্বন্দ্ব শ্রেণীর দ্বন্দ্ব আর এই দ্বন্দ্বই তাকে ক্রমাগত গতির উন্নতি ও পরিবর্তনের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

মার্কসের বস্তুবাদী চিন্তাধারার প্রথম বিকাশ হয় এই রচনায়।

শরতের শেষে জেনিকে নিয়ে ফ্রান্সে যাওয়া ঠিক করে ফেললেন মার্কস।

চার

শরৎ গিয়ে তখন সবেমাত্র হেমন্ত পড়েছে। রোদের গায়ের রংটা ঠিক পাকা কমলালেবুর মত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পাণ্ডুর প্রকৃতির মধ্যে কেমন যেন মলিন জড়তা দেখা দিয়েছে। মার্কসের মনের মধ্যে কিন্তু কোন জড়তা নেই। এক নতুন কর্মোদ্যমের উদ্যোগে তার দেহ মনের রক্তকনিকাগুলি ফেটে উপছে পড়তে শুরু করেছে যেন।

১৮৪৩ সাল। নভেম্বর মাস। জার্মানী ছেড়ে ফ্রান্সের মহানগরী প্যারিসে গিয়ে নতুন করে বাসা বাঁধলেন মার্কস। নতুন করে শুরু করে দিলেন পড়াশুনার কাজ।

পূর্ব ইউরোপের তরুণ চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীরা তখন প্যারিসে এসে

আগেই জড়ো হয়েছেন। প্রত্যেকেই খুঁজছেন নতুন আর এক ধারার স্বচ্ছ আলো। তাঁদের নিরুচ্চার চিন্তা ও সোচ্চার আলোচনায় তখন সরগরম হয়ে উঠেছে প্যারিসের প্রতিটি কাফে আর রেঁস্তোরা। রুগে, হাইনে, বাকুনিন, প্রুধো, কাবে প্রভৃতি প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অবদান ছিল চিন্তার জগতে। রুগের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। আর সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন মার্কস। তাঁরাও খুশি হলেন মার্কসকে পেয়ে।

ঠিক হলো আবার একটি পত্রিকা বেড়োবে। তাঁদের নতুন চিন্তার রূপদান ও প্রচারই হবে সে পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য। জার্মান সরকারের মত ফরাসী সরকারের দমননীতি অতখানি কঠোর নয়। আরও ঠিক হলো সম্পাদক থাকবেন দুজন—মার্কস আর রুগে।

পত্রিকার নামকরণ হলো ডয়েশ্চে ফ্রারৎসোসিশ্চে ইয়ারবুখের। এই পত্রিকার দুটি সংখ্যাতে মার্কসের দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটি আগের লেখা হেগেলের অধিকারবাদের সমালোচনা আর একটি ইহুদী জীবনের সমস্যা সম্পর্কে। প্রথম রচনাটিতে বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় রচনাটি মার্কস লেখেন ব্রুনো বয়ারের একটি নিবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে। বয়ার বলেছিলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতীয় ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে না পারলে ইহুদীদের সামাজিক মুক্তির কোন উপায় নেই। মার্কস বললেন, আসল সমস্যা ধর্মীয় নয়, অর্থনৈতিক। ইহুদীদের বাণিজ্যিক কাজকর্মই তাদের অপ্রিয় করে তুলেছে অন্যান্য সমাজের কাছে। সুতরাং এই সব কাজকর্মের পরিবর্তন করে তারা যদি নতুন ধাঁচে সমাজের পুনর্গঠন না করে তাহলে তাদের সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়।

ফরাসী বিপ্লব অনেক আগে ঘটে গেছে। সাম্য, মৈত্রীও স্বাধীনতার উদাত্ত বাণীতে আর মুখরিত হয়না দেশের আকাশ বাতাস। তবু মার্কস

দেখলেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অন্তঃশীলা স্রোত নিঃশব্দে বয়ে চলেছে জাতীয় জীবনের অন্তঃস্থলে। সমাজতন্ত্রের নতুন নতুন ব্যাখ্যায় ফরাসী চিন্তাশীলরা তখন ব্যস্ত। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় ফরাসী সাহিত্যের সমগ্র ক্ষেত্রটিও অভিসিঞ্চিত।

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ফরাসী চিন্তাশীলদের লেখাগুলি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়া শুরু করে দিলেন মার্কস। হেলভেশিয়াস ও হলবাখের বস্তুবাদ, সেণ্ট সাইমনের অর্থনীতি, জোশেফ প্রুধোর নৈরাজ্যবাদ, ফুরিয়ের ও বাবুফের ইউরোপীয়ান অলীক চিন্তাধারা, গিজোর ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগলেন।

এঁদের লেখা পড়ে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন মার্কস, এরা যে সমাজতন্ত্রের কথা লিখেছেন তাতে শ্রেণীসংগ্রামের কোন কথা নেই। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতেন সমাজের বিত্তবান পুঁজিবাদীদের মনের পরিবর্তন ঘটবে ক্রমবর্ধমান সমাজ সংস্কারের চাপে এবং একদিন তাঁরা নিজেরাই তাঁদের সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করে দেবেন অন্য সব শ্রেণীর মধ্যে।

তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন মার্কস। এঁদের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে তিনি একমত হতে না পারলেও এঁদের চিন্তা ও ভাবধারা হতে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করতে পারেন এবং সেই সব উপাদান দিয়ে ভবিষ্যতে তিনি তাঁর বস্তুবাদী দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের একটি বলিষ্ঠ ভিত্তিভূমি রচনা করতে পারবেন। বিশেষ করে সেণ্ট সাইমন ও বাবুফের চিন্তাধারা ভাল লাগল মার্কসের। বাবুফের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং সাইমনের ইতিহাস ও রাজনীতির ব্যাখ্যা থেকে বিশেষ উৎসাহ পেলেন মার্কস। সাইমন ফরাসী বিপ্লবের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মানুষের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। তারপর রাজনীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করে সাইমন দেখিয়েছেন, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপারটি রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

ইউটোপিয়া বা অলীক সমাজবাদে বিশ্বাসীরা যুক্তির উপর খুব বেশী নির্ভর করতেন। তাঁরা বলতেন সমাজে অনেক অন্যায় আছে ঠিকই কিন্তু যুক্তিভিত্তিক আদর্শ প্রচারের দ্বারাই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হবে। কিন্তু সে যাই হোক, এই সব সমাজবাদীদের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এসেছে সারা উনিশ শতকের ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের। জার্মান বিপ্লবী হবীটলিঙের সাম্যবাদের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে এই সমাজবাদের।

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে শুধু পড়াশুনো আর চিন্তা করতেন না মার্কস। কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্যারিসে বসেই বিভিন্ন লেখা নিয়ে আক্রমণ করতেন জার্মান সরকারকে। এই সময় জার্মানীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে উঠছিল। দেশ থেকে চলে এলেও দেশের প্রতি একটা গভীর আসক্তির আবেগ মাঝে মাঝে অনুভব করেন মার্কস। সে আবেগ আপনা থেকে অন্তরে ফুটে উঠে আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়। মার্কস দেখলেন একটা বড় রকমের পরিবর্তন না ঘটলে দেশের কোন উন্নতি হবে না। কিন্তু তিনি ভালভাবেই জানেন দেশের সম্ভ্রান্ত ধনী অভিজাত সম্প্রদায় দেশের উন্নতির জন্য কোন রকম আন্দোলন বা সংগ্রামে এগিয়ে আসবে না। একমাত্র নিঃস্ব সর্বহারার দলই এগিয়ে এসে ঝাঁপ দিতে পারে দেশের মুক্তি সংগ্রামে।

১৮৪৪ সালে মার্কস লিখলেন, দেশের গরীব জনসাধারণেরই জার্মানীর মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে যাবার শক্তি আছে। জগতের মুক্তি তারাই আনবে ; সমাজে বিপ্লব তারাই ঘটাবে। সমাজে সবচেয়ে নিচে যাদের স্থান, সমাজের কোন সম্পদ যারা ভোগ করতে পায় না, নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে যাদের কোন ধারণা নেই, সেই অজ্ঞ, নিরন্ন জনসাধারণই সমগ্র মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করবে।

এই নিত্য অভাবগ্রস্ত সর্বহারা জনসাধারণের মধ্যে কী বিরাট বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত আছে, একমাত্র মার্কসই তা সবচেয়ে আগে দেখতে পান।

মার্কস বলেন, এরাই পুঁজিবাদী ধনী ও সামন্তবাদী জমিদারদের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষকদের আসন অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তি নিয়ে আসবে জগতে।

ব্রুনো বয়ার ও জার্মান আদর্শবাদীরা মাঝে মাঝে দেশের গরীবদের জন্য মায়াকান্না কাঁদতেন। এই সময় মার্কস তাঁদের সেই অর্থহীন মায়াকান্নাকে বিদ্রূপ করে 'দি হলি ফ্যামিলি' বা পবিত্র পরিবার নামে একখানি বই লেখেন। এঙ্গেল তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।

উঁচু প্রাসাদ থেকে গরীবদের দুরবস্থা দেখে যারা শুধু তাদের উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ও তাদের দুঃখে কিছু চোখের জল ফেলে অথবা তাদের সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে দেশবাসীর কাছে কাতর আবেদন জানিয়ে যাঁরা কর্তব্য সম্পাদন করে ক্ষান্ত হন তাঁদের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেন মার্কস। তিনি জানিয়ে দেন এই সব প্রলিটারিয়েট অর্থাৎ সর্বহারার দল যেদিন নিজেদের অপরিসীম শক্তির কথা বুঝতে পেরে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে সেদিন তাদের সেই আন্দোলনের স্রোতের মুখে ধনীদের যত সব বড় বড় প্রাসাদ খড়কুটোর মত ভেসে যাবে। তবে লেখাটি প্রকাশিত হয় তাঁর প্যারিস থেকে চলে যাবার পর।

১৮৪৪ সাল থেকেই তাঁর লেখা পড়ে বিব্রত বোধ করছিল প্রুশীয় সরকার। তাঁরা বুঝতে পারলেন মার্কস এখন দেশে না থাকলেও সুদূর প্যারিস থেকেই তাঁর জ্বালাময়ী লেখার দ্বারা বিপ্লবের পথে নিয়ে যাচ্ছেন দেশবাসীকে। সুতরাং ফ্রান্স থেকেই সরাতে হবে তাঁকে অবিলম্বে। এজন্য ফরাসী সরকারকে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগল জার্মান সরকার।

ডয়েশ্চে ইয়ারবুখের পত্রিকাটি তখনও প্রকাশিত হচ্ছিল নিয়মিত। কিন্তু আর্নল্ড রগের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতবিরোধ ঘটছিল মার্কসের। অবশেষে প্যারিস থেকে প্রকাশিত ভরওয়ার্ট নামে একটি জার্মান পত্রিকায় তাঁদের একটি বিষয়ে লেখার ব্যাপারে মতভেদ তীব্র হয়ে ওঠে।

জার্মানীতে ১৮৪৪ সালের জুন মাসে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে ফরাসীদেশ থেকে প্রকাশিত জার্মান পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করতে গিয়েই মতভেদ হয় দুজনে। রুগে বললেন, এই আন্দোলন যুক্তিহীন, অর্থহীন এক ভ্রান্ত প্রচেষ্টা। কিন্তু মার্কস বললেন, এই আন্দোলন সর্বহারা শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রথম অভ্যুত্থান। এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত আছে শ্রেণীচেতনা আর শ্রেণীসংগ্রামের বীজ।

মার্কসের এই মত জার্মান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই সময় ফরাসী চিন্তাশীলদের মধ্যে প্রুধোঁ আর তাঁর শিষ্য লেরুর সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন মার্কস। তাঁদের তত্ত্বগত চিন্তার সঙ্গে একমত হতে না পারলেও মানুষ হিসাবে তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন মার্কস। এঁরা দুজনেই ছিলেন শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তাঁদের চিন্তার সততা ও নিষ্ঠাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

প্রুধোঁর সবচেয়ে বড় দোষ ছিল, তিনি পুঁজিবাদের অবসান ও সমাজবাদের প্রসঙ্গে ঈশ্বর, মানবতাবোধ, ও নির্বিশেষ সার্বিক যুক্তির উপর নির্ভর করতেন। এই সমস্ত কথা বলে তিনি মানবসমাজের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভূমিকাটিকে এড়িয়ে গেছেন আলগোছে। প্রুধোঁর সার্বিক নির্বিশেষ যুক্তি হেগেলের পরম ভাবের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। সামাজিক অগ্রগতিতে প্রুধোঁ যে বিশ্বাস করতেন না তা নয়, তবে এই অগ্রগতির পিছনে অর্থনৈতিক কারণগুলিকে দেখতে পাননি। তাছাড়া এই সামাজিক অগ্রগতিকে তিনি ব্যক্তিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতেন। তিনি বলতেন যুগে যুগে সমাজের যে অগ্রগতি ঘটে সমাজের ব্যক্তি মানসে তা বুঝতে পারে না। তারা কি করে না করে, তাদের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি তারা তা নিজেরাই বুঝতে পারে না।

প্রুধোঁর এই কল্পনাসর্বস্ব নৈরাজ্যবাদ কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না মার্কস।

প্রুধোঁর মত জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাকও মানুষকে জাগতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। বাস্তব মানুষের পরিবর্তে মনুষ্যত্বের বিমূর্ত ধারণাকেই দেখতেন তিনি বড় করে। ফয়েরবাকের বড় দোষ তিনি বস্তু জগৎ আর মানব জগৎকে আলাদা করে দেখেছেন।

মার্কস বললেন, মানুষের সত্তা কখনও বিমূর্ত থাকে না। পরিবেশের প্রভাব আর আর্থিক ও সামাজিক সম্পর্কের চাপে যুগে যুগে তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। মানব জগৎ আর বস্তু জগৎ কখনও আলাদা নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা করা দর্শনের কাজ নয়। অন্যায় অবাঞ্ছিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করে তাদের উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হলো দর্শনের কাজ। দর্শনকে এর জন্য হয়ে উঠতে হবে এক প্রোগ্রাম অফ এ্যাকশন বা এক বিশেষ বাস্তব পদ্ধতির প্রয়োগকলা।

এদিক দিয়ে হেগেলের একটি কৃতিত্ব আছে। তিনি জগতের পরিবর্তনে আইডিয়া বা ভাবের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

মার্কস শুধু হেগেল নয় দর্শনের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা করে আদর্শবাদী ও ভাববাদীদের পরিহার করে বস্তুবাদকে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করলেন। দর্শনের সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে জুড়ে দিয়ে তাকে বাস্তব কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে নামিয়ে আনলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের কাছ থেকে কিছু উপাদান নিয়ে মার্কস খাড়া করলেন এক পরিপূর্ণ ও কার্যকরি প্রকল্প। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতা সেন্ট সাইমনের ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ফয়েরবাকের মানবতা প্রভৃতি থেকে কিছু কিছু উপাদান নিয়ে তাঁদের অসঙ্গতিগুলি এড়িয়ে গেলেন।

মার্কস দেখালেন, সমাজে শ্রেণীগত সংঘাতের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের একটি বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেই সমাজবাদই শেষ কথা নয়। সেই

সমাজতন্ত্রে থাকবে সর্বহারা শ্রেণীর এক বিশেষ ভূমিকা। পরিশেষে তিনি দেখিয়েছেন পূর্ণ সাম্যবাদের পথ। শোষণমুক্ত সাম্যবাদভিত্তিক একটি আদর্শ সমাজের ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে তিনি দিয়েছেন এক উজ্জ্বল আভাস। জ্ঞান ও কর্মের সুষম সমন্বয়ে বাস্তব প্রয়োগের সুষ্ঠুতার উপরেই নির্ভর করে তত্ত্বগত উপলব্ধির সার্থকতা। যে দর্শন বা চিন্তা মানুষের কাজে লাগে না, মানুষের মুক্তির সন্ধান দেয় না তার কোন মূল্যকে স্বীকার করেননি মার্কস। তিনি বুঝতে পারেননি মানুষ কেন তা পড়বে।

মার্কসের লেখা পড়ে এবার খুব বেশী বিব্রত হয়ে পড়ল জার্মান সরকার। ১৮৪৪ সাল যতই শেষ হয়ে আসে ততই ফরাসী সরকারের উপর প্রবল হয়ে উঠতে থাকে জার্মান সরকারের চাপ। অবশেষে ফরাসী দেশ থেকে মার্কসকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সম্মত হয় ফরাসী সরকার। মার্কসকে বহিস্কারের আদেশ দেওয়া হলো।

নতুন বছর পড়তেই অর্থাৎ ১৮৩৫ সালের জানুয়ারিতেই প্যারিস থেকে বিদায় নিলেন মার্কস।

পাঁচ

প্যারিস থেকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস্‌এ চলে এলেন মার্কস। চিন্তার ক্ষেত্রে প্যারিসের সঙ্গে চলছিল তাঁর অনেক দেওয়া নেওয়া। এই তত্ত্বগত দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কটি হঠাৎ ছিঁড়ে চলে আসতে বড় কষ্ট হচ্ছিল মার্কসের।

তবু সে কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করলেন না মার্কস, যেমন করেননি জন্মভূমি জার্মানীর রাইন প্রদেশ থেকে একদিন অচেনা বিভুঁই ফ্রান্সে চলে আসতে।

যখন যেখানেই যান মার্কস অল্পদিনের মধ্যেই আশ্চর্য ভাবে খাপ

খাইয়ে নেন নিজেকে সেখানকার সঙ্গে। বিশ্ব মানবের মুক্তির স্বপ্নে মন যাঁর সতত বিভোর, সর্বহারা শ্রেণীর শোষণমুক্তির উপায় উদ্ভাবনে বুদ্ধি যাঁর সতত সজাগ, তাঁর কাছে যে দেশ বিদেশের কোন ভেদজ্ঞান থাকবে না, সেটা খুবই স্বাভাবিক। তাই দেশ বিদেশের সীমারেখা কোনদিন কোন রেখাপাত করতে পারেনি তাঁর মনে। যখন যেখানেই যান সেখানেই দেখেন শুধু মানুষ আর মানুষের দুঃখ, কান পেতে শোনেন শুধু শোষিত সর্বহারাদের কান্না আর দীর্ঘশ্বাস। দুনিয়ার মেহনতী মানুষের গা থেকে ক্ষয় করা রক্ত আর চোখ থেকে ঝরা জলের একটি মিলিত নদীর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় যেন মার্কসের সমগ্র ভাবসত্তা। নিজের বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তাঁর মধ্যে। মার্কস শুধু ভাবেন তাদের কথা, তাদের মুক্তির কথা, সামাজিক পরিবর্তনে তাদের মহান ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা।

ব্রাসেলস্ শহরে ফেব্রুয়ারির প্রথমেই একটি ঘর ভাড়া পেয়ে গেলেন মার্কস। সঙ্গে সঙ্গে এঙ্গেলসকে আনবার জন্য চিঠি পাঠালেন ইংলণ্ডে। এঙ্গেলসও উত্তর দিলেন, তিনি মার্চেই চলে আসবেন। তিনি জানালেন, সেখানে তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা সম্বন্ধে একটি রচনা লিখছেন। তথ্যভিত্তিক রচনাটি লেখার কাজ শেষ হয়ে গেলেই তিনি চলে আসবেন।

ব্রাসেলস্‌এ এসে মার্কসের প্রথম কাজ হলো 'হলি ফ্যামিলি' বা পবিত্র পরিবার বইখানি প্রকাশ করা। বইখানির পাণ্ডুলিপি তখনও যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। প্যারিসে থাকাকালে এঙ্গেলস্ যখন ইংলণ্ড যাবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখনই দুজনে আলোচনা করে বইখানি লেখা হয়েছিল। আসলে এটি যৌথ রচনা।

পবিত্র পরিবার বলতে মার্কস ও এঙ্গেলস বোঝালেন ব্রুনো বয়ার ও তাঁর ভাইদের। ব্রুনো বয়ারের নাম দিলেন সেন্ট ব্রুনো। হেগেলের শিষ্যদের মধ্যে বয়ার ছিলেন নেতৃস্থানীয়। হেগেলের পরম ভাবে বিশ্বাস করতেন না বয়ার। কিন্তু তিনি পরম ভাবে বিশ্বাস না করলেও

মানুষের শুভবুদ্ধি ও বিশুদ্ধ চেতনায় বিশ্বাস করতেন। বয়ার বলতেন, বিপ্লবের দ্বারাই সমাজের মৌল পরিবর্তন ঘটবে। এই বিপ্লবের দ্বারাই সম্ভব হবে সমাজের উন্নতি বা অগ্রগতি। এই বিপ্লব জনগণের নেতৃত্বে বা তৎপরতায় আসবে না, আসবে মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধি আর বিশুদ্ধ চৈতন্যের জাগরণে।

বয়ারের এই মতের সমর্থক ছিলেন তাঁর দুই ভাই—এডগার বয়ার আর এগবার্ট বয়ার। এই বয়ার ভ্রাতাদের ভ্রান্ত বিপ্লববাদের সমালোচনা, তাঁদের মতের অসারতা প্রমাণ করলেন মার্কস আর এঙ্গেলস। সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পটভূমিকায় হেগেলীয় ভাববাদের সমালোচনা করলেন।

বসন্তকাল পড়তেই ব্রাসেলস্‌এ চলে এলেন এঙ্গেলস। অনেক দিন অর্থাৎ প্রায় দীর্ঘ একটি বছরের পর আবার দেখা হলো দুজনে। মাত্র একটা বছরকে মনে হলো দীর্ঘ একটি যুগ। অবশ্য দুজনে এতদিন দূরে থাকলেও, চোখের দেখা দুজনের না হলেও মনে মনে যেন দেখা হত দুজনের। দুজনেই দুজনের কথা ভাবতেন। এক নিবিড় ভাব সম্মিলনে বাঁধা ছিলেন যেন দুজনে।

দেখা হতেই দুজনে অন্তর উজাড় করে সব ভাব ভাবনার কথা বললেন; কে কি ভাবছিলেন কে কি লিখছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করলেন। এর পর কে কি করবেন সে বিষয়েও চিন্তা করতে লাগলেন দুজনে।

এঙ্গেলস দেখালেন তিনি তাঁর 'কণ্ডিশানস্‌ অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড' রচনাটিতে কি লিখেছেন, সেখানকার শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা এবং আসন্ন শ্রমিক বিপ্লবে ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা কেমন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মার্কস তা পড়ে খুশি হলেন। তিনিও যা ভাবছিলেন তা খুলে বললেন। তিনি বললেন, এতদিন পড়েছি ও মুখে অনেক বলেছি,

কিন্তু এবার জার্মান আদর্শবাদ ও ফরাসা বস্তুবাদের ত্রুটিগুলির সমালোচনা করে একখানি বই লিখতে চাই।

এঙ্গেলস আনন্দের সঙ্গে বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম।

মার্কস বললেন, তবে আসুন, আমরা দুজনেই একাজে হাত দিই। আমাদের চিন্তা ভাবনার কবলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমাদের রচনা।

এঙ্গেলস বললেন, তাহলে ত খুবই ভাল হয়।

মার্কস বললেন, আমরা এ রচনায় মানুষের সমাজ ও ইতিহাসকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে নতুন করে ব্যাখ্যা করব। সমাজবাদের সব চিন্তাধারাকে অলীক কল্পনাসর্বস্বতার কুয়াশা ভরা স্তর থেকে নামিয়ে এনে তাকে দান করব এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি। অবশ্য বইটির নাম হবে 'জার্মান ইডিওলজি' বা জার্মান চিন্তাধারা।

এঙ্গেলস বললেন, আমি এখানে লক্ষ্য করেছি ঐতিহাসিক বস্তুবাদের চিন্তা ও উপলব্ধির দিক থেকে অনেক দূর এগিয়েছেন। এবার আমরা দুজনে তত্ত্বটিকে পরিপূর্ণ রূপ দান করতে চাই।

লেখার কাজ শুরু করে দিলেন দুজনে। ঠিক হলো, লেখার কাজ বেশ কিছুটা এগোলে প্রকাশকের খোঁজ করবেন।

কল্পনাসর্বস্ব অলীক সমাজবাদে বিশ্বাসী যে সব চিন্তাবিদ ও মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবি তাঁদের কল্পিত সমাজবাদকে প্রকৃত সমাজতন্ত্র বলে থাকেন, তাঁদের কঠোর সমালোচনা করলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। জার্মান চিন্তাধারার প্রথম দিকে আছে ফয়েরবাকের চিন্তার সমালোচনা। ফয়েরবাক আদর্শবাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে বস্তুবাদের কথা বললেও ভাববাদ থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেনি তাঁর বস্তুবাদ।

এই প্রসঙ্গে একটি যুগান্তকারী কথা বলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তাঁরা বলেন, প্রকৃতি আর পরিবেশ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করলেও মানুষ প্রকৃতি আর তার পরিবেশকে তার প্রয়োজনমত বদলে নেয়। মার্কস কিন্তু তাঁর ছেলেবেলায় যখন তাঁর চিন্তা পরিণতি লাভ

করেনি তখন মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাবকেই বড় করে দেখতেন। তাঁর যখন বয়স মাত্র ষোল তখন স্কুলে একদিন একটি রচনা লিখতে হয়। রচনাটির নাম 'হাউ ইয়ংম্যান চুজ দেয়ার প্রফেসনস'। এই রচনাটিতে মার্কস দেখিয়েছেন মানুষ যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সেই পরিবেশের প্রভাবেই গড়ে ওঠে তার জীবন আর জীবিকা, সেই প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারে না।

এবার মার্কস বললেন, এটা ঠিক নয়। মানুষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ভেঙ্গে চুরে নতুন নতুন রূপ দান করছে। প্রকৃতি মানুষের প্রয়োজনের বস্তু জুগিয়ে দেয় না। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই মানুষকে বস্তু অর্জন করে নিতে হয়। এই সংগ্রাম আর সংগ্রহের কাজে যুগে যুগে নতুন প্রযুক্তিবিজ্ঞান আর কলা-কৌশল উদ্ভাবন করতে হয় মানুষকে। কখনও পাথরের হাতিয়ার কখনও লৌহ ও কাঠের জিনিস, কখনও লাঙ্গল, তাঁত যন্ত্র, আবার কখনও বা বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কার করেছে মানুষ। কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিস আবিষ্কার ও ব্যবহারের পিছনে রয়েছে সামাজিক পটভূমি আর পরিবেশের প্রভাব। পরিবেশের প্রভাবই মানুষকে উন্নত ধরনের কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান উদ্ভাবনের জন্য প্রেরণা দেয়। আর সেই প্রেরণার বশে মানুষ নতুন নতুন কলাকৌশলের আবিষ্কার করে তার পরিবেশকে আয়ত্ত করেছে, পণ্য উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ার তৈরি করেছে। এই সব উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। ফলে উৎপাদনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কও পরিবর্তিত হয়। তখন নতুন শ্রম সংগঠন দেখা দেয় সমাজে আর এইভাবেই দেখা দেয় সামাজিক বিন্যাসের বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যেহেতু মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন নিষ্ক্রিয় বা অমূর্ত জীব নয়, যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, সেইহেতু বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষই নিয়ে আসে এই সামাজিক বিপ্লব।

এর পর মার্কস দেখালেন, পণ্য উৎপাদন, পণ্য বিনিময় ও বণ্টন-

ব্যবস্থার ত্রিবিধ ভিত্তিভূমির উপরেই রচিত হয় যে কোন সমাজের আর্থিক কাঠামো আর অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরেই গড়ে ওঠে সমাজের আইনকানুন, রীতিনীতি আর রাজনৈতিক সংগঠন। এই সব কিছু মিলিয়ে যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়, সেই চেতনা নিয়ন্ত্রিত করে মানুষকে।

'জার্মান ভাবধারা' দ্বিতীয়ার্ধে মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মান সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সমালোচনা করেছেন। আটো লুনিং, হারমান প্লুটম্যান, কার্ল গ্রুন, মোজেস হেস, ম্যাকস ষ্টার্নার প্রভৃতি চিন্তাবিদদের তত্ত্ব-চিন্তার অসংগতিগুলি তুলে ধরলেন তাঁদের রচনায়।

রচনা শেষ হলো প্রায় এক বছর পর। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোন প্রকাশক পাওয়া গেল না। প্রকাশকরা ভাবলেন এ গ্রন্থের মধ্যে যে সমাজবিপ্লবের প্রেরণা রয়েছে তা নিশ্চয়ই সরকারের দৃষ্টি এড়াবে না। সুতরাং তার ফল ভোগ করতে হবে।

তখন ১৮৪৬ সাল। মার্কস দেখলেন তিনি একা নন, আরও বহু পলাতক বিপ্লবী আশ্রয় নিয়েছেন ব্রাসেলস্‌এ। ব্রাসেলস্‌এর একটা সুবিধা ছিল এখান থেকে লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি শহরগুলিতে যোগাযোগ করা সহজ হত।

মার্কস আরও দেখলেন এই সব পলাতক বিপ্লবীরা সাম্যবাদী আদর্শে আগে থেকেই দীক্ষিত। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন মার্কস। কিন্তু গোপনে আর সাবধানে। কারণ ব্রাসেলসের সরকার একটি মাত্র শর্তে আশ্রয় দিয়েছিলেন মার্কসকে; সে শর্ত হলো বেলজিয়ান রাজনীতির ব্যাপারে কোনদিন কোন কথা বলবেন না মার্কস।

লণ্ডন, প্যারিস ও ব্রাসেলস্‌এ তখন কিছু কিছু শ্রমিক সংগঠন তৈরি হয়েছিল। মার্কস দেখলেন এখন তাঁর সামনে দুটো কাজ। প্রথমে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তা আর ব্যাখ্যা শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে প্রচার করতে হবে। পরে ইউরোপের

বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে তারাই।

মার্কস আরও দেখলেন, লণ্ডনের শ্রমিক সমাজই সবচেয়ে সুসংগঠিত ও সবচেয়ে অগ্রণী। চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে লাগলেন। তাঁর নতুন নতুন চিন্তা ও উপলব্ধির কথাগুলি লিখে পাঠাতে লাগলেন।

এই বছরেই ব্রাসেলস্‌এ একটি কমিউনিষ্ট যোগাযোগ কমিটি স্থাপিত হয়। এই কমিটিতে শহরের সাম্যবাদী চিন্তায় চিন্তিত সব লোকই এসে মিলিত হলেন। একসঙ্গে মিলে মিশে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন। কমিটির সদস্যরা অন্যান্য দেশের সাম্যবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে চলতে লাগলেন।

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তার ভিত্তিতে তখন 'কমিউনিষ্ট লীগ' নামে সাম্যবাদী সংগঠন গড়ে উঠেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর জার্মানীতে। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর তৎপরতায় ব্রাসেলস্ হয়ে উঠেছে তার কেন্দ্রস্থল। ইংলণ্ডের সাম্যবাদী সংগঠনের নাম ছিল 'লীগ অফ দি জাষ্ট'। ব্রাসেলস্ কমিটির একমাত্র কাজ ছিল অন্যান্য দেশের লীগের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা ও তাদের সময়মত নির্দেশ দেওয়া। তবে তখন অন্যান্য দেশের সংগঠনের থেকে লণ্ডনের শ্রমিকরা ছিল খুব সংগঠিত আর তার ফলে বিশেষ জোরদার করে তুলতে পেরেছিল তারা সেখানকার লীগকে।

মার্কস ও এঙ্গেলসকে তখন দেশে দেশে এই সব সংগঠনগুলির মাধ্যমে একই সঙ্গে দুদিকে যুদ্ধ চালাতে হচ্ছিল। একদিকে পুঁজিবাদী সমাজে শিকড় গেড়ে ওঠা বুর্জোয়া আদর্শবাদ আর একদিকে বুদ্ধিজীবী পেটি বুর্জোয়াদের কল্পনাসর্বস্ব অলীক সমাজবাদ ও সাম্যবাদ। মার্কস দেখালেন প্রগতির পক্ষে এই দুটোই ক্ষতিকর।

তখনকার দিনে কল্পনাসর্বস্ব অবৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তার প্রধান

নায়ক ও কর্মী ছিলেন জার্মানীর উইলহেম ভিটলিং। প্রুধোঁর সঙ্গে মার্কসের মতবিরোধ আরও বেড়ে গেল।

ভিটলিং যখন এই বছরেই একবার ব্রাসেলস্‌এ এলেন তখন মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই অনেক করে বোঝালেন তাঁকে। বললেন, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আজ সর্বহারা বিত্তহীন শ্রমিক সমাজের মধ্যে আগ্রহ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। আজ এই শ্রমিকদের নেতৃত্ব দেবার জন্য এমন নেতা চাই যিনি একই সঙ্গে তত্ত্ব ও সংগঠন গড়ে তুলতে পারবেন ঠিকভাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনারা সমাজবাদ বা সাম্যবাদের যে তত্ত্ব খাড়া করেছেন, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে সে তত্ত্ব ধোপে টিকবে না; বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর কোন কাজেই আসবে না।

ভিটলিং বললেন, সাম্য ও সমাজবাদ আমরাও চাই। ধনী গরীবের এই অসাম্য আমরা চাই না। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কিছু করা ঠিক হবে না। আমরা বিশ্বাস করি ধীরে ধীরে বিবর্তনের পথে ঘটবে সমাজের আমূল পরিবর্তন। ধনিকশ্রেণী ধনের সমবণ্টনে বাধ্য হবে অবস্থাচক্রের স্বাভাবিক চাপে।

আর কোন কথা বললেন না মার্কস ও এঙ্গেলস। দেখলেন বৃথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভিটলিং-এর মতের কোন পরিবর্তন হবে না।

প্রুধোঁরও সেই অবস্থা। তিনিও নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু শ্রেণীচেতনা থাকা সত্ত্বেও শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী নন। অনেক করে বোঝালেন তাঁকে মার্কস। কিন্তু তিনি বুঝলেন না। নিজের মতের অন্ধতা আর গোঁড়ামিকে কিছুতেই ছাড়লেন না।

ভিটলিং ও প্রুধোঁর সঙ্গে গ্রুন, ফিয়েজ প্রভৃতি কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদীদের সঙ্গে কথা হলো। এঁরা সবাই এখন নিজেদের প্রকৃত সমাজবাদী বলে পরিচয় দিতে শুরু করেছেন। এঁরা সবাই বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীর বিরোধকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন না। বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের জোড়াতালি দিয়ে শ্রেণীসংঘাতকে

সারিয়ে তুলতে চান তাঁরা। শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজবিপ্লবকে চান এড়িয়ে যেতে।

১৮৪৬ সালের মে মাসে কমিউনিষ্ট লীগের ব্রাসেলস্ কমিটি থেকে একটি প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রে তথাকথিত প্রকৃত সমাজবাদীদেরও কঠোরভাবে আক্রমণ করেন মার্কস ও এঙ্গেলস। কারণ তাঁরা দেখলেন কঠোর সমালোচনার দ্বারা তথাকথিত প্রকৃত সমাজবাদীদের এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে না পারলে সমাজবিপ্লব কোনদিন ত্বরান্বিত হবে না। সমাজতন্ত্রের কোনদিনই প্রতিষ্ঠা হবে না।

এইভাবে কয়েকটি মাস কেটে গেল। বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট লীগগুলিকে সংগঠিত করে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ভাবতে লাগলেন মার্কস ও এঙ্গেলস।

ডিসেম্বর মাস পড়তেই প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন' নামে একখানি বই প্রকাশিত হলো। প্রুধোঁ তাঁর এতদিনের চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করেছেন এই বইখানির মধ্যে। সমাজে শ্রেণীসংঘাতের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করলেন প্রুধোঁ। স্বীকার করলেন ধনীদের সম্পত্তি সঞ্চয়ে একধরণের চৌর্যবৃত্তি এবং ধনীদের সম্পত্তিসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর লোকেরা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু সেই সঙ্গে ধনী-গরীবের শ্রেণীগত বিরোধের শান্তিপূর্ণ অবসানের কথাও বললেন প্রুধোঁ। বললেন ঈশ্বর, মানবতাবোধ ও সার্বিক যুক্তির কথা।

প্রুধোঁর মতে ন্যায়পরায়ণতা আর শুবুদ্ধি জাগবে যখন ধনীদের মনে, তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে বিশ্বপ্রেম, ভ্রাতৃত্ব আর মানবতার আদর্শে, তখন সব শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে সমাজে। এইভাবেই সমস্ত শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটবে এক সার্থক সমন্বয়ের মধ্যে। হেগেলের মত প্রুধোঁও বললেন, পরস্পর-বিরোধী চেতনার সমন্বয় সম্ভব আর এই সমন্বয় থেকেই সম্ভব হয়ে ওঠে সমাজের প্রগতি।

প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন' বইখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় মার্কসের কাছে। প্রুধোঁও নিজে মার্কসকে অনুরোধ করেন বইখানি পড়ে তাঁর মতামত জানাবার জন্য। বইটি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র দুদিনের মধ্যে তা পড়ে ফেললেন মার্কস।

প্রুধোঁর সঙ্গে মতের অমিল তাঁর বরাবরই ছিল। কিন্তু বইখানি পড়তে পড়তে সে অমিল আর প্রুধোঁর যুক্তির অসঙ্গতি অতিশয় প্রকট হয়ে উঠল মার্কসের কাছে। তিনি আর থাকতে পারলেন না। তিনি দেখলেন শুধু সমালোচনা করে প্রুধোঁর দোষ ধরা যাবেনা, তার সব কথার জবাব দেওয়া যাবে না। তাই সেই জবাব দিতে গিয়ে নিজেই একখানি বই লিখে ফেললেন মার্কস। বইখানির নাম দিলেন, 'দর্শনের দারিদ্র্য'।

ছয়

ব্রাসেলস্ থেকে ২৮ শে ডিসেম্বর পি, ভি, এ্যানেনকফকে একখানি চিঠি লেখেন মার্কস। ১৮৪৬ সাল তখনও শেষ হয়নি। প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন' বইখানি পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই চিঠিতে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন মার্কস। তাঁর 'দর্শনের দারিদ্র্য' বইখানি লেখার কাজে তখনও হাত দেননি তিনি। চিঠিখানি ফরাসী ভাষায় লেখা।

তোমার নভেম্বরের চিঠির উত্তর তুমি অনেক আগেই পেয়ে থাকবে।

প্রুধোঁর 'দারিদ্র্যের দর্শন' বইখানি গত সপ্তাহে পেয়ে দু'দিনের মধ্যেই পড়ে ফেলেছি। বইখানি আমি খুব তাড়াতাড়ি পড়লেও এ বিষয়ে আমার একটা মোটামুটি মতামত এই চিঠিতেই জানাতে পারব তোমায়। তোমাকে খোলাখুলিভাবে একথা বলতে আমার বাধা নেই

যে, প্রুধোঁর বইখানি মোটের উপর খুব খারাপ লেগেছে আমার। মনে হচ্ছে জার্মান দর্শনের ক্ষেত্রে যে একটি আদর্শবাদী ভাবধারার ঐতিহ্য আছে, প্রুধোঁ বীরের মত তার নেতৃত্ব করেছেন। প্রুধোঁর দর্শন এক অবাস্তব অসংলগ্ন ও অর্থহীন চিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে, কারণ বর্তমান সমাজের প্রকৃত অবস্থাটা তিনি ধরতে পারেননি। তিনি যে 'শৃঙ্খলা সংযোজন' বা সমন্বয়ের (Engrement) এর কথা বলছেন সে কথা তিনি ফুরিয়ের-এর কাছ থেকে ধার করেছেন এবং সে কথা এখানে একেবারেই মূল্যহীন।

কেন যে প্রুধোঁ ঈশ্বর, সার্বিক যুক্তি, নির্বিশেষ ব্যক্তিনিরপেক্ষ মানবতাবোধ প্রভৃতির কথা বলেছেন তা বুঝতে পারলাম না। উনি বলেছেন এগুলি অভ্রান্ত সত্য; সব যুগেই এগুলির মূল্য সমান থাকে। তবে এই সব ভাবসত্যগুলির প্রকৃত মর্ম মানুষ বুঝতে পারে না বলেই এগুলিকে সময়মত কার্যকরী করে তুলতে পারে না অথচ এগুলির দ্বারা ব্যক্তিজীবন বা সমাজজীবনের যে কোন বিরোধের সমন্বয় ও যে কোন সমস্যার সমাধান ঘটানো যায়। এই ভাবে হেগেলবাদের পুনরুদ্ধার ঘটিয়ে কেন তিনি পণ্ডিত সাজতে গেলেন, বুঝলাম না।

তার কারণ অবশ্য প্রুধোঁর বইএর মধ্যেই খুঁজে পাবে যদিও সে কারণ রহস্যময়। মানুষের ইতিহাসে সমাজের যে অগ্রগতি দেখেছেন প্রুধোঁ তার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের কোন সম্পর্ক তিনি দেখতে পাননি। দেখেছেন শুধু ঈশ্বর, সার্বিক ও নির্বিশেষ যুক্তি আর ব্যক্তি ও সমাজ-নিরপেক্ষ মানবতাবোধ প্রভৃতি সেই সব অমূর্ত ভাবসত্যগুলিকে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে বিশেষ যুগের অর্থনৈতিক উন্নতি ও উৎপাদন ব্যবস্থারও যে এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে সেকথাও বুঝতে পাননি।

এখন দেখতে হবে সমাজ কি জিনিস। সমাজ মানুষের পারস্পরিক কর্মের এক বিনিময় কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্ম ও শ্রমের ভিন্নতা অনুসারেই শ্রেণীভেদ গড়ে উঠেছে মানুষের মধ্যে। মানুষ ইচ্ছা করলেই কিন্তু যে কোন সমাজকে গড়ে তুলতে পারে না, বা যে

কোন সমাজকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে না, যদি না যে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোটা দাঁড়িয়ে থাকে সেই অবস্থা-গুলো বদলানো হয়। যে কোন দেশের যে কোন যুগের সমাজব্যবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখ, দেখবে তার পিছনে রয়েছে এক বিশেষ ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থা আর প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও কলাকৌশল। আবার উল্টো দিক থেকে কোন যুগের এক বিশেষ উৎপাদনব্যবস্থা আর প্রযুক্তি-বিদ্যার কথা আলোচনা করে দেখ, দেখবে সে যুগের সেই উৎপাদনরীতি ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অবস্থা অনুসারেই বাণিজ্যব্যবস্থা সমাজ পরিবার ও শ্রেণীভেদের চেহারাগুলো গড়ে উঠেছে। প্রুধোঁ এসব কথা কখনই বুঝবে না, কারণ তাঁর ধারণা তিনি বড় একটা কিছু করছেন।

অবশ্য কোন যুগের উৎপাদন ব্যবস্থা হঠাৎ গড়ে ওঠা এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী যুগের উৎপাদন ব্যবস্থাই পরবর্তী যুগে চলে আসে ধারাবাহিক ভাবে। আর এক একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই গড়ে ওঠে এক এক ধরণের সামাজিক সম্পর্ক। তবে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক খুব নিবিড়। কারণ মানুষে মানুষে যে বস্তুগত ও প্রয়োজনগত সম্পর্ক, আসলে সামাজিক সম্পর্ক বলতে আমরা তাকেই বুঝি।

মনে রাখবে, কোন সমাজ ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। মানুষ যখন দেখে তাদের বর্তমানের ব্যবসা-বাণিজ্য বা কাজ কারবার পুরণো উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, তখন তারা নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে। তার আনুষঙ্গিক সামাজিক অবস্থাটাকে পাল্টে দেয়। এখানে বাণিজ্য কথাটিকে আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি, জার্মান ভাষায় যাকে বলে verkhr. যে কোন যুগের সমাজব্যবস্থা কত পরিবর্তনশীল, তা একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে। বলতে পারা যায় প্রাচীন গিল্ড বা কর্পোরেশনের কথা। মধ্যযুগীয় বড় নিয়মকানুনওয়ালা সমাজব্যবস্থার কথা। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবে, যে কোন সমাজের রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির

সম্পর্ক কত নিবিড়। মধ্যযুগে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ছত্রছায়াতেই সামন্ত ও পুঁজিবাদীদের পুঁজি সঞ্চিত হয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। উপনিবেশ গড়ে ওঠে দেশে দেশে। তারপর ১৬৪০ আর ১৬৮৮ সালের দুটি বিপ্লবের আঘাতে ইংলণ্ডে মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে যায়। তারপর আসে শিল্পবিপ্লব। নিশ্চিহ্ন করে দেয় পুরনো সমাজের শেষ ধারাটিকে। এইভাবে দেখা যায় সমাজে উৎপাদন, বিনিয়োগ ক্রয়াবক্রয়ের ধারাসমন্বিত অর্থনীতির অবস্থাটি অস্থায়ী এবং ঐতিহাসিক নিয়মের সামিল ও পরিবর্তনশীল। উৎপাদনগত নতুন অর্থবিদ্যার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক রাজনৈতিক অবস্থাগুলি আমূল বদলে যায়।

এ কথা স্বীকার করেননি প্রুধোঁ। সতের, আঠারো, উনিশ প্রভৃতি কোন শতকের কথা বলেননি তিনি। কোন বিশেষ যুগ বা সমাজের ভিত্তিতে কোন কিছু বিচার বা সমালোচনা করেননি। তিনি যে ইতিহাসের কথা বলেছেন, সে ইতিহাস স্থানকালবিহীন এক কল্পনার কুয়াশাঘেরা জগৎ, যে ইতিহাস রক্তমাংসের মানুষের ইতিহাস নয়, তা অমূর্তভাবের ইতিহাস। তাঁর মতে মানুষ হচ্ছে বাহনমাত্র। মানবমনের অমূর্ত ভাবধারাই মানুষকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে নানা ক্রমোত্তরণের মধ্য দিয়ে এক বৃহত্তর পরিণতির দিকে। কিন্তু এই ভাবগুলিই সব নয়; এর উপর আছে এক পরম ভাব। যার রহস্যায়িত মহাগর্ভের অদৃশ্য উদার আশ্রয়ে আবহমানকাল হতে সংশোধিত হয়ে চলেছে মানব জগতের যত কিছু বিকাশ আর বিবর্তন।

কারণ ওই সব ভাবগুলি বিশুদ্ধ হলেও মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে তাঁদের মধ্যে আর একমাত্র পরমভাবের তৎপরতাতেই সমন্বয় ঘটে সে বিরোধের।

প্রুধোঁর আর একটি দোষ তিনি ভাবজগৎ ও বস্তুজগৎকে আলাদা করে দেখেছেন। তাঁর মতে সামাজিক, রাজনৈতিক যাই হোক না কেন মানব মনের যে কোন ভাবই বিশুদ্ধ কারণ ঈশ্বর বা নৈর্ব্যক্তিক

যুক্তিবোধের পবিত্র বুকের মাঝে তা ঘুমিয়ে থাকে ; কিন্তু বাস্তব জগতে তার ভুল প্রয়োগের দোষেই তার ফল অনেক সময় খারাপ হয়ে ওঠে। শ্রমবিভাগ, যন্ত্রপাতি, প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার, সম্পত্তি প্রভৃতি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিও আসলে এক একটি ভাব। এই সব ভাবগুলি চিরন্তন স্বাধীন আর স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অবশ্য এই সব ভাবগুলির মধ্যে বিরোধ বাঁধে, যেমন প্রতিযোগিতা একচেটিয়া কারবার। কিন্তু বিরোধের সমন্বয়ের মূলমন্ত্রও আছে ঈশ্বরের বা পরম ভাবের মধ্যে। বুর্জোয়াদের সম্পত্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারটিকেও একটি ঘটনা হিসেবে দেখেছিলেন প্রুধোঁ। তিনি বুঝতে পারেননি বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার ফলস্বরূপই বুর্জোয়া সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে।

প্রুধোঁর মতে এইসব ভাবগুলি বিশুদ্ধ এবং চিরন্তন কারণ এগুলির উৎপত্তি ঈশ্বরের মনে। বাস্তব জগতে এদের কোন উৎপত্তিস্থল খুঁজে পাননি তিনি। তিনি বুঝতে পারেননি সমাজের বাস্তব অবস্থা হতেই অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও ব্যবস্থাগুলির উদ্ভব হয় আর সেই সব অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে চলে মানুষের সমাজ।

একটা ভাল কথা প্রুধোঁ স্বীকার করেছেন। মানুষই কাপড়, লিনেন, সিল্ক প্রভৃতি তৈরি করে। এই সোজা কথাটা বুঝতে পারার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু তিনি আর একটা জিনিস বুঝতে পারেননি, মানুষই তাদের উৎপাদন যোগ্যতা অনুসারে সমাজে শ্রমিক, মালিক প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে আর এই সব বাস্তব সামাজিক সম্পর্ক থেকেই সৃষ্ট হয় কতকগুলি ভাব। মানব মনের যত কিছু ভাব তা সব বেড়ে ওঠে সমাজের বাস্তব অবস্থা থেকে, এই সব ভাবসত্তা কখনই চিরন্তন নয়; এগুলি অস্থায়ী যুগে যুগে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সামিল।

বুর্জোয়া ভাবধারার ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারেননি প্রুঁধো। তাঁর মতে বুর্জোয়া সমাজ স্বতস্ফূর্তভাবে অর্থাৎ আপনা থেকেই উঠে এসেছে। এটিও একটি ভাব, একটি স্বতস্ফূর্ত ইচ্ছাশক্তি। এই ভাবের বাস্তব

প্রয়োগে যদি কোন কুফল ফলে তাহলে বুর্জোয়া সমাজকে জোর করে বাইরে থেকে ভেঙ্গে না দিয়ে যুক্তির দ্বারা ধীরে ধীরে বুর্জোয়া ভাবধারার পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই ভাবেই সব বিরোধের ঘটাতে হবে শান্তিপূর্ণ সমন্বয় ও সমাধান। তিনি বুঝতে পারেননি, যে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক সম্পর্ক বুর্জোয়া জীবনধারা ও সামন্তবাদের উদ্ভবের মূলে, তাকে জোর করে ভেঙ্গে না ফেললে শ্রেণী বিরোধের অবসান ঘটবে না।

মানব সমাজের ইতিহাস তার অগ্রগতির পথে আজ এক যুগ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থার মামুলি নীতির সঙ্গে বর্তমানের সামাজিক সম্পর্ক খাপ না খাওয়ার জন্য যে প্রচণ্ড বিরোধে ফেটে পড়েছে আজকের সমাজ সেই বিরোধই আজ গতির প্রেরণা দিচ্ছে মানুষের ইতিহাসকে। আজ শুধু প্রতিটি জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণী থেকে ওঠেনি এই বিরোধ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এ বিরোধ মাথা তুলে উঠেছে। প্রুধোঁর অবাস্তব সমন্বয়বাদ নয়, একমাত্র প্রবল আপোষহীন বাস্তব শ্রেণীসংগ্রামই অবসান ঘটাতে পারে এই বিরোধের।

এখন দেখা যাচ্ছে প্রুধোঁ হচ্ছে যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান শত্রু। আমার চিঠি হয়ত খুব বড় হয়ে যাচ্ছে। কী করব? সাম্যবাদের পথে যে সব কুচিন্তার জঞ্জাল এনে জড়ো করেছেন প্রুধোঁ সেগুলোর কথা বলতে গিয়ে কথা এসে পড়ছে অনেক; কথা এসে পড়ছে আপনা থেকে। সে সব কথার মাঝে একটা কথা মনে রাখবে, যিনি বর্তমান সমাজের প্রকৃত বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে পারেননি সেই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে বৈপ্লবিক আন্দোলন চলেছে সে আন্দোলনকে যে তিনি বুঝে উঠতে পারবেন না সেটা খুবই স্বাভাবিক।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, কল্পনাশ্রয়ী ভাববাদী সমাজবাদীদের দিবাস্বপ্নের নিন্দা করেছেন প্রুধোঁ। তিনি মুখে ফেনা ভাঙ্গিয়ে চীৎকার করে বুক চাপড়ে বলেছেন, তিনি এই দিবাস্বপ্নের দোষ থেকে একেবারে

মুক্ত। কিন্তু ভাববাদী সমাজবাদীদের গাল দিতে গিয়ে তিনি নিজেই ধরা দিয়েছেন পেটি বুর্জোয়া ভাবধারার খপ্পরে। ফলে ফরাসী পেটি বুর্জোয়াদের সহজাত দোষ ত্রুটিগুলি তার মধ্যেও ঢুকে পড়েছে।

সত্যিই কী এক অদ্ভুত নীচ এই পেটি বুর্জোয়ারা। এর গোটাটাই স্ববিরোধিতা আর অসঙ্গতিতে ভর্তি। পেটি বুর্জোয়ারা একই সঙ্গে বুর্জোয়া আর সর্বহারা সাধারণ জনগণের বন্ধু। এরা একই সঙ্গে বুর্জোয়াদের বিপুল ধন ও ঐশ্চর্যে অভিভূত, আবার সর্বহারাদের রিক্ততা ও নিঃস্বতায় বিচলিত। এরা সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতি দেখায় আবার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের প্রতি গোপন দরদও চেপে রাখতে পারে না। প্রুধোঁ সেই ফরাসী পেটি বুর্জোয়াদের বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকার। অবশ্য এরও দরকার আছে, কারণ আসন্ন সমাজবিপ্লবে পেটি বুর্জোয়াদেরও বিশেষ একটি ভূমিকা আছে।

আজ যদি এই চিঠির সঙ্গে আমার 'পলিটিক্যাল ইকনমি' বইখানি পাঠিয়ে দিতে পারতাম তোমায় তাহলে সত্যিই আমি খুব খুশি হতাম। কিন্তু তা পারলাম না। কারণ আজও আমি বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারিনি। জার্মান দার্শনিক ও সমাজবাদীদের সমালোচনা করে যে বইটি লিখেছি এবং যার কথা তোমায় ব্রাসেলস্‌এ বলেছিলাম সে বইখানিও প্রকাশিত হয়নি। জার্মানীর বিরুদ্ধে কোন বই প্রকাশ ও প্রচার করা যে কী পরিমাণ কষ্টের কাজ তা তুমি বিশ্বাস করতেই পারবে না। একদিকে পুলিশ আর অন্যদিকে বই এর প্রকাশকরা। আমি যে কায়েমী স্বার্থ ও সমাজ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করছি এই সব প্রকাশকরা হচ্ছে তারই প্রতিনিধি। আর যদি বল আমাদের পার্টির কথা তাহলে বলব আমাদের পার্টি খুবই গরীব। তাছাড়া জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির একটি বড় অংশ আমার উপর বেজায় চটে গেছে, কারণ আমি তাদের অলীক কল্পনাসর্বস্ব ভাববাদী চিন্তাধারার ফানুসটা ফাটিয়ে দিতে চাই।

এরপর প্রুধোঁর দারিদ্র্যের দর্শন বইখানির সমালোচনা করতে গিয়ে

একখানি বই লিখে ফেললেন মার্কস। প্রুধোঁকে ঠাট্টা করে নাম দিলেন 'দর্শনের দারিদ্র্য' অর্থাৎ প্রুধোঁর দর্শন একেবারে যুক্তিহীন ও অর্থহীন সে কথা ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন বইখানিতে।

সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে যেভাবে শ্রেণীবৈষম্য গড়ে উঠেছে সমাজে মার্কস তা স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবতাবিবর্জিত বিরুদ্ধ ভাবের এক রহস্যময় সমন্বয় মানুষের সমাজ ও ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে চলে বিবর্তনের পথে, এ কথা কিছুতেই মানতে পারলেন না মার্কস। ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে কোন এক বিশেষ যুগে এক ধরণের সমাজব্যবস্থা থেকে যে সৎ ও অসতের উদ্ভব হয়, সেই সমাজব্যবস্থার গোটা কাঠামোটাকে ভেঙ্গে ফেলতে না পারলে সেই সৎ অসতের বিলোপ ঘটে না।

প্রুধোঁ বুঝতে পারেননি, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর শোষণ ও দারিদ্র্য যত বাড়তে থাকে, তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে ওঠে তত সামাজিক বিরোধ। মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব বেড়ে যায়। এই সামাজিক বিরোধ ও সংকট শান্তিপূর্ণ সমন্বয়ে মেটে না, একমাত্র বিপ্লব ছাড়া এ বিরোধের অবসানের অন্য কোন উপায় নেই।

মার্কস দেখিয়ে দিলেন, শোষণ, দারিদ্র্য, শ্রেণীবৈষম্য পুঁজিবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। সুতরাং এই শোষণ, দারিদ্র্য ও শ্রেণীবৈষম্য দূর করতে হলে পুঁজিবাদী সমাজবাদী সমাজব্যবস্থার মূলে যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তাকে একেবারে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।

আসন্ন শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজবিপ্লবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্বটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন মার্কস।

মার্কসের এই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং তাঁর আপোষহীন সংগ্রামের আদর্শে সাড়া পড়ে যায় কমিউনিষ্ট কর্মী ও সদস্যদের মধ্যে। কমিউনিষ্ট আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে ইংল্যাণ্ড ও পূর্ব ইউরোপে।

নতুন বছরের গোড়াতেই অর্থাৎ ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে

লণ্ডনের 'লীগ অফ দি জাষ্ট' আমন্ত্রণ জানালেন মার্কস ও এঙ্গেলসকে। ফ্রান্স, জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির কমিউনিষ্ট সংগঠনগুলির সঙ্গে এর আগেই যোগাযোগ করে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের জন্য চেষ্টা করছিলেন লণ্ডন লীগের সদস্যরা। এ ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য চাইলেন মার্কস ও এঙ্গেলসের।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে গেলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। দেরি না করে লণ্ডনে চলে গেলেন দুজনে। লণ্ডন লীগের সদস্যরা বললেন, আপনাদের মত যোগ্য ও গুণী লোককে শুধু আমাদের লীগে যোগদান করলেই হবে না, এই লীগকে নতুন করে গড়ে তুলে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনে পরিণত করতে হবে।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো কমিউনিষ্ট লীগের আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হবে এই বছরের জুন মাসে। সম্মেলন লণ্ডনেই অনুষ্ঠিত হবে।

এই সম্মেলনে ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম ও আরও অনেক দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেন। লীগের প্যারিস শাখা এঙ্গেলসকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠায় এবং ব্রাসেলস্ শাখা পাঠায় উইলহেম উল্ফকে।

এই সম্মেলনে লীগকে পুনর্গঠিত করা হয়। এই সম্মেলনে একটি নতুন শ্লোগান গৃহীত হয়। আগে এই শ্লোগান ছিল, সব মানুষ ভাই। এই শ্লোগান পাল্টে দিয়ে ঠিক হয়, সব দেশের মেহনতী মানুষ এক হও।

সেই হতে এই শ্লোগানই সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য জীবনপণ সংগ্রামে পথ দেখিয়েছে বিশ্বের সর্বহারা শ্রমিকদের।

লীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি হবে সে বিষয়ে একটি খসড়া তৈরি করেন এঙ্গেলস। সে খসড়ার প্রথমে বলা হয়, এই লীগের উদ্দেশ্য

হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা, সর্বহারাদের শাসন কায়েম করা এবং যে শ্রেণীবৈষম্যের উপর বুর্জোয়া সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তা ভেঙ্গে দিয়ে তার জায়গায় শ্রেণীহীন ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন নতুন সমাজ গড়ে তোলা।

কমিউনিষ্ট লীগকে নতুন করে গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাসেলস্ এ একটি গণতান্ত্রিক সংস্থাও গড়ে তুললেন মার্কস ও এঙ্গেলস। এই সংস্থার কাজ হবে পৃথিবীর যেখানে যেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করা এবং সেই আন্দোলন-কারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলা। গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সুতরাং যে কোন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সমর্থন করে চলা সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর হবে অন্যতম কর্তব্য।

ব্রাসেলস্এ তখন একটি পত্রিকা বার হত। নাম ছিল 'ডয়েশে ব্রাসেলার ৎসাইটুং'। মার্কস ও এঙ্গেলস এর প্রভাবে এই পত্রিকাটি একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী প্রচারের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই পত্রিকাতে মার্কস ও এঙ্গেলস এর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়।

তখন জার্মানীতে চলছিল বুর্জোয়াদের আন্দোলন। এই আন্দোলনকে সমর্থন করবার জন্য জার্মান শ্রমিকদের নির্দেশ দেন মার্কস। তিনি তাদের অবশ্য বুঝিয়ে বললেন, এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। কিন্তু সর্বহারাদের বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য এর কিছুটা প্রয়োজন আছে। কারণ যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংঘাতে সাম্রাজ্যবাদী কোন রাজশক্তি অথবা কেন্দ্রীভূত কোন অত্যাচারী শাসকশক্তি কিছুটা দুর্বল হয়।

সাত

প্রথম সম্মেলনে সব কাজ সারা হয়নি। সব আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায়নি। তাই লীগের আর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকার প্রয়োজন অনুভব করলেন মার্কস। প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগলেন তার জন্য।

প্রস্তুত হতে গিয়ে আজ অনেক কথা মনে পড়ল মার্কসের। মনে পড়ল কমিউনিষ্ট লীগের ইতিহাসের গোড়ার কথা। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথে আজকের লীগের সংগঠন যেন একটি বিরাট মাইলস্তম্ভ। সেই মাইলস্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে একবার করে পিছনে ও সামনে তাকান মার্কস। পিছনে তাকিয়ে দেখেন কত বন্ধুর পথ পার হয়ে আজকের এই পর্যায়ে পৌঁছেছে লীগ, লাভ করেছে এই সাংগঠনিক রূপ। কিন্তু এই পর্যায় বা এই রূপই তার শেষ লক্ষ্য নয়, এর পরেও সামনে প্রসারিত হয়ে আছে অনেক পথ। সে পথ আরও দুর্গম, আরও বন্ধুর। বুর্জোয়া শক্তির অনেক দুর্জয় বাধায় দুস্তর, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অনেক অচলায়তনে আকীর্ণ হয়ে আছে সে পথ।

সে আজ অনেক দিনের কথা। ১৮৩২ সালে প্যারিসে এক লীগ স্থাপন করে জার্মান উদ্বাস্তুর এক বিপ্লবী দল। জার্মানীতে তখন এক গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী আন্দোলন চালাচ্ছিলেন এ বিপ্লবী দল। জার্মান থেকে তাড়া খেয়ে প্যারিসে এসে তাঁরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। গোপনে কাজ করে যেতে লাগলেন। প্যারিস তখন দেশ বিদেশের পলাতক বিপ্লবীদের আড্ডাখানা। অনেক বিপ্লবীর তাজা রক্তে ভিজে ছিল তখনও তার মাটি।

১৮৩৯ সালের ২রা মে ফরাসী দেশের লুই সরকারের সঙ্গে এক লড়াই হয় বিপ্লবীদের। কিন্তু তাতে হেরে যায় বিপ্লবীরা। দুজন

নেতাকে দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ করে রাখার পর দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন কার্ল স্ক্যাপার আর হেনরিক বয়ার। ফরাসী দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে দুজনেই লণ্ডন চলে গেলেন।

স্ক্যাপার ও বয়ার দুজনেই গোঁড়া বিপ্লবী হলেও দেহ ও মনের দিক থেকে দুজনে ছিলেন দুরকম। স্ক্যাপার দেহের দিক থেকে যেমন ছিলেন খুব লম্বা বলিষ্ঠ, মনের দিক থেকে তেমনি ছিলেন আবেগ-প্রবণ। উদারনৈতিক গণতন্ত্রবাদী থেকে পরে সাম্যবাদী হন। বুদ্ধি ও উপলব্ধির থেকে বৈপ্লবিক আবেগ তাঁর ছিল বেশী। অন্য দিকে বয়ার ছিলেন বেঁটেখাটো চেহারার মানুষ এবং খুব বুদ্ধিমান আর কূটনীতিজ্ঞ। লণ্ডনে গিয়ে স্ক্যাপার করতে লাগলেন শিক্ষকতা আর বয়ার আগেকার পেশা অর্থাৎ জুতো তৈরির কাজ নিয়েই রয়ে গেলেন। প্যারিসে স্ক্যাপার ছিলেন একজন প্রেসের কম্পোজিটার।

দুজনে লণ্ডনে আবার নতুন করে গড়ে তুললেন লীগ। লণ্ডন হলো ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গোপনে ছড়িয়ে থাকা লীগগুলির কেন্দ্রস্থল। স্ক্যাপার ও বয়ারের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন জোশেফ মল নামে জার্মানীর কোলোন থেকে আসা একজন ঘড়ির মিস্ত্রী। ১৮৪৩ সালে লণ্ডনে এই তিনজন লীগ নেতার সঙ্গে পরিচিত হন এঙ্গেলস।

এঙ্গেলস দেখলেন, এই তিন জন নেতার সাম্যবাদী নীতি বা আদর্শ তখনও পরিণতি লাভ করেনি। খুব হয়ত স্বচ্ছ ও গভীর হয়ে ওঠেনি তাঁদের তত্ত্বগত উপলব্ধি। তবু তাঁদের বৈপ্লবিক আবেগে কোন নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তাঁরাই ছিলেন বিপ্লবী সর্বহারাদের সর্বপ্রথম অগ্রদূত। ১৮৪০ সাল থেকেই এই লীগ লণ্ডন ছাড়াও সুইজারল্যাণ্ড বার্লিন, প্যারিস প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় শাখা প্রশাখা বিস্তার করে আসছিল। এক লণ্ডন শহরেই এর ছিল অনেকগুলি শাখা এবং এগুলিকে বলা হত 'লজ'। অবশ্য তখন ওয়েটলিং, অগাস্ট বেকার প্রভৃতি সমন্বয়বাদী ও কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদীরাও এই লীগের সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মান শাখার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তা হলেও তাঁরা

জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীচেতনা জাগিয়ে সমাজবাদী চিন্তাধারায় প্রথম উদ্বুদ্ধ করেন তাদের।

জার্মান, ফ্রান্স বা কোন দেশের সরকার কোন কারণে কোন শ্রমিককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেই সে লণ্ডনে গিয়ে লীগের সদস্য হত। তাছাড়া অনেকে এদেশ ওদেশ করে লীগের খবরাখবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ বা দৌত্যগিরি করতেন। এইভাবে ক্রমশই বেড়ে চলেছিল লীগ। লণ্ডনে জার্মান শ্রমিকদের শিক্ষা সংস্থাটিও লীগকে যথেষ্ট সাহায্য করছিল। এই সংস্থা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাল ছেলে পেলেই তাকে লীগের সদস্য করত।

লীগের কাজকর্ম খুব গোপনে বেড়ে চলেছিল। একমাত্র লণ্ডন আর সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া আর সব দেশেই পুলিশ খুব কড়া নজর রাখত শ্রমিকদের উপর। সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদপুষ্ট স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কোন আন্দোলনকেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। ওয়েটলিং প্যারিস থেকে সুইজারল্যাণ্ড যাবার আগে ১৮৪০ সালে প্যারিসে লীগের ছত্রভঙ্গ সদস্যদের একত্রিত ও সংগঠিত করেন।

লীগের উন্নতিতে জার্মানীর দর্জিদের অবদান অনেক। জার্মান দর্জিরা তখন লণ্ডন, প্যারিস ও সুইজ্যারল্যাণ্ডে ছড়িয়ে থাকতেন। প্যারিস ও লণ্ডনে এঁদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। জার্মান দর্জিরা তখন নানাভাবে শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। এঁরা সবাই লীগের সদস্য হয়ে কাজকর্ম করে যাচ্ছিলেন। তবে যতদিন লীগের হেডকোয়ার্টার প্যারিসে ছিল ততদিন তাতে জার্মান সদস্য সংখ্যা বেশী থাকায় তাতে জার্মান প্রভাবও বেশী ছিল। লীগের হেডকোয়ার্টার প্যারিস থেকে লণ্ডনে আসার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা হয়ে উঠল লীগ। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, হল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ হতে আসা বহু লোক সদস্য হলো লীগের। তখন সদস্য-পত্রের উপর লেখা থাকত 'সকল মানুষই ভাই'।

লণ্ডন লীগের মধ্য দিয়ে ফরাসী দেশের বিপ্লবী ও ইংরেজ চার্টিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো। বিভিন্ন দিকে লীগ তখন বিস্তার লাভ করলেও লীগের মধ্যে জার্মান শ্রমিকদের দল ছিল বেশ ভারি। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস দেখলেন, এই সব শ্রমিকদের বেশীর ভাগই কুটির-শিল্পের কর্মী এবং তাদের মনিবরা হচ্ছে পেটি বুর্জোয়া। ভারি পুঁজিওয়ালা বৃহৎ শিল্পের খুব একটা প্রচলন হয়নি তখনও। তবে 'অবশ্য ক্ষুদ্রশিল্পের মধ্যেও শোষণ মাথা তুলে উঠতে শুরু করেছে। বিষাক্ত হয়ে উঠেছে মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক। তাছাড়া ক্ষুদ্রশিল্পের শ্রমিকরা তখন একটা কথা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে, শিল্প আজ ছোট থাকলেও এ শিল্প যত বড় হয়ে উঠবে, শোষণও তত বেড়ে যাবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস যোগদান করার আগে লীগের আদর্শ ও কর্ম-নীতির মধ্যে প্রচুর দোষ ছিল। ভাবপ্রবণ ফরাসী সাম্যবাদ ও কল্পনা-শ্রয়ী ওয়েটলিংএর তথাকথিত 'প্রকৃত সমাজবাদের অশুভ আড্ডা' থেকে তখনও বেড়িয়ে আসতে পারেনি লীগ। অলীক কল্পনা সর্বস্ব সাম্যবাদ বা অবৈজ্ঞানিক সমাজবাদের অসারতা এখনও বুঝতে পারেনি লীগের সদস্যরা।

১৮৯৪ সালে এঙ্গেলস লক্ষ্য করলেন 'ডয়েশ্চে ফানৎ সোসিশ্চে ইয়ারবুখের' বা 'জার্মান ফরাসী বার্ষিকীতে' মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজ-বাদের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেন। অবশ্য এর আগেই ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মার্কস দেখিয়েছেন যে কোন যুগের সমাজ ও রাজনীতিতে অর্থনীতির স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূলে হচ্ছে অর্থনীতি।

মার্কসের কথা কতখানি সত্যি তা হাতে হাতে প্রমাণিত হয়ে যায়। ইংলণ্ড ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বড় বড় কল কারখানা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শোষিত শ্রমিক অসন্তোষ বেড়ে যায়। সমাজে ধনের অসম বণ্টন ও বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সংকট বাড়িয়ে তোলে। শ্রেণী চেতনাকে তীব্রতর করে সুগম করে দেয় শ্রেণীসংগ্রামের পথ।

মার্কস আরও বলেন, কোন রাষ্ট্র কখনও সমাজকে ইচ্ছামত পরিচালিত করতে পারে না। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করে।

১৮৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে প্যারিসে ও পরের বছরে বসন্তকালে ব্রাসেলস্ এ গিয়ে মার্কসের সঙ্গে দেখা করেন এঙ্গেলস। তিনি দেখলেন মার্কসের ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে নিয়ে যাবে এক অভূতপূর্ব সফলতার দিকে। এ সংগ্রামের গতি প্রকৃতি হবে আগেকার শ্রেণীসংগ্রাম থেকে একেবারে আলাদা। কারণ আগেকার শ্রেণীসংগ্রামের নেতারা পুরোনো বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে না ভেঙ্গে বা না পাল্টে জোড়াতালি দেওয়া এক উদ্ভট শ্রেণীসমন্বয়ের দ্বারা এক আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে চাইতেন। কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা ব্যাখ্যা নয়, কল্পনা ও অন্ধ ভাবের আবেগই ছিল তাঁদের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু মার্কস দেখালেন পুরনো বুর্জোয়া উৎপাদনরীতির উপর নির্ভরশীল সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলতে না পারলে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়।

মার্কস ও এঙ্গেলস তখনও যোগদান করেননি লীগে। ১৮৪৩ সালে স্ক্যাপার এঙ্গেলসকে এ বিষয়ে অনুরোধ করলেও এঙ্গেলস প্রত্যাখ্যান করেন সে অনুরোধ। তবে যোগদান না করলেও লণ্ডন ও প্যারিস লীগের সঙ্গে সদ্ভাব ও নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে। তাঁরা তখন ব্রাসেলস্ এ একটি জার্মান শ্রমিকদের সংস্থা গড়ে তুলে কাজ করে যেতে থাকেন। ডয়েশ্চে ব্রাসেলার ৎসাইটুং পত্রিকাটির পরিচালন ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে নিজেদের বৈপ্লবিক ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তাকে ব্যবহার করতে থাকেন।

লীগের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের ভিতরে না ঢুকেও লীগের মোটা-মুটি সব প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির খবর রাখতেন মার্কস ও এঙ্গেলস। চিঠিপত্র ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মাধ্যমে প্রভাবিত করতেন

লীগ নেতাদের মতাদর্শকে। একবার একটি বেশ মজার ব্যাপার হয়।

একবার ওয়েষ্টফ্যালিয়া থেকে হারম্যান ক্রিয়েজ নামে একটি উৎসাহী ছাত্র এসে লীগের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তার সহযোগী হিসেবে বেছে নেয় হ্যারো হ্যারিংকে। ছাত্রটি লীগের মাধ্যমে রাতারাতি এক বিপ্লব আনতে চাইল দক্ষিণ আমেরিকায়। একটি পত্রিকা বার করে লীগের নামে স্বপ্নালু সাম্যবাদী প্রেমাদর্শ প্রচার করতে থাকে।

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই দেখলেন, লীগের নামে এই ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রচার ক্ষতিকর হয়ে উঠবে লীগের স্বার্থের পক্ষে। সুতরাং অবিলম্বে এ প্রচার বন্ধ করতে হবে। লীগের মধ্যে যোগদান না করলেও লীগকে ভালবাসতেন তাঁরা দুজনেই। এই লীগের মধ্যেই তাঁরা দেখেছিলেন একটি আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট পার্টির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা। তাই লীগের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা। তাই যখনি দেখতেন লীগ কোন বিষয়ে ভুল করছে অথবা করতে যাচ্ছে তখনি তাঁরা লিথোগ্রাফ করা কয়েকটি প্রচার পত্র বিলি করতেন।

এবারও ঠিক তাই করলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তার ফলও ঠিক ফলল। লীগ থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিয়ে যেতে হলো ক্রিয়েজকে।

ক্রিয়েজের মত ওয়েটলিংও কম ভাবপ্রবণ নন। ভ্রান্ত বিপ্লবী ওয়েটলিং ও তাঁর অবৈজ্ঞানিক মত প্রচারের মাধ্যমে ক্ষতি করে যাচ্ছিলেন লীগের। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রমিক সদস্যদের সঠিক জ্ঞানলাভের পথে বাধা সৃষ্টি করছিলেন। ওয়েটলিং ছিলেন অত্যন্ত অহঙ্কারী। নিজেকে খুব বড় বলে মনে করতেন তিনি। ভাবতেন একমাত্র তাঁর মতই অভ্রান্ত। ভাবাবেগ-দুষ্ট অবৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রেমচেতনাকে মিশিয়ে মর্ত্যের

মাঝে এক নতুন স্বর্গ রচনা করতে চেয়েছিলেন ওয়েটলিং। ভেবেছিলেন, কোন কিছু না ভেঙ্গে কাউকে না চটিয়ে আঘাত প্রতিঘাতের পথগুলিকে সাবধানে এড়িয়ে গিয়ে শান্তিপূর্ণ এক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণীহীন এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করবেন। তাক লাগিয়ে দেবেন পৃথিবীর মানুষকে। শ্রমিক ও মালিক, ধনী ও গরীব সমস্ত বৈষম্য ও বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে ভাই বলে জড়িয়ে ধরবে পরস্পরকে।

তাঁর 'গসপেল অফ দি পুওর সিনার্স' বইখানিতে গরীবদের জন্য অনেক দরদ দেখান ওয়েটলিং। কিন্তু সে দরদ যেমনি জলো তেমনি অর্থহীন। ওয়েটলিংএর ভ্রান্ত মতাদর্শই সুইজারল্যাণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনকে আলব্রেখেট ও কুলম্যানের মত ভ্রান্ত হেগেলবাদীদের খপ্পরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে তোলেন।

মার্কস যখন সস্ত্রীক ব্রাসেলস্ এ বাস করছিলেন তখন একবার হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হন ওয়েটলিং। ওয়েটলিংকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন মার্কস ও তাঁর স্ত্রী। আগেকার সেই তরুণ দর্জি বা শ্রমজীবী নেই ওয়েটলিং। আপন বুদ্ধিগত প্রতিভায় আপনি চমকিত ও বিমুগ্ধ আত্মহারা হয়ে উঠেছেন এখন নেতৃত্বের মোহে। সাম্যবাদের এক নতুন প্রবক্তা হয়ে উঠতে চাইছেন রাতারাতি।

তবু সব কিছু জেনে শুনেও ওয়েটলিংএর মুখের সামনে কোন প্রতিবাদ করলেন না মার্কস দম্পতি। যতই হোক ওয়েটলিং আজ তাঁদের বাড়িতে একজন সম্মানিত অতিথি। তাই বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটতে দিলেন না তাঁরা তাঁদের অতিথির আদর আপ্যায়নে। এক অমানুষিক সহিষ্ণুতায় সহ্য করে যেতে লাগলেন ওয়েটলিংএর সমস্ত অবান্তর ভাবোচ্ছ্বাস আর অর্থহীন কথাবার্তাগুলোকে।

কিন্তু ওয়েটলিংএর নিজেরই ভাল লাগল না। যখন তিনি দেখলেন সারা ব্রাসেলস্ শহরে তাঁকে সমর্থন করার কেউ নেই। তাঁর কথা কেউ শোনে না; কেউ সায় দেয় না। অল্পদিনের মধ্যেই তাই ব্রাসেলস্ ছেড়ে সুদূর আমেরিকায় চলে গেলেন ওয়েটলিং। গেলেন

এক নতুন ভবিষ্যতের সন্ধানে। দম্ভের সঙ্গে বলে গেলেন ওয়েটলিং, আমি দেখিয়ে দেব আমার স্বপ্নের আদর্শ শ্রেণীহীন সমাজ বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি না।

তখন ১৮৪৭ সালের বসন্তকাল। লণ্ডন থেকে জোশেফ মল ব্রাসেলস্ গিয়ে দেখা করলেন মার্কসের সঙ্গে। পরে প্যারিসে গিয়ে এঙ্গেলস-এর সঙ্গেও দেখা করলেন। দুজনকেই বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন মল লীগে যোগ দেবার জন্য। বারবার বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে আসছেন আমাদের লীগ কি করছে না করছে। আমাদের লীগকে জাহান্নামে দেবার যে পুরনো চক্রান্ত তা যাতে আর কোনদিন কলুষিত করতে না পারে লীগকে অন্ততঃ তার জন্য আপনাদের যোগদান করা উচিত।

মল বললেন, আর একটা কথা, আপনারা যোগদান করলেই লীগের সামনে আপনাদের বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব ও আদর্শ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাবেন আপনারা। আপনাদের সেই ব্যাখ্যা লীগের ইস্তাহাররূপে প্রকাশিত হবে। লীগের সম্মেলনে তা উত্থাপিত হবে। এইভাবে পুরনো লীগের আদর্শকে নতুন ধাঁচে গড়ে তুলে নতুন যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবেন আপনারা।

প্রথম দিকে অবশ্য মার্কস ও এঙ্গেলস-এর লীগের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি ছিল। তাই তাঁরা শুধু জার্মান শ্রমিকদের একটি স্থানীয় সংগঠন নিয়েই কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখলেন, লীগের সদস্যরা লীগের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁদের মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিচ্ছে তখন তাঁদের আর আপত্তির কোন কারণ রইল না। মনে কোন কুণ্ঠা না রেখে দুজনেই যোগ দিলেন লীগে। ব্রাসেলস্ এ মার্কস ও প্যারিসে এঙ্গেলস লীগের শাখা গড়ে তুললেন। কাজ করে যেতে লাগলেন মনেপ্রাণে। তারপর এই বছরেই গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে প্রথম সম্মেলন বসল লীগের। এই সম্মেলনে লীগের সংগঠন প্রধান চারটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পুনর্গঠিত হলো। এর মধ্যে রইল কমিউনিষ্ট

সার্কেলস, লীডিং সার্কেলস, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কংগ্রেস। লীগের নতুন নামকরণ হলো কমিউনিষ্ট লীগ।

ঠিক হলো, প্রথম সম্মেলনে যে সব নতুন নিয়মকানুনগুলি রচিত হলো সেগুলি কমিউনিষ্ট সার্কেলগুলিতে আলোচনার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পরে সেগুলি যাবে লীডিং সার্কেল ও কেন্দ্রীয় কমিটিতে। অবশেষে দ্বিতীয় সম্মেলনে তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে।

১৮৪৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর ডাকা হলো লীগের দ্বিতীয় সম্মেলন। দশ দিন ধরে চলল এই সম্মেলন। এক দীর্ঘ বিতর্কিত আলোচনায় মার্কস তাঁর তত্ত্ব ও নীতির কথা বুঝিয়ে বললেন। অবশেষে সদস্যদের মন থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ সম্বন্ধে সকল দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। সব সংশয় ঘুচে গেল। লীগের মূল নীতিগুলি গৃহীত সর্বসম্মতি-ক্রমে। এক নতুন ইস্তাহার রচনার ভার পেলেন মার্কস ও এঙ্গেলস।

ইস্তাহারটি সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেই ছাপার জন্য তা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। তখন সবেমাত্র ১৮৪৮ সাল শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব তখনও শুরু হয়নি।

ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের কেন্দ্রীয় কমিটি ব্রাসেলস্ এর লীগের লীডিং সার্কেলকে সব কার্যভার ও ক্ষমতা দিয়ে দিল। কিন্তু জার্মানী ও ব্রাসেলস্-এ তখন চলেছে কঠোর দমননীতি। পুলিশি অত্যাচার ও ধরপাকড়ের ভয়ে এক জায়গায় জড়ো হতে পারছিলো না লীগের সদস্যরা। ব্রাসেলস্-এর লীগ নেতা ও সদস্যরা প্যারিসে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। তাঁরা সেখানকার কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে মার্কসের হাতে সব ক্ষমতা তুলে দিলেন।

কিন্তু ৩রা মার্চ তারিখে পুলিশ হঠাৎ মার্কসের বাড়ি ঢুকে গ্রেপ্তার করল তাঁকে। পরদিন তিনি ফরাসী দেশে চলে যাবেন এই সর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো।

মার্কসও সেই কথাই ভাবছিলেন। প্যারিসে গিয়ে আবার সবাই মিলিত হলেন। নতুন করে কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে তুললেন।

এদিকে মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত কমিউনিষ্ট ইস্তাহার তখন ছাপা হয়ে গেছে। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপের দেশে দেশে। নবজাগ্রত সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয় সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে তা দিয়ে বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের কাছ থেকে সব পুঁজি কেড়ে নেবে। উৎপাদনের সব উপকরণগুলিকে রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করবে এবং সর্বহারা শ্রেণীর হাতে শাসনক্ষমতা এনে দিয়ে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে তুলবে।

এই ইস্তাহারে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রমাণ করে দিলেন, দেশের বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা উৎপাদন ব্যবস্থা মালিকানাকে আঁকড়ে ধরে থেকে উৎপাদন ব্যবস্থার কোন উন্নতি হতে দিচ্ছে না এবং এইভাবে তারা সাম্যবাদের পথে মানবজাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে।

একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীই শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াদের ধ্বংস করে পুঁজিবাদের কবর দিতে পারে এবং শ্রেণীহীন আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। ইস্তাহারে বলা হলো, একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে বলে দিতে পারে শ্রেণীসংগ্রামের সঠিক পথ নিশ্চিত করে তুলতে পারে তাদের বিজয় অভিযান। কমিউনিষ্ট অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকরা বৈপ্লবিক আদর্শে দীক্ষিত হয়ে শ্রেণীসংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপটিকে বুঝতে পারবে।

ইস্তাহারে দুনিয়ার সব শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ হবার কথা বলা হলো। শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি জাতীয়তাবাদের আতিশয্যের অবসান ঘটাবে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ ও হানাহানি বন্ধ করবে।

পুঁজিবাদী সমাজে যারা শ্রমিক শ্রমের দ্বারা মুনাফা তৈরি করে তারা সে মুনাফার ভাগ পায় না আর যারা শ্রমিকদের শোষণ করে

সেই মুনাফা ভোগ করে তারা কোন কাজ করে না। কিন্তু নতুন শ্রেণীহীন সমাজে শ্রমের দ্বারা শ্রমিকদের জীবন হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ।

প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোন প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ইস্তাহারের শেষে বলা হয়, "আজ সাম্যবাদী বিপ্লবের ভয়ে শাসকশ্রেণী কেঁপে উঠুক। যারা সর্বহারা, তাদের একমাত্র শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার আর কিছুই নেই। কিন্তু আজকের রিক্ত ও শৃঙ্খলিত সর্বহারারাই একদিন সারা দুনিয়া জয় করবে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও।"

এই ইস্তাহার সম্বন্ধে লেনিন পরে বলেন, এই ইস্তাহারে এক নতুন জগতের সন্ধান দেওয়া হয়। এক সুসঙ্গত বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক চিন্তা-ধারার দ্বারা সমাজজীবনকে ব্যাখ্যা করে শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে একটি গভীর ও ব্যাপক তত্ত্বাদর্শকে রূপদান করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাম্যবাদী সমাজের স্রষ্টা হিসাবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক গুরুত্বটিকে বিশ্লেষণ করা হয় এই ইস্তাহারে। লেনিন বলেন, The work outlines the new world conception, consistent materialism, which also embraces the realism of social life, dialectics as the most comprehensive profound doctrine of development, the theory of class struggle and of the world-historic revolutionary role of the proletariat—the creator of the new Communist society.—(V. I. Lenin. Marx—Engles—Marxism.)

আট

মার্কস এঙ্গেলস ও তাঁদের সহকর্মীরা প্যারিসে এসে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন মোট পাঁচজন—কার্ল মার্কস, কার্ল স্ক্যাপার, হেনরিখ বয়ার, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, জোসেফ মল ও উইলহেম উল্‌ফ।

কমিটি গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে কতকগুলি দাবী লিপিবদ্ধ করে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। অনেক দাবীর মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য দাবী হলো।

সারা জার্মানীকে এক অখণ্ড সাধারণতন্ত্রে পরিণত করতে হবে।

পার্লামেণ্টে জার্মান জনগণের প্রতিনিধিত্ব যারা করবে তাদের বেতন দিতে হবে যাতে করে শ্রমিকরাও পার্লামেণ্টে যেতে পারে।

জার্মান জনগণের সকলকে অস্ত্রশিক্ষা ও অস্ত্রদান করতে হবে।

সামন্ত ও রাজপরিবারদের সকল ভূসম্পত্তি ও খনি রাষ্ট্রসম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। এই সব ভূসম্পত্তিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ আকারে এমন ভাবে কৃষিকার্য চালাতে হবে যার উৎপন্ন সব ফসল সমাজের সকলকে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

চাষীদের যে সব সম্পত্তি দেনা হিসেবে বন্ধক রাখা হয়েছে তা এবার থেকে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হবে। এই বন্ধকী দেনার জন্য চাষীরা যে সুদ দেয়, সে সুদ এবার থেকে তারা রাষ্ট্রকে দেবে।

জেলায় জেলায় গ্রাম অঞ্চলে যেখানে চাষীরা খাজনা করা জমিতে চাষ করে এবং জমিদারদের চাষের জমির জন্য খাজনা দেয় সেখানে এবার থেকে তারা রাষ্ট্রকে সেই খাজনা কর হিসেবে দেবে।

সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা যেমন রেলপথ, জলপথ, জাহাজ, রাস্তাঘাট, ডাক প্রভৃতি রাষ্ট্রকেই করতে হবে। রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে সেগুলির পরিচালনার ভার সর্বহারা শ্রেণীর হাতে দিতে হবে।

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির পরিমাণ বেঁধে দিতে হবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর থেকে সব কর তুলে দিতে হবে এবং কর ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রগতিশীল করে তুলতে হবে।

জাতীয় কল কারখানা স্থাপন করতে হবে। সকল শ্রমিক যাতে জীবিকা অর্জনের মত কাজ পায় তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে রাষ্ট্রকে এবং যারা শ্রমকর্মে অসমর্থ তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।

সকলের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

পরিশেষে বলা হয় জার্মানীর অগণিত শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় যারা এতদিন সমস্ত জাতীয় সম্পদ উৎপন্ন করেও মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হয়ে এসেছে, ঐ সব দাবীগুলি পূরণ না হলে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার ও ক্ষমতা পাবে না। সারা জার্মানীতে কঠোর দমননীতি চালু থাকা সত্ত্বেও এই সব দাবী সম্বলিত অজস্র প্রচারপত্র বিলি করা হলো সারা দেশে।

এর মাসকতক আগে সাম্যবাদী ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল ইউরোপের শ্রমিক শ্রেণী। তৈরি হয়ে উঠেছিল, বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য। এবার জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রচারিত এই দাবীগুলি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও সংগ্রামমুখী হয়ে উঠল সর্বহারা শ্রমিক সমাজ।

গত ফেব্রুয়ারিতে প্যারিসে বুর্জোয়াদের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয় তার ঢেউ বেলজিয়াম ও আশপাশের দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার জন্য বেলজিয়াম সরকার মার্কসকে ব্রাসেলস্ থেকে বিতাড়িত করে।

প্যারিসে এসে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গড়ে

তোলার পর জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে কয়েকদফা দাবী জানিয়ে একটি দলিল প্রকাশিত করলেন মার্কস। মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত সাম্যবাদী ইস্তাহার আর এই জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টির দাবীর প্রচার বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলল ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের মধ্যে।

ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশের রাজতন্ত্র ও রাষ্ট্র-নায়কদের বিরুদ্ধে দিনে দিনে তীব্র হয়ে উঠছিল গণসংগ্রাম। ফ্রান্সের সিংহাসন ছেড়ে লুই ফিলিপ পালিয়ে গেলেন আর ঠিক সেই সময় জার্মানীতে প্রবল হয়ে উঠল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব।

ফরাসী দেশে বিপ্লব চলাকালেই প্যারিসে ছিলেন মার্কস। এই সময় তিনি কমিউনিষ্ট লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

জার্মানীতে যখন এক ব্যাপক বিপ্লবে পরিণত হয়েউঠছিল জনগণের আন্দোলন তখন প্যারিসে একদল হঠকারী জার্মান বিপ্লবী নেতা প্যারিসে একটি সৈন্যদল গঠন করে জার্মান আক্রমণের চেষ্টা করছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন জার্মান কবি হেরওয়েগ, বর্নস্টেড ও বর্নস্টাইন। তাঁরা তাঁদের সৈন্যদলের নাম দিলেন 'জার্মান লিজিয়ন।' তাঁরা বললেন, আমাদের এই মুক্তিফৌজ মার্চ করে প্যারিস থেকে জার্মানীতে গিয়ে অস্ত্রের জোরে সফল করে তুলবে জার্মানীর বিপ্লবকে।

মার্কস কিন্তু মেনে নিতে পারলেন না এই পরিকল্পনাকে। তিনি বললেন, এটা কাণ্ডজ্ঞানহীন এক হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরপর মার্কস জার্মান শ্রমিক ও লীগের কর্মীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন ওদের দলে না ভিড়ে একে একে জার্মানীতে গিয়ে ধীরে ধীরে জনগণকে জাগিয়ে তোলে, তাদের যেন আগে ভাল করে বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত করে তোলে। এই সব কথা সবাইকে ভাল করে বোঝাবার জন্য মার্কস ও এঙ্গেলস জার্মান কমিউনিষ্ট ক্লাব নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুললেন। এইভাবে প্রচারের দ্বারা তিন চারশো

শ্রমিক ও লীগ সদস্যকে বুঝিয়ে জার্মান পাঠিয়ে দিলেন তাঁরা। বললেন, আপন আপন বাড়ি গিয়ে যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করে তোলবার জন্য কাজ করতে।

১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিস ছেড়ে জার্মান চলে গেলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। প্রথমে তাঁরা কোলোনে গিয়ে উঠলেন এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। রাইন প্রদেশের কেন্দ্রস্থল কোলোন তখন জার্মানীর নবজাগ্রত শ্রমিক সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়া সেখানে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন মার্কস, প্যারিসের থেকে সাংবাদিকদের স্বাধীনতা কিছুটা বেশী।

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই উপলব্ধি করলেন, শ্রমিকরা সবে মাত্র গত শতাব্দীর ঘুম থেকে জাগতে শুরু করেছে। এই সময় তাদের আরও বোঝাতে হবে বিপ্লবের আদর্শের কথা, শ্রেণীসংগ্রাম ও তার লক্ষ্যের কথা সহজ করে প্রচার করতে হবে তাদের মধ্যে। আর এজন্য একটি দৈনিক সংবাদপত্রের দরকার।

একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরি হতে লাগলেন মার্কস। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর কমিউনিষ্ট লীগকে ভালভাবে সংগঠিত করার কাজেও মন দিলেন। মার্কস দেখলেন, জার্মানীতে কমিউনিষ্ট লীগের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত ও সুসংবদ্ধ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে তিনি এঙ্গেলস, উলফ, স্ক্যাপার, ড্রঙ্কি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের দেশের বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লীগের শাখা ও লীগ সদস্যদের সংস্থা খুলতে বললেন।

কিন্তু তাঁদের কাজে পদে পদে প্রচুর বাঁধা পেতে লাগলেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা। তখন জার্মানীতে রাজনৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কোন ঐক্য ছিল না রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। কোন প্রগতিশীলতার ধারা ছিল না কোন আন্দোলনের মধ্যে। বিশেষ করে

দেশে অনেক ভারী শিল্প ও কল কারখানা গড়ে উঠলেও শোষিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কোন ভাল সংগঠন গড়ে ওঠেনি তখনও, প্রগতিশীল আন্দোলনের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না তারা।

তখন শ্রমিকশ্রেণীর কোন রাজনৈতিক চেহারা বা চরিত্র ছিল না বলেই তাদের নিয়ে হঠাৎ একটা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে পারল না কমিউনিষ্ট লীগের নেতারা। তাই জার্মানীর শ্রমিকদের উপদেশ দিলেন মার্কস, তারা যেন আপাতত গণতান্ত্রিক দলগুলির এক চরমপন্থী প্রগতিশীল অঙ্গ হিসাবে কাজ করে চলে এবং তারা যেন কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেয়।

তবে অন্য একটা বিষয়ে তাদের হুঁসিয়ার করে দিলেন মার্কস, যে কোন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পেটি বুর্জোয়ারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বিপ্লব সম্বন্ধে পেটি বুর্জোয়াদের মন চিরদিনই দ্বিধাগ্রস্ত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং পেটি বুর্জোয়াদের এই দ্বিধাগ্রস্ত মনের দূষিত ছোঁয়াচ থেকে যেন সর্বদা নিজেদের দূরে রাখে শ্রমিকরা। তারা যেন পেটি বুর্জোয়াদের তীব্র সমালোচনা করে চলে।

মার্কস বললেন, কমিউনিষ্টদের সব সময় মনে রাখতে হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন বৃহত্তর সমাজ বিপ্লবের একটা স্তরমাত্র। এই বৃহত্তর সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই বিপ্লবের জন্য তৈরি হতে হবে তাদের। তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে সারা দেশ জুড়ে।

নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুং দৈনিক পত্রিকাটি তখন ১৮৪৮ সালের ১লা জুন থেকে পুরোদমে কাজ করে চলেছে। মার্কস ছিলেন তার প্রধান সম্পাদক। সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন এঙ্গেলস, উল্‌ফ, ড্রঙ্কি, ও উযার্থ। সারা জার্মানী ও তার আশপাশের দেশগুলিতে 'নয়ে রাইনিশে' পত্রিকাটি তখন অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

নয়ে রাইনিশে পত্রিকার সংবাদ পরিবেশনে ও সম্পাদকীয় মন্তব্যের বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অনেকের। দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়তে

লাগল তার খ্যাতি। কথা নয়, যেন বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র। মাঝখানে লীগের সদস্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। নয়ে রাইনিশে পত্রিকায় মার্কসের লেখা পড়ে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল তারা, নতুন উদ্যমে মেতে উঠল গণআন্দোলনে।

নয়ে রাইনিশে পত্রিকার প্রধান ঘাঁটি ছিল রাইন প্রদেশে। কিন্তু নাগাউ, ব্রেসল, হামবুর্গ প্রভৃতি অঞ্চলেও এক উগ্র প্রকৃতির গণ-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল এই পত্রিকার প্রভাবে। একমাত্র দক্ষিণ জার্মানীতেই পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের লোকেরা কিছু বাধা দিল। ব্রেসেলসে উল্‌ফ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যেতে লাগলেন।

স্তেফান বর্ন তখন ব্রাসেলস্ ও প্যারিসে লীগের একজন সক্রিয় সদস্যরূপে কাজ করে যাচ্ছিলেন কিছুদিন পর বার্লিনের শ্রমিকদের নিয়ে এক ভ্রাতৃসঙ্ঘ স্থাপন করলেন তিনি। অনেকের মতে শ্রমিকদের এই ভ্রাতৃসঙ্ঘ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলনের মূল আদর্শ হতে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু তা গেলেও স্তেফান বর্ন বিপ্লবের কাজকর্ম ঠিকই করে যেতে লাগলেন। ১৮৪৯ সালের মে মাসে জার্মানীর ড্রেসডেনে যে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে বর্ন তাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন।

এই বিপ্লব অবশ্য সফল হয়নি। ঐ বছরের ১৩ই জুন তারিখে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেল এই বিপ্লব। এই সময় হাঙ্গেরীয় বিপ্লবও ব্যর্থ হয়। এইভাবে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবগুলি একে একে ব্যর্থ করে দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মাথা তুলে উঠতে থাকে আর বৈপ্লবিক শক্তি ও সংগঠনগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মার্কস দেখলেন, লীগের আবার পুনর্গঠন দরকার। পুনর্গঠিত লীগের মাধ্যমেই ছিন্নভিন্ন বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে সংহত করা সম্ভব কিন্তু গত বছরের মত এবারও সরকারী দমননীতি প্রবল থাকায় প্রকাশ্যে লীগের কাজ করা বা বিপ্লবের জন্য তৈরি হওয়া সম্ভবপর নয়। তাই ঠিক হলো, যা কিছু করতে হবে গোপনে করতে হবে।

নেতারা অবশ্য কেউ হাত গুটিয়ে বসে রইলেন না। সবাই সাধ্যমত কাজ করে যেতে লাগলেন। তখন ১৮৪৯ সালের শরৎকাল। লণ্ডনে আবার জড়ো হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা। স্ক্যাপার ছাড়া সবাই এলেন। স্ক্যাপার তখন জেলে। মল তখন যোগ দিয়েছেন ভাবপ্রবণ সাম্যবাদী উইলিক আর ওয়েটলিঙের দলে।

লীগকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা হলো। হেনরিখ বয়ারকে জার্মানীতে পাঠানো হলো লীগের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য। মার্কস ও এঙ্গেলস একটি আবেদন লিখলেন কর্মীদের উদ্দেশ্যে। এই আবেদন পত্রটি প্রকাশ করে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

হেনরিখ বয়ারের কূটনীতিতে নাম ছিল। তাঁর চেষ্টা সফল হলো। বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লীগের কাজকর্মের ধারা আবার নতুন করে প্রবাহিত হতে লাগল।

মার্কসের সম্পাদনায় 'রাইনিশে ৎসাইটুং' সংবাদপত্রটি তখনও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। এই পত্রিকার মাধ্যমে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালাতে লাগলেন মার্কস। বিপ্লবের ব্যর্থতার পর কৃষক ও মেহনতী মানুষদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এই বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েছিলেন জার্মানীতে। যারা বলতে লাগল এই বিপ্লবের ব্যর্থতাই শেষ কথা, মার্কস তাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়ে বললেন, এই বিপ্লব সব নয়, এখন থেকেই বৃহত্তর বিপ্লবের জন্য তৈরি হতে হবে মেহনতী মানুষকে।

১৮৪৮, ১৮৪৯ সালের বিপ্লবের ঝড় স্তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঠাণ্ডা করে সমগ্র পরিস্থিতিটা বিশ্লেষণ দেখবার চেষ্টা করে করলেন মার্কস। এঙ্গেলসও যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিলেন দুজনে। রাইনিশে পত্রিকায় ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে তা প্রকাশিত হলো।

কোন বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় যত রকমের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব তা যত দিন না পূর্ণ পরিণতি লাভ করে ততদিন কোন প্রকৃত বিপ্লব

সম্ভব নয়। যখন আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার আবির্ভাব হয় এবং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার সংঘর্ষ বাধে তখনই প্রকৃত বিপ্লব সম্ভব হয়।

নিদারুণ অর্থকষ্ট সত্ত্বেও মার্কসের সম্পাদনায় নয়া রাইনিশে পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে লাগল। তার প্রচারকার্যও ঠিকমত চলতে লাগল। নয়া রাইনিশে পত্রিকা যে সর্বহারা শ্রেণীর মুখপত্র তা প্রথম প্রকাশ পায় ১৮৪৮ সালের জুন মাসে। এই সময় বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে যে অন্তর্বিপ্লব চলে তাতে সর্বহারাদের শ্রেণীসংগ্রামকে বরণ করে নেন মার্কস ও এঙ্গেলস। বিপ্লবী সর্বহারাদের অসাধারণ বীরত্বের প্রশংসা করেন মার্কস এবং সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের জঘন্য প্রতিবিপ্লবের নিন্দা করেন তীব্র ভাষায়।

ফরাসী সর্বহারাদের পরাজয়ের পর বুর্জোয়াদের তৎপরতায় প্রতি-বিপ্লব মাথা তুলে উঠতে থাকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। আগষ্ট মাসে রাইন প্রদেশের কোলোনে গণতান্ত্রিক দলগুলির যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মার্কস তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। আগে মার্কসকে নিয়ে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন সেই কমিটিকে সমর্থন করে কাজ চালাবার ভার দেয়।

আগষ্ট মাস শেষ হতেই বার্লিন ও ভিয়েনা সফরে বেরিয়ে গেলেন মার্কস। প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ায় তখন চলছে রাজতন্ত্র। মার্কস দেখলেন এই রাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যতন্ত্র যতদিন কোন দেশের বুকে চেপে বসে থাকবে ততদিন কিছুতেই তীব্র হয়ে উঠতে পারবে না সর্বহারাদের শ্রেণীসংগ্রাম। মার্কস তাই বার্লিন ও ভিয়েনায় গিয়ে প্রথমে প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন শ্রমিক ও বামপন্থী গণতন্ত্র-বাদীদের সঙ্গে কথা বলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন।

বার্লিন ও ভিয়েনা যাওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল মার্কসের। নয়ে রাইনিশে পত্রিকার অর্থকষ্ট চলছিল অনেক দিন হতেই। তাই শ্রমিকদের কাছ থেকে কিছু টাকা যোগাড় করতেও লাগলেন। জুন

বিপ্লবের পর থেকে অনেক অংশীদার নয়ে রাইনিশে পত্রিকার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। ভিয়েনায় থাকাকালে গণতান্ত্রিক সংগঠন-গুলির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন মার্কস। শ্রমিকদের কয়েকটি সভায় যোগদান করে শ্রম ও মূলধন সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন।

কোলোনে ফিরে এসে মার্কস গণসংগঠনে মন দিলেন। দিকে দিকে প্রতি-বিপ্লবের যে প্রস্তুতি চলেছে যেমন করে হোক তাকে ব্যর্থ করতেই হবে। বুর্জোয়ার দালাল প্রতি-বিপ্লবীরা বহু জায়গায় শ্রমিকদের হত্যা করেছে। পুলিসী অত্যাচার ও বিভিন্ন রকমের উৎপীড়ন চলেছে শ্রমিকদের উপর।

১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোলোনের অন্তর্গত ফ্রাঙ্কেনপ্লাৎসে এক সাধারণ জনসভা ডাকা হলো নয়ে রাইনিশে পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর উদ্যোগে। এই সভায় জননিরাপত্তার জন্য অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য একটি কমিটি নির্বাচিত করা হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস সদস্য নির্বাচিত হন এই কমিটির। জার্মানীর কমিউনিষ্ট পার্টির দাবীগুলি জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়। নয়ে রাইনিশে পত্রিকা ও কোলোন শ্রমিক সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে আবার এক জনসভা ডাকা হয় কোলোনের কাছে ওয়াবিঙ্গেনে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে।

এইভাবে নয়ে রাইনিশে পত্রিকার ক্রমাগত প্রচারে সমগ্র রাইন প্রদেশের সাধারণ মানুষ জেগে উঠল, আশ্চর্যভাবে এক তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম ও গণবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল মনে প্রাণে। এই গণ-জাগরণে স্বভাবতই ভীত হয়ে উঠল জার্মান সরকার। নয়ে রাইনিশে পত্রিকার সম্মান প্রচুর বেড়ে গেল জনগণের মধ্যে।

গোলযোগের আশঙ্কায় কোলোনের চারিদিকে সৈন্য সমাবেশ করল সরকার। শুধু সৈন্য সমাবেশ করে ক্ষান্ত হলো না, প্রতিক্রিয়া-শীল সরকার, তাদের জঘন্য দমননীতির অসহায় শিকারে পরিণত করার জন্য নানা ভাবে প্ররোচিত করতে লাগল শ্রমিক ও নিরীহ জনগণকে।

মার্কস দেখলেন, সারা দেশ জুড়ে বৃহত্তর বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব এখনও সম্পন্ন হয়নি। বুঝলেন ঠিক এই মুহূর্তেই সরকারী সৈন্যদলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত হবে না। তাই প্রভূত সরকারী প্ররোচনা সত্ত্বেও শ্রমিকদের শান্ত করলেন মার্কস। তিনি তাদের এই বলে বোঝালেন যে, সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী যদি সারা দেশ জুড়ে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ঠিকমত যদি প্রস্তুত না হয় তাহলে বিচ্ছিন্ন ভাবে হঠাৎ কোথাও বিপ্লব করে বসলে সে বিপ্লব হবে হঠকারিতারই নামান্তর।

প্রুশীয় সরকার যখন দেখল, প্ররোচনায় কোন কাজ হলো না, তখন কোলোনে সামরিক আইন জারি করে অনেক ধরপাকড় শুরু করে দিল শ্রমিকদের মধ্যে। শ্রমিকদের মধ্য থেকে গড়ে তোলা গণফৌজকে বেআইনী ঘোষণা করে তাদের অস্ত্রসস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো। কয়েকটি সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে দিল সরকার। সবচেয়ে আগে হাত পড়ল নয়ে রাইনিশের উপর। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করল নয়ে রাইনিশে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর উপর। একমাত্র মার্কস ছাড়া সম্পাদক মণ্ডলীর সব সদস্যের উপরই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়। এঙ্গেলস রেহাই পেলেন না। পরে অবশ্য এ ব্যাপারে জোর প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠায় সরকার তার অন্যায় আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। অক্টোবর মাসের ৫ই তারিখে নয়ে রাইনিশে পত্রিকা আবার প্রকাশিত হতে থাকে।

হাতের কাছ থেকে এঙ্গেলস সরে যেতে পত্রিকা সম্পাদনা করতে মার্কসের অনেক সময় যেতে লাগল। পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সঙ্ঘ ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলির জন্যও কাজ করে যেতে লাগলেন। অক্টোবর মাসেই কোলোন শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মার্কস। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন মার্কস ভিয়েনায় বিপ্লবের কাজ কতখানি এগিয়েছে।

মার্কস এই সময় 'ভিয়েনার পতন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে মার্কস প্রতিবিপ্লবের আসল পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়ে সতর্ক করে দিলেন বিপ্লবীদের। মার্কস লিখলেন, প্রতিবিপ্লবীরা প্রুশিয়ায় সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। জনগণ একমাত্র বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের দ্বারাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

প্রুশীয় সরকার বার্লিন থেকে ব্র্যাণ্ডেনবার্গে জাতীয় সভা স্থানান্তরিত করার জন্য এক হুকুমনামা জারি করতেই মার্কসের নির্দেশে আঞ্চলিক গণতান্ত্রিক কমিটি জনগণকে সরকারী কর বন্ধ করে দিতে বললে। প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য ছোট পর্যায়ে আঞ্চলিক কমিটি তৈরির কথাও বলা হলো।

এত কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও প্রুশিয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের জয় হলো। বুর্জোয়া গণতন্ত্রবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতায় জাতীয় সভা বাতিল হয়ে গেল ৫ই ডিসেম্বর তারিখে। বিপ্লবীদের উপর সরকারী অত্যাচার কঠোরতর হয়ে উঠল তার ফলে। মার্কস ও এঙ্গেলসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো আদালতে। বলা হলো, সরকারকে অবমাননা করেছেন মার্কস। জনসাধারণকে কর দিতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের বিপ্লবে উত্তেজিত করেছেন।

মার্কস নিজে আদালতে অভিযোগ অস্বীকার করে বক্তৃতা দিলেন। পর পর দুদিন আদালতে হাজির হলেন মার্কস। সরকারের উপর পাল্টা অভিযোগ আনলেন মার্কস। সব কথা শুনে কোনমতেই মার্কসকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলে না আদালত।

নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুং শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও শ্রমিক বিপ্লবীদের স্বার্থে কাজ করে যেতে লাগল। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে 'শ্রমিক বেতন ও মূলধন' শীর্ষক মার্কসের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এইটিই হলো মার্কসের প্রথম অর্থনৈতিক রচনা। কোন পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সর্বহারা শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তব ভিত্তি কি তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ

করলেন মার্কস। পুঁজিবাদী শোষণের ভয়ঙ্কর রূপটিকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুললেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মেহনতী মানুষের দারিদ্র্যের মূল কারণ কি এবং কিভাবে তারা ধীরে ধীরে শোচনীয় দুর্দশার কবল-গ্রস্ত হয় তা সহজভাবে যুক্তির সঙ্গে বুঝিয়ে বললেন।

অনেকের মতে শ্রমিক বেতন ও মূলধনই হলো মার্কসের রাজনীতি-ভিত্তিক অর্থনীতি বিষয়ক বৃহত্তর গবেষণার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই বইএর মধ্যে মার্কসের অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাধারার প্রথম বিকাশ হয় সে চিন্তাধারা পরিপূর্ণ ও চরম পরিণতি লাভ করে মার্কসের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দাস ক্যাপিট্যালে।

তখন এপ্রিল মাস। বসন্তকাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন মার্কস। মার্কস দেখলেন, এতদিন গণতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে কোন লাভই হয়নি বিপ্লবীদের। সাম্রাজ্যবাদীদের ঘায়েল করার জন্য অনেক সময় অবশ্য গণতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। কিন্তু যে কোন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ারা তাতে ভিড়ে গিয়ে সে আন্দোলনের নেতৃত্ব হতে বঞ্চিত করে শ্রমিকদের। অনেক সময় আবার বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে আঁতাত করে শ্রমিকস্বার্থের বিরোধিতা করে। এইভাবে চিরকালই প্রতিটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে বুর্জোয়ারা। সুতরাং গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নাম করে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না বুর্জোয়া বা পেটি বুর্জোয়াদের।

তাঁর পুরনো নীতির পরিবর্তন করলেন মার্কস। তিনি দেখলেন পেটি বুর্জোয়াদের সব রকমের অখণ্ড প্রভাব হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধ শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া শ্রমিক আন্দোলন ও বৃহত্তর শ্রেণীসংগ্রাম সম্ভব নয়। তাছাড়া মার্কস দেখলেন, আজ ইউরোপের প্রতিটি দেশের মেহনতী মানুষদের মনে রাজনৈতিক চেতনা

এসেছে; অনেক পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক অবস্থার। পেটি বুর্জোয়া পরিচালিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির অসারতা প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করেছে তখন দিকে দিকে।

তাই এপ্রিলের মাঝামাঝি মার্কস ও এঙ্গেলস পরিচালিত কোলোন শ্রমিক সঙ্ঘ পেটি বুর্জোয়াদের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন। জার্মানীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ছিন্নভিন্ন কমিউনিষ্ট লীগের শাখা-প্রশাখার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। লীগের আশাহত সদস্যদের সম্পর্কটাকে দৃঢ় করলেন।

এই উদ্দেশ্যে উত্তর পশ্চিম জার্মানী ও ওয়েষ্টফ্যালিয়া সফরে বার হলেন মার্কস। প্রায় জার্মানীর সব জায়গায় বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবীদের মধ্যে লড়াই চলছিল। স্যাক্সনি, রাইনম্যান, ওয়েষ্টফ্যালিয়া, প্যালেশাইনেৎ ও বেডেনে এক তীব্র সংগ্রামে মেতে উঠেছিল সাম্রাজ্য-বাদের সমর্থকরা। ফ্যাঙ্কফুট পার্লামেণ্টে যে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া সংবিধান গৃহীত হয় সেই সংবিধানের সমর্থনে লড়াই করছিল তারা।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীলরা যাই করুক, শ্রমিক শ্রেণীরাও চুপ করে ছিল না। সর্বহারা শ্রমিকরা শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠেছে তখন দেশে দেশে। গণবিপ্লবের নতুন ঢেউ বইতে শুরু করেছে ফ্রান্স ইটালি ও হাঙ্গেরীতে। বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের সঠিক নেতৃত্ব দান করার জন্য এক পরিকল্পনা করলেন মার্কস ও এঙ্গেলস।

কিন্তু এবারও শ্রমিকরা নেতৃত্ব দান করতে পারল না গণবিপ্লবের: অন্যবারের মত এবারও পেটি বুর্জোয়ারাই পরিচালনা করতে লাগল বিপ্লবের কাজকর্মের। আগের মতই এবারও তারা সব কুণ্ঠা ও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারল না বিপ্লবে। তারা চাইছিল সাবধানে পা ফেলে এগোতে। পদে পদে ভয় করে চলছিল তারা লড়াইয়ে নেমে। তাদের এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের ফলে শ্রমিকরা এগিয়ে যেতে পারছিল না সাহসের সঙ্গে। পেটি বুর্জোয়াদের অতি

সতর্কতার জন্য ব্যর্থ হয়ে পড়ছিল শ্রমিকদের সমস্ত বীরত্ব। আর তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে অত্যাচারী প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় সরকার একে একে ব্যর্থ করে দিল গণবিপ্লবের সমস্ত অভিযানকে। ব্যর্থ করে দিল বিপ্লবীদের সমস্ত প্রয়াস আর প্রতিশ্রুতি।

রাইন প্রদেশে বিপ্লবীদের ঘাঁটিগুলো ভেঙ্গে দিয়ে বিজয়গর্ভ অনুভব করল প্রতিবিপ্লবী প্রুশীয় সরকার। এরপর প্রুশীয় সরকার মার্কস ও তাঁর সম্পাদিত নয়ে রাইনিশে পত্রিকার বিরুদ্ধে একই সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করল।

১৮৪৫ সালে মার্কস তাঁর প্রুশীয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করে রাইন প্রদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এই যুক্তি দেখিয়ে প্রুশীয় সরকার তাঁর বিরুদ্ধে দেশত্যাগের নির্দেশ দিলেন। সরকার বলল, মার্কস নাগরিকত্ব ত্যাগ করে দেশ ছেড়ে একদিন চলে যাবার পর আবার এলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সরকার বরং তাঁকে অতিথির মত স্থান দিয়েছিল। কিন্তু আতিথেয়তা বা রাজনৈতিক আশ্রয়ের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করেছেন মার্কস।

মার্কস ও নয়ে রাইনিশে পত্রিকার সম্পাদকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলো। ফলে নিষেধাজ্ঞা জারি হলো পত্রিকার বিরুদ্ধে। কোনক্রমেই আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না পত্রিকাকে, দীর্ঘদিন শ্রমিকদের ও সর্বহারা জনগণের সেবা করে বৃহত্তর শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের জন্য সারা ইউরোপ জুড়ে মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বন্ধ হয়ে গেল মার্কসের বড় সাধের নয়ে রাইনিশে পত্রিকা।

১৮৪৯ সালের ১৯শে মে শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হলো নয়ে রাইনিশে পত্রিকার। গোটা পত্রিকাটাই ছাপা হলো লাল কালিতে। এই সংখ্যাটি হলো বিদায় সংখ্যা। এই সংখ্যাটিতে সম্পাদকরা কোলোন শ্রমিকদের কাছে বিদায় জানিয়ে লিখলেন।

In bidding your farewell the editors of the Neue Rheinsche zeitueng thank you for your support.

Their last word will always and every where be, the emancipation of the working class.

শ্রমিকদের কাছে তাঁদের শেষ কথা বলে বিদায় নিলেন মার্কস ও নয়ে রাইনিশে পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী। বললেন, আমাদের শেষ কথা বলো, মেহনতী মানুষের মুক্তি।

নয়ে রাইনিশের ভাষা গত এপ্রিল থেকেই কঠোর হতে কঠোরতর হয়ে উঠছিল দিনে দিনে। বসন্তকাল পড়তেই লীগ নেতা উইলহেম উলফ সাইলেসিয়ার শোষিত কৃষকদের দাবীর সপক্ষে পর পর আটটি সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন নয়ে রাইনিশে পত্রিকায়। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'সাইলেসিয়ান মিলিয়ার্ড, এই প্রবন্ধে তিনি দেখান কিভাবে সামন্তবাদী শোষক জমিদাররা সরকারের সহযোগিতায় গরীব চাষীদের একই সঙ্গে তাদের প্রাপ্য জমি আর টাকা থেকে বঞ্চিত করেছে। কৃষকদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট জমিদার ও সরকারের কাছ থেকে এক হাজার মিলিয়ান টেলার্স দাবী করেন উল্ফ।

এর পরই মার্কসের 'শ্রমিকবেতন ও মূলধন' শীর্ষক রচনাটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসাবে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এমনি করে 'নয়ে রাইনিশে' একের পর এক করে প্রতিটি সংখ্যায় বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে দেশে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রাণপণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য ওজস্বিনী ভাষায় ডাক দেয় শোষিত কৃষক ও শ্রমিকদের। বলে, সময় হয়েছে, প্রস্তুত হয়েছে বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র, আর নয়, এবার ঝাঁপিয়ে পড় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। তারপর আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এ সংগ্রামের শুরু হয় ফ্রান্স আর জার্মানীতে ১৮৪৮ এর ব্যর্থ বিপ্লবের জের হিসাবে।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ও বার্লিন এ্যাসেমব্লির প্রতি একটানা আক্রমণের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের অসারতাকেই প্রমাণ করেন মার্কস এবং তাঁর সম্পাদিত নয়ে রাইনিশে। সেখানকার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সব সদস্যদেরই তীব্র নিন্দা করেন তিনি।

আসলে পার্লামেণ্টে কাজের কাজ কিছু হয় না। সেখানে শুধু আগে থাকতে তৈরি বক্তৃতা পড়া হয়, বড় বড় প্রস্তাব নেওয়া হয়, যে সব প্রস্তাবে প্রগতিশীলতার নামগন্ধ থাকে না থাকলেও কার্যকারী হয় না। দক্ষিণপন্থীদের মত বামপন্থী সদস্যরাও কম দোষী নন। কারণ মুখে তাঁরা গণতন্ত্র আর প্রগতির কথা বললেও আসলে তাঁরা পেটি বুর্জোয়া চিন্তাধারায় চিন্তিত। মামুলি কুঠার সেই পুরনো কাঁটা দিয়ে স্বতস্ফূর্ত গণবিপ্লবের স্রোতকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চান তাঁরা। আঘাতে আঘাতে তাঁদের চিন্তার ভিত্তিটাকে কাঁপিয়ে তুললেন মার্কস।

একদিকে মসি আর অন্যদিকে অসি। একই সঙ্গে দুইদিকে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল নয়ে রাইনিশে পত্রিকা। প্রুশীয় সরকারের আট হাজার সৈন্য সুসজ্জিত এক বিরাট দুর্গের অদূরে নয়ে রাইনিশের সম্পাদকীয় দপ্তরে সব সময়ের জন্য থাকত আড়াইশোটি তাজা কার্তুজের সঙ্গে বেয়নেটওয়ালা আটটি রাইফেল। প্রেসের কম্পো-জিটারদের মাথায় থাকত লাল জ্যাকোটিন টুপী। সরকারী অফিসাররা সার্চ করে বলল, পত্রিকা অফিসটা ছোট-খাটো একটা দুর্গ।

নয়

যাই হোক, কুলিশ সরকারী হাতের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নয়ে রাইনিশের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল চিরদিনের মত। মাঝখানে একবার বন্ধ হয়ে আবার চালু হয়েছিল। এবার আর কোন আশা রইল না। জন্মের পর থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলতার অসংখ্য বাধা বিপত্তি মেনে চলতে হচ্ছিল নয়ে রাই-নিশেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্র এক বছরের মধ্যেই নয়ে রাইনিশে লাভ করেছিল ছয় হাজার স্থায়ী গ্রাহক। আর লাভ করেছিল অকুণ্ঠ জনসমর্থন। রাইন প্রদেশের কেন্দ্রস্থল কোলোনে বসে জার্মানী জুড়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল নয়ে রাইনিশে, বিশেষ করে সর্বহারা

শ্রেণীকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করেছিল গণবিপ্লবের আদর্শে তা এর আগে আর কোন জার্মানী পত্রপত্রিকা পারেনি।

পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে এখানে সেখানে চলে গেলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা। এঙ্গেলস চলে গেলেন প্যালে-শাইনেতে এবং সেখানে গিয়ে যোগ দিলেন উইলিকের গড়া স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনীতে আর মার্কস গেলেন দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীতে। প্যালেশাইনেতে তখনও লড়াই চলছিল বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবীদের মধ্যে।

১৮৪৮ সালে প্রকাশিত সাম্যবাদী ইস্তাহারের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কতকগুলি দলের নীতি ও কর্মসূচী সম্বন্ধে কতকগুলি জরুরী কথা ছিল।

ফেবরুয়ারি বিপ্লবের সময় জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল কমিউনিষ্ট লীগেরই অন্য নাম। ছোট একটি গোপন সংস্থা হিসাবে কাজ করে যেত। এর একমাত্র কাজ ছিল প্রচার। শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের সঞ্চার, সর্বহারা শ্রেণী হিসাবে সমাজ-বিপ্লবে তাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে দেওয়াই ছিল এই দলের প্রধান কাজ। কিন্তু যা কিছু করতে হত দলের লোককে, করতে হত গোপনে। স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী রাজতন্ত্রের দ্বারা শাসিত জার্মানীতে তখন দল গড়ার বা রাজনৈতিক কাজকর্ম করার কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাছাড়া সারা দেশে তখন ছিল নানা-রকমের বিভেদ, ছিল তিরিশটি বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায়। ফলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে জমাট বেঁধে উঠতে পারছিল না আশানুরূপ ঐক্য।

কিন্তু সে যাই হোক, সবচেয়ে সৌভাগ্যের কথা এই যে সেদিন-কার জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টি পেয়েছিল মার্কসের মত প্রতিভাবান একজন নেতা যিনি একাধারে ছিলেন অসমসাহসিক আপোষহীন যোদ্ধা, অক্লান্ত কর্মী এবং তত্ত্বস্রষ্টা দার্শনিক, যিনি সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাধা ঠেলে পার্টিকে নিয়ে চলেছিলেন নিশ্চিত অগ্রগতির দিকে।

মার্কস রচিত সাম্যবাদী ইস্তাহারের মূল কথা হলো শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন। দেশে দেশে খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষদের

এক স্বার্থবোধের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে তাদের নিয়ে একটি অখণ্ড দল গড়ে তোলাই হলো মার্কসবাদী ইস্তাহারের প্রধান লক্ষ্য। তাই ইস্তাহার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করল,

সাম্যবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীকে বাদ দিয়ে তাদের স্বার্থবিরোধী অন্য কোন পৃথক দল কখনও গড়বে না।

সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও তাদের স্বার্থ এক এবং অভিন্ন।

সর্বহারাদের শ্রেণীসংগ্রামকে কার্যে রূপদান করার জন্য শ্রমিক-শ্রেণীর সামগ্রিক প্রকল্প বা নীতির বাইরে তারা কোন পৃথক খণ্ডনীতি স্থাপন করবে না।

তবে অন্যান্য শ্রমিক দলগুলির সঙ্গে সাম্যবাদী দলের যে দুইটি প্রধান পার্থক্য আছে তা হলো এই যে, দেশে দেশে বিভিন্ন জাতীয়তা-বাদের সীমার মধ্যে অন্যান্য শ্রমিকদলগুলি যেখানে খণ্ডভাবে লড়াই করে চলেছে, সাম্যবাদীরা সেখানে সমস্ত দেশ ও জাতীয় সীমার উর্ধে সর্বহারা শ্রমিক সমাজের এক সাধারণ স্বার্থ ও ঐক্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে সারা পৃথিবী জুড়ে সমস্ত শ্রমিকদের নিয়ে একটিমাত্র দল গড়ে তুলতে চায়। সাম্যবাদীদের আর একটি কাজ হলো, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর গণ-আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই আন্দোলনকে সব সময়ে যে কোন অবস্থায় অগ্রাধিকার দিয়ে চলা।

এইভাবে দেখা যায় বাস্তব দিক থেকে সব দেশেই অন্যান্য যত সব শ্রমিকদল থেকে সাম্যবাদী দল সবচেয়ে উন্নত ও প্রগতিশীল, সে দল অন্যান্য দলগুলিকেও অগ্রগতির পথে সহায়তা করে। আবার তত্ত্বের দিক থেকেও অন্যান্য দলের থেকে সাম্যবাদীদের যে একটি সুবিধা আছে তা হলো এই যে, একমাত্র এই সাম্যবাদী দলই শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী আন্দোলনের প্রকৃত অবস্থা ও চূড়ান্ত পরিণাম সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা সঞ্চারিত করে দিতে পারে।

সাধারণভাবে এই কথা বলার পর জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে

বিশেষভাবে কতকগুলি কথা বলা হয় ইস্তাহারে। ইস্তাহারে স্বীকার করা হয়, জার্মানীতে সর্বগ্রাসী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক হয়ে মিলে মিশে লড়াই করেছে সাম্যবাদীরা। কিন্তু তা করলেও বুর্জোয়া ও শ্রমিক সমাজের মধ্যে যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে সে ব্যবধানের কথা বারবার শ্রমিকদের মনে পড়িয়ে দিতে ক্ষণ-কালের জন্যেও ভোলেনি তারা। তারা তখন বারবার একথা বলেছে, এই জার্মান শ্রমিকরাই একদিন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের নিঃশেষে উচ্ছেদ করবে, বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াদের যত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভুত্বের ঘটাবে অবসান। কিন্তু বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মেতে ওঠার আগে দেশের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীশক্তিগুলিকে ঘায়েল করা দরকার।

অল্প কিছুদিনের জন্য জার্মানীতে থাকার পর মার্কস দেখলেন, আবার নতুন বিপ্লবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ফরাসী দেশে। তাই দেখে আবার প্যারিসে গিয়ে উঠলেন তিনি। পুরনো সমাজব্যবস্থাকে আমূল ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলার এক অদম্য উদ্দীপনা এক প্রচণ্ড আলোড়ন অন্তরে সব সময় অনুভব করেন মার্কস। তাই যখন যেখানেই নতুন সমাজবিপ্লবের আভাস পান, সেখানেই ছুটে যান সে বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্য।

প্যারিসে গিয়ে মার্কস দেখলেন, ফরাসী পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র-বাদীরা তখন শ্রমিক দলগুলির সঙ্গে রয়েছে জড়িয়ে। মার্কস সেখানে যেতেই তারা বারণ করে দিল তাঁকে। তখন ১৮৪৯ সালের জুন মাস। ১৩ই জুন তারিখে হঠাৎ শুরু হয়ে গেল এক প্রচণ্ড শ্রমিক আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে। সরকার ভাবল, এর জন্য মার্কসই দায়ী, মার্কসের প্ররোচনাতেই সম্ভব হয়েছে এই আন্দোলন। সরকার আরও ভাবল, মার্কসকে আর এদেশে থাকতে দেওয়া উচিত হবে না।

এইসব সাত পাঁচ ভেবে মার্কসের উপর বহিষ্কারের আদেশ জারি

করল ফরাসী সরকার। কিন্তু এই আদেশে কিছুমাত্র দমলেন না মার্কস। তিনি লণ্ডনে গিয়ে নতুন উদ্যমে লীগের কাজকর্ম করার মনস্থির করলেন।

লণ্ডনে গিয়ে একই সঙ্গে দুটো কাজ করতে হলো মার্কসকে। সে কাজে তাঁকে সাহায্য করার জন্য এঙ্গেলসও জার্মানীর প্যালেশাইনেৎ থেকে হাজির হলেন লণ্ডনে। কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নতুন কর্মপন্থা ঠিক করলেন মার্কস। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ পূর্ব ইউরোপে থাকাকালীন তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা লেখা ও প্রচারের জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন। নয়ে রাইনিশেকে আবার নতুন করে বাঁচিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পত্রিকা বার করার কথাও চিন্তা করতে লাগলেন মার্কস।

১৮৪৯ সাল তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কমিউনিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে কাজকর্ম শুরু করে দিল আবার। লীগের নেতাদের মধ্যে এক তীব্র মতভেদ দেখা দেয় এই সময়। উইলিক স্ক্যাপার প্রভৃতি কয়েকজন নেতা জার্মানীতে সশস্ত্র বিপ্লবের উপর জোর দিতে লাগলেন। কিন্তু মার্কস তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, এখনও সে সময় আসেনি। এটা হবে নেহাৎ হটকারিতা, বিপ্লব নিয়ে খেলা করা। কেন্দ্রীয় কমিটির বেশীর ভাগ সদস্যই সমর্থন করলেন মার্কসকে। লণ্ডন লীগের মধ্যে উগ্রপন্থীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় লণ্ডন থেকে কোলোনে স্থানান্তরিত করলেন মার্কস।

পুরনো বছর শেষ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দিনের অনেক কথাই মনে পড়ল মার্কসের। পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে যে বিপ্লব ঘটে গেছে তার গতিপ্রকৃতি আর ব্যর্থতার কথা ভেবে দেখতে লাগলেন নতুন করে।

এই সময় দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন মার্কস। একটি হলো ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম আর একটি হলো লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ

ব্রুমেয়ার। প্রথম রচনাটি ১৮৫০ সালে আর দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হল ১৮৫২ সালে।

মার্কস দেখলেন, ফরাসী দেশে গণতন্ত্রের চরম বিকাশ না ঘটার জন্য সামাজিক শ্রেণীসংগ্রাম সফল হয়ে উঠতে পারেনি সেখানে। কিন্তু তা না হলেও দুটো প্রধান শিক্ষা লাভ হয়েছে তার থেকে। ইতিহাসে এই প্রথম একটি স্বাধীন সামাজিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে শ্রমিকশ্রেণী। আর শ্রেণীসংগ্রামের আসল চেহারা ও চরিত্রটা ধরা পড়ে গেছে। একদিন ফ্রান্সে যারা বিপ্লবের আগেভাগে ছিল, সেই মধ্যবিত্ত ছোট খাটো পুঁজিপতি ও কারিগর শ্রেণী বুর্জোয়া পক্ষের সামিল হয়ে যায় বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে।

ফরাসী দেশের ফেবরুয়ারি বিপ্লব বুর্জোয়া রাজা লুই ফিলিপকে সিংহাসনচ্যুত করে। বুরবঁ রাজবংশের পতনের পর সিংহাসনে বসতে পেরেছিলেন ফিলিপ ব্যাঙ্ক মালিক ও পুঁজিপতিদের সহায়তায়। শ্রমিক-শ্রেণীর সংগামী চাপে পতন ঘটল লুই ফিলিপের। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের নামে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করল। তখন শ্রমিকশ্রেণী প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। ফেটে পড়ল আবার বুর্জোয়া বিরোধী বিপ্লবে। কিন্তু এ বছরের জুন মাসের শ্রমিক অভ্যুত্থান পরাজিত হলো সম্পূর্ণভাবে। পরে অবশ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াদের অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে সম্রাট নেপোলিয়নের বংশধর লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা দখল করে বসেন আকস্মিকভাবে। নিজেকে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বলে ঘোষণা করেন। এইভাবে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ হয়ে যায় ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রাম।

ফ্রান্সের ফেবরুয়ারি বিপ্লবের সময় ব্রাসেলস্ থেকে নির্বাসিত হয়ে প্যারিসে আসেন মার্কস। সেখান থেকে আবার সহকর্মীদের নিয়ে জার্মানীতে গেলেন এপ্রিল মাসে। কিন্তু জার্মানীতে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতিবিপ্লব জয়ী হওয়ায় জার্মানী থেকে প্যারিসে চলে যান মার্কস। অবশেষে ১৮৪৯ সালের জুন মাসে

ফ্রান্সে পেটি বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম একেবারে ব্যর্থ হবার পর সরকার নির্বাসিত করল মার্কসকে। তখন লণ্ডনে চলে আসেন তিনি।

কিন্তু বিপ্লবের ফল যাই হোক, সমগ্র বিপ্লবকালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে কয়েকটি শিক্ষা পেলেন মার্কস সত্যিই তা অনন্য। প্রথম কথা হলো, পেটি বুর্জোয়ারা যে গণতন্ত্রের ধূয়ো তোলে তা প্রুধোঁর কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদের মত নিতান্তই এক ফাঁপা জিনিষ। পার্লামেণ্টে গলাবাজি করে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করবে—জনস্বার্থবিরোধী এই স্বপ্ন ও মোহে সব সময় বিহ্বল হয়ে আছে পেটি বুর্জোয়া মধ্যবিত্তরা।

মার্কসের দ্বিতীয় শিক্ষা হলো, কৃষকসমাজকে শ্রমিকসমাজের বন্ধু হিসাবে বিপ্লবে টেনে আনতে হবে। শ্রমিক কৃষক মৈত্রী ও তাদের সম্মিলিত অভিযানই সফল করে তুলতে পারে বিপ্লবকে। লুই বোনাপার্ট কৃষকদের ভুল বুঝিয়ে তাদের সাহায্যেই বিপ্লবকে ব্যর্থ করে স্বৈরাচারী সার্বভৌম শাসক হয়ে বসতে পেরেছিলেন।

মার্কস বললেন, এর আগে ইতিহাসে যত বিপ্লব ঘটেছে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন; প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে বজায় রেখে শাসনক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু প্রোলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেলে নতুন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলা।

সাম্যবাদী কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহারের শেষের দিকে বলা হয়, কমিউনিষ্টরা তাদের লক্ষ্য ও ক্ষমতাকে গোপন করতে ঘৃণা বোধ করে। তারা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে তাদের লক্ষ্যে পৌছনো যায় একমাত্র বলপ্রয়োগের সাহায্যে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে।

ইস্তাহারে আরও বলা হয়, সর্বহারা বিপ্লবের প্রথম ধাপ হচ্ছে শাসন ক্ষমতা দখল করা, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে জয়ী হওয়া। বুর্জোয়া

শ্রেণীর হাত থেকে সব মূলধন ছিনিয়ে নেবার জন্য সর্বহারা শ্রেণী তার রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও ব্যবহার করবে; রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদনের সমস্ত যন্ত্র যাতে কেন্দ্রীভূত হয় ও উৎপাদনের শক্তি যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ে তার জন্য চেষ্টা করবে। এইভাবে যখন একে একে উৎপাদনের সব উপকরণগুলো রাষ্ট্রের হাতে এসে পড়বে আর তার ফলে শ্রেণীগুলো নিশ্চিহ্ন হবে এবং উৎপাদনের উপর সমাজের সামগ্রিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আর রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন প্রয়োজন হবে না। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতা সাধারণতঃ এক শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার জন্য আর এক শ্রেণী ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু যখন কোন শ্রেণী কোন শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবে না বা কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না তখনই দেখা দেবে সাম্যবাদী সমাজ। সেই সাম্যবাদী সমাজ হবে এমন একটি সমাজ যার মধ্যে প্রত্যেক মানুষের অবাধ বিকাশ ও উন্নতিই হবে সকলের অবাধ বিকাশ ও উন্নতির পূর্ব শর্ত।

প্রোলেতারীয় বিপ্লবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তার আন্তর্জাতিকতা। মার্কস ও এঙ্গেলস ঘোষণা করলেন, সর্বহারাদের বিপ্লবের ফলে জাতিগত সমস্যার সমাধান হবে। কারণ এক সমাজতান্ত্রিক জাতি অন্য জাতির উপর পীড়ন করবে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পোল্যাণ্ডের ১৮৩০ সালের অভ্যুত্থানের কথা। ম্যানিফেস্টো লেখার কাছাকাছি সময়ে সেই অভ্যুত্থানের একটি স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে যান মার্কস ও এঙ্গেলস। সেই অনুষ্ঠানে তাঁরা বলেছিলেন, প্রোলেতারীয় বিপ্লবের সফলতা বিশ্বের পীড়িত জাতি গুলির মুক্তি এনে দেবে।

এঙ্গেলস আরও বলেন, কোন জাতি সত্যিকারের স্বাধীন বলে গণ্য হতে পারে না, যদি সে অন্য কোন জাতিকে পীড়ন করে।

অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কসের প্রথম রচনা হলো ১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি।

মার্কস তাঁর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগসূত্র বিশ্লেষণ ও তার সামগ্রিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেন। মার্কসের মতে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্কগত মূল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে। পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটিই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে।

মার্কস দেখলেন, অর্থনীতি নিয়ে আরও তাঁকে গবেষণা করতে হবে। সমাজের ঐতিহাসিক প্রগতির সঙ্গে উৎপাদনপ্রক্রিয়ার যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সেটি শুধু দর্শন নয় অর্থনীতির বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল প্রস্তাবগুলির বিশ্লেষণ করতে হলে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাঁকে অবশ্যই করতে হবে।

মার্কস ঠিক করে ফেললেন, একটি বিশাল গ্রন্থে মানব সভ্যতার আদি যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অর্থনীতির গতিপথ পুরোপুরি ভাবে আলোচনা করে দেখাবেন। এর জন্য দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হবে তাঁকে। অর্থনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় সব বই পড়ে ফেলতে হবে। প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলিকে ভালভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

নতুন বছর অর্থাৎ ১৮৫০ সাল পড়তেই কাজ শুরু করে দিলেন মার্কস। এক একখানি অর্থনীতির বই পড়েন আর তার সঙ্গে নিজের মন্তব্য লিখে রাখেন। আবার নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন।

এ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন মার্কস। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের ঔদাসিন্যকে মার্জনা করতে পারেননি মার্কস। অর্থনীতি কিভাবে মানুষের সমাজ ও ইতিহাসের অগ্রগতিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে চলে তা তাঁরা ধরতে পারেননি।

এঙ্গেলস একবার ঠাট্টা করে লেখেন, এই সব বিরাট পণ্ডিতরা যখন কিছু বলেন তখন মনে হয়, ইংলণ্ডে একাদশ শতাব্দীতে 'সিংহহৃদয়' রাজা রিচার্ড অর্থনীতির খোঁজখবর যদি জানতেন তাহলে তিনি খৃষ্টানদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (Crusade) সময় নষ্ট করতেন না। তা না করে দেশে দেশে স্বাধীন বাণিজ্যের ব্যবস্থা করতেন। আর তার ফলে ইউরোপ শান্তিতে থাকতে পারত।

ইতিহাসের নিগূঢ় বাস্তব বিশ্লেষণের দ্বারা মার্কসই প্রথম দেখালেন, সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি আর মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক কী অমোঘভাবে ইতিহাসকে প্রভাবিত করে। এই নিয়ে আবার অনেক পণ্ডিত মার্কসের সমালোচনা করে বলেন, মার্কস ছিলেন অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী। তিনি ইতিহাসের ব্যাখ্যায় অর্থনীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির বিভিন্ন ধারা চিন্তা ও নীতি আজ প্রকাশ পায় যুগে যুগে, এরাও কাজ করে ইতিহাসের নিয়ন্তা হিসাবে।

কিন্তু এর জবাবে মার্কস বললেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক ইউরোপে একাদশ শতাব্দীতে কর্তৃত্বের নীতি বলবৎ ছিল, ঠিক যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতি। তর্কের খাতিরে বলতে হবে এই নীতিই সৃষ্টি করেছিল শতাব্দীকে, শতাব্দী নীতিকে সৃষ্টি করেনি। অর্থাৎ নীতিই ইতিহাস সৃষ্টি করে, ইতিহাস নীতিকে সৃষ্টি করে না। কিন্তু একথা মেনে নিলে প্রশ্ন ওঠে, এক শতাব্দীতে এক নীতি আর এক শতাব্দীতে অন্য এক নীতি আত্মপ্রকাশ করেছিল কেন আর কেনই বা দুই নীতি এক শতাব্দীতে দেখা দেয়নি সে প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আরও অনেক খুঁটিনাটি খবর আমাদের জানতে হবে। জানতে হবে, অষ্টাদশ ও একাদশ শতাব্দীতে মানুষ কেমন ছিল, তাদের সমাজিক জীবনের চাহিদা কি কি ছিল, তাদের উৎপাদনশক্তি কেমন ছিল আর তাদের উৎপাদনের পদ্ধতিইবা কেমন ছিল ; কোন কোন

কাঁচামাল নিয়ে তারা উৎপাদন চালাত। আর সবশেষে জানতে হবে, মানুষে মানুষে কি সম্পর্ক তখন ছিল।

এইভাবে দেখা যাবে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ইতিহাসের স্রষ্টা। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্নভাবে ইতিহাসকে দেখেছেন। ঐতিহাসিক গীবন বলেছেন, ইতিহাস যেন মানুষের অপরাধ আর নির্বুদ্ধিতা আর দুর্ভাগ্যের তালিকা। অনেকে আরও বলেন, ইতিহাস শুধু কতকগুলো তথ্যের সমষ্টি, যে সব তথ্যের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ খোঁজা নিরর্থক আর এই সব তথ্য নিছক কতকগুলি ঘটনা। আবার অনেকে বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বরনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী। আবার কেউ কেউ মনে করেন, মাঝে মাঝে এক একজন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সমস্ত জল্পনা কল্পনার অসারতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন মার্কস। সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, বাঁচতে হলে সবচেয়ে আগে মানুষকে গ্রাসাচ্ছাদন আর বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা না থাকলে রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব হবে না মানুষের পক্ষে। তাই কিভাবে মানুষ বাঁচার জন্য যাবতীয় পণ্য উৎপাদন করছে এবং তা করতে গিয়ে কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, সেটাই হলো একটা যুগের ইতিহাসের মূল কথা। কোন যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ-বিধি এবং চিন্তাধারা কি ছিল তা বুঝতে হলে সে যুগে মানুষ কিভাবে কাজ করত, উৎপাদন ব্যবস্থা কেমন ছিল এবং মানুষে মানুষে সমাজ-সম্পর্কই বা কি ছিল তা জানতে হবে। মানুষের বাস্তব জীবনযাত্রার ধারাকে অনুধাবন করলে তবেই বুঝতে পারব, বার বার কেন যুগ বদলায়, সমাজে পরিবর্তন কেন আসে এবং কেমন করেই বা সে পরিবর্তন নিয়ে আসে মানুষ। জানতে পারব, সমাজ বিকাশের মধ্যে কোন ধারা কাজ করে চলেছে।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের গোড়াতেই বলা হয়েছে, আজ পর্যন্ত অনেক

রকমের সমাজ দেখা দিয়েছে মানুষের জগতে এবং তাদের সকলেরই ইতিহাস হলো শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। পাদটীকায় এঙ্গেলস জানিয়েছেন এখানে ইতিহাস বলতে বোঝাচ্ছে লিখিত ইতিহাস। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃত্তান্ত ঠিক জানা যায় না। তাছাড়া সে যুগে রাষ্ট্র ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। রাষ্ট্রের আবির্ভাব হলো তখনই, যখন মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিছক ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন কে বা কারা উপভোগ করবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে দেখা দিল শ্রেণী-বিভাগ। শুরু হলো শোষক ও শোষিত, উৎপীড়ক ও উৎপীড়িতের সকরুণ কাহিনী। রাষ্ট্র স্বয়ম্ভূ বা সনাতন কোন প্রতিষ্ঠান নয়। সমাজ-পতিরা ক্ষমতা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্তৃত্ব ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার হাতিয়ার হলো রাষ্ট্রব্যবস্থা, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মানুষের ইতিহাস আর তখন থেকেই নানাভাবে সূচনা হলো শ্রেণীসংগ্রামের যার অবিরাম ধারা আজও চলে আসছে।

স্বাধীন মানুষ ও দাসগণ, অভিজাত ও সাধারণ লোক, মধ্যযুগের গিল্ড প্রতিষ্ঠানের কর্তারা ও তাদের মেহনতী কর্মচারীরা, এক কথায় প্রতি যুগে শোষক ও শোষিত শ্রেণী পরস্পরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, অবিরাম আপোষহীন আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে; কখনও প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনও বা পরোক্ষভাবে।

গ্রীসের মনীষী এ্যারিষ্টোটল বলেছিলেন, দাসপ্রথা একান্ত স্বাভাবিক, প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতই অপরিহার্য। দাসরা ছিল যেন সেকালের সভ্যতার পিলশূজ। তাদেরি মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকত সে কালের সভ্যতার প্রদীপ। সভ্যতার আলোর নিচের তলায় থেকে দাসরা দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে বাঁচিয়ে রাখত অন্ধকার থেকে সেদিনের সভ্যতাকে।

প্রথম প্রথম এইসব শোষিত উৎপীড়িত দাসরা কোন কথা বলত না। মুখ বুঝে সহ্য করত যত সব অত্যাচার! মাঝে মাঝে কবিকণ্ঠে

প্রতিবাদ ধ্বনিত হত দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে অভ্যুত্থান ঘটেনি দাসদের, ততদিন বিলুপ্ত হয়নি দাসপ্রথা। শ্রমিকশ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্তনে বা মহানুভবতায় এ প্রথার বিলুপ্তি ঘটেনি, ঘটেছে নিরন্তর নিষ্করুণ শ্রেণীসংগ্রামের ফলে। মালিকরা যখন দেখল পুরনো কায়দায় দাসদের আর পদানত করে রাখা যাবে না তখন বাধ্য হয়ে তারা তুলে দিল সে প্রথা।

দাসপ্রথা উঠে গেলেও শোষণ বন্ধ হলো না। দাসপ্রথার পর এল ভূমিদাসপ্রথা। ভূমিদাসদের ইউরোপে বলা হত সার্ফ। তখন সমাজে সবচেয়ে শক্তিশালী শ্রেণী ছিল সামন্ত, জায়গিরদার ও জমিদার-গোষ্ঠী। তাদের সমর্থন ও সাহায্যের উপর রাজাদের নির্ভর করতে হত, বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহের সময়। সামন্ততান্ত্রিক গ্রামকেন্দ্রিক সে যুগে কৃষিকর্মই ছিল মানুষের প্রধান বৃত্তি। শহরের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। কলকারখানাও ছিল না বললেই হয়। ধনীদের বিলাসদ্রব্য তৈরির জন্য অল্প কিছু ছোট ধরণের কারখানা ছিল। সামন্ততান্ত্রিক যুগে ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে ছিল না তা নয়। প্রাচীন ভারতবর্ষ পশ্চিম এশিয়া ও রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা করত। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের খুব একটা প্রচলন ছিল না সে যুগে। ফিউডাল যুগের শেষের দিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই শহরের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কলকারখানাও বাড়তে লাগল। অবশেষে শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারিগরি বিদ্যা ও উৎপাদন ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি দেখে এক শ্রেণীর শিল্পপতির আবির্ভাব হলো যাদের ফরাসী ভাষায় বলা হয়ে থাকে বুর্জোয়া বা নগরবাসী। এই সব শহরপতিরা আগে হতেই সামন্তদের উপর রেগে ছিল, তাদের ক্ষমতায় ঈর্ষা করত, কারণ জমিদারদের এলাকায় ব্যবসাগত লেনদেনের জন্য শুল্ক দিতে হত তাদের; তাছাড়াও জমিদারদের নানান হুকুম তামিল করতে হত তাদের।

এবার শহর ও বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতিরাও বেড়ে উঠল

সংখ্যা ও ক্ষমতায়। ফলে তারা এবার রাজাদের হাত করে তাদের সাহায্য নিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রতিপত্তি ছিনিয়ে নিতে চাইল সামন্তদের কাছ থেকে। আন্দোলন করতে লাগল সামন্তদের বিরুদ্ধে।

ইতিহাসে আমরা যাকে বলি রাজায় রাজায় বা জাতিতে জাতিতে বা বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া বা সংগ্রাম তার মধ্যেও আছে সূক্ষ্ম অর্থনৈতিক কারণ। ইউরোপে যে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল তার কারণ শুধু ধর্ম নয়, মুসলমানদের দখল থেকে খৃষ্টান তীর্থগুলোকে উদ্ধার করার জেদ নয়; অর্থও তার অন্যতম কারণ। এই ক্রুসেডের ফলেই বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল, এশিয়ার আর্থিক ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল সমগ্র ইউরোপ। ভারতবর্ষের পথ খুঁজতে গিয়েই আমেরিকা আবিষ্কার করে বসলেন কলম্বস। তারপর ভারত ও আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এক অশান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মেতে উঠল ইউরোপের জাতিগুলো। অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল তাদের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের মূলে।

ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূলেও আসল কারণ হচ্ছে অর্থনীতি। নতুন আবিষ্কার করা উপনিবেশগুলো খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতেই ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড ক্ষেপে গেল। ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রথমে জার্মানীতে শুরু হলেও ইংল্যাণ্ড তাতে মদত না যোগালে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মতবাদ প্রসার লাভ করতে পারত না এতখানি।

ইংলণ্ডে স্টুয়ার্ট যুগে রাজনৈতিক বিপ্লবের মূলেও রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনীতির এক একটা ধারা আর উৎপাদনপদ্ধতি বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস কেমন ভাবে বদলে যায় এ বিপ্লব তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। টিউডর যুগে অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল থেকে ১৬০৩ সালের মধ্যে পশম আর পশমি জিনিষের কারবার খুব লাভজনক হয়ে ওঠে ইংল্যাণ্ডে। এ জন্য চাষের জমি থেকে চাষীদের উৎখাত করে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে

মেষপালনের ব্যবসা করা হয়। অনেক পুঁজিপতি মুনাফার লোভে নেমে যায় এই কারবারে। গির্জার অধীনস্থ অনেক সম্পত্তিও কেড়ে নেওয়া হয়। রাজার সাহায্যেই এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী এক শ্রেণীর ধনবান মানুষ এই সব কাজ করে। ফলে সর্বস্বান্ত ভূমিহীন বেকার চাষীরা ভিড় জমাতে থাকে শহরে এসে। তখন তাদের 'ভবঘুরে' থাকার মিথ্যা অপবাদে বেত মারা হয়। আরও অনেক শাস্তি দেওয়া হয়। টমাস মুর তার 'ইউটোপিয়া' বইখানিতে লিখেছিলেন, ভেড়ার দল মানুষগুলোকে গিলে খাচ্ছে।

টিউডর যুগের পর ইংল্যাণ্ডে এল স্টুয়ার্ট যুগ। ১৬০৩ সাল থেকে শুরু করে সে যুগ চলে ১৬৮৮ সাল পর্যন্ত। তখন দেশের বাণিজ্যের নীতি নির্ধারণ করত রাজা আর তাঁর অভিজাত ডিউকরা। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভবান ধনিকশ্রেণী আস্বাদ পেয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের আরও সুযোগ সুবিধার জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের হাত করে শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইল রাজার কাছ থেকে। পার্লামেন্টের সঙ্গে বাধল রাজার ঝগড়া আর ক্ষমতার লড়াই। আর সে লড়াইএ মাথা কাটা গেল রাজা প্রথম চার্লসের। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের আমলে যারা শাসন ক্ষমতায় কোন অংশ পেত না, তারাই করত এই ধরনের নানা রকমের বিপ্লব আর চক্রান্ত।

এরপর ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটল এবং শুরু হলো বুর্জোয়া যুগ। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন পদ্ধতির অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল আর ইউরোপীয় বণিকরা ভারত ও আমেরিকার উপনিবেশগুলি থেকে ধনদৌলত ও টাকাকড়ি প্রচুর পরিমাণে লুঠ করে এনে সেই টাকায় অনেক কল-কারখানা গড়ে তুলতে পেরেছিল নিজেদের দেশে।

কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে আরও বলা হয়, কিন্তু ভাল সমাজের ধ্বংসাবশেষ হতে যে বুর্জোয়া সমাজ জন্ম নিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে যায়নি। নূতন সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে

সৃষ্টি হয়েছে নূতন শ্রেণীর, অত্যাচারের নূতন কায়দা আর সংগ্রামের নূতন পদ্ধতি। আমাদের এই বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখন শ্রেণীসংগ্রাম খুব সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এখন গোটা সমাজটাই বুর্জোয়া আর প্রোলেতারীয়েত—এই বিরাট দুই গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেছে। এই দুই শ্রেণী এখন পরস্পরের বিরুদ্ধে সামনা-সামনি রুখে দাঁড়িয়েছে।

মার্কস বললেন, ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, মায়ের দেহ হতেই যেমন নবজাতকের আবির্ভাব হয় তেমনি পুরনো সমাজ-দেহের ভিতর থেকেই আবির্ভাব হয় নূতন সমাজের। অর্থাৎ সমাজদেহের মধ্যেই থাকে এমন সব অসঙ্গতি বা কনট্রাডিকশান যা পুরনো সমাজ ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। আজকের এই বুর্জোয়া যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উৎপাদনপদ্ধতিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে আর তার ফলে উৎপাদনফলও যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন-ফলের সমবণ্টনের কোন ব্যবস্থা নেই যার ফলে এ যুগে উৎপাদন-সম্পর্ক অর্থাৎ মালিক-মজুরের সম্বন্ধ জটিল হয়ে উঠেছে অত্যন্ত। অতি মুনাফার লোভে মালিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিরা মজুরদের যতদূর সম্ভব শোষণ করছে আর শোষিত সর্বহারা মজুররাও শ্রেণী স্বার্থরক্ষার তাগিদে নেমে পড়েছে আপোষহীন এক সংগ্রামে। তারা আজ বেশ বুঝতে পেরেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ না হলে তাদের সুখশান্তি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না।

১৮৪৮ সালের শ্রমিক অভ্যুত্থান থেকে একটি প্রধান শিক্ষা পেয়েছিলেন মার্কস। ফ্রান্সের শ্রেণীসংগ্রাম বইটিতে সুন্দরভাবে লিখে গেছেন তিনি এই শিক্ষার কথাটি। তিনি এটা ভালভাবে বুঝলেন যে, সমাজের বুক থেকে বুর্জোয়া প্রভুত্ব দূর করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সবচেয়ে আগে চাই শ্রমিক কৃষক সংহতি। শোষিত শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন স্বার্থসংঘাত ও আন্দোলনের মাধ্যমে আগেই জেগে গেছে। আগে হতেই শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠেছে।

সুতরাং এই জাগ্রত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে স্বীকার করে শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকশ্রেণী তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সংগ্রামে যোগ না দিলে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হবে না। আর তা না হলে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রও কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এই বইটিতেই মার্কস তাঁর বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ব্যাখ্যা করে বললেন, দীর্ঘ শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আর তার আনুসঙ্গিক ফলস্বরূপ বুর্জোয়া উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন-সম্পর্কের উচ্ছেদই হলো বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ। তিনি লিখলেন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ হলো,

The declaration of the permanence of the revolution, the class dictatorship of the proletariat as the necessary transit point to the abolition of all relations that correspond to these relations of productions to the revolutioning of all the idea that result from these relations.

উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণীসম্পর্ক ও সমাজসম্পর্কের পরিবর্তন হলেই ঘটবে সামাজিক ভাবধারার বৈপ্লবিক রূপান্তর।

দশ

১৮৪৮-৪৯ এর বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়ে গেল তার ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া। বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোর করে ভেঙ্গে দেওয়া হলো। বড় বড় শ্রমিক নেতাদের ধরে জেলে ঢোকান হলো। অনেককে আবার দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মার্কসের জীবনেও নেমে এলো এক তীব্র সংকট। ইউরোপের প্রায় সব দেশেরই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী অনেকদিন

থেকেই সুযোগ খুঁজছিল মার্কসের উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য। এবার সেই বহু আকাঙ্খিত সুযোগ তারা পেয়ে গেল। মার্কসের একমাত্র অপরাধ তিনি শোষিত ও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রতি সচেতন করে তুলেছেন। সব রকমের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য বৈপ্লবিক প্রেরণা দিয়েছেন তাদের। সেই অপরাধের জন্য এবার চরম শাস্তি দেওয়া হলো মার্কসকে। তাঁকে দেশ হতে তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। তাঁর সম্পাদিত কাগজগুলিকে একে একে বন্ধ করে দেওয়া হলো। তাঁর বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হলো। এমন কি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজও যাতে না পান তার ব্যবস্থাও করা হলো।

তবু এত সংকটেও হতাশ হবার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না মার্কস। ভেঙ্গে পড়লেন না বিন্দুমাত্র। সামাজিক অগ্রগতির বস্তুসাপেক্ষ নিয়মগুলি সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁরা বর্তমানের কোন সংকটজনক অবস্থাতেই ভয় পান না কখনও। তাঁরা জানেন কোন এক বিশেষ অবস্থার গণ্ডীর মধ্যে কোন ব্যক্তি জীবন বা সমাজজীবনই থেমে থাকতে পারে না কোনদিন। এগিয়ে চলাই সব কিছুর ধর্ম। নিরন্তর এগিয়ে চলেছে যুগ জীবন ও সমাজ।

সমাজ জীবনের বিরামহীন গতিশীলতায় গভীর বিশ্বাস ছিল মার্কসের তিনি ছিলেন আশাবাদী। সব বিপ্লবীই আশাবাদী। কোন অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতে অবিচল অপরিমেয় আশা না থাকলে কোন বিপ্লবী লড়াই করতে পারে না তার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে। এমনি এক অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক স্বপ্নসিক্ত প্রত্যাশায় সব সময়ের জন্য মশগুল হয়ে থাকতেন মার্কস। তিনি বিশ্বাস করতেন, সারা বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা চিরদিন কখনই থাকবে না, তাঁর ব্যক্তি জীবনের দুরবস্থাও চিরদিন থাকবে না।

বাড়িতে দিনরাতই পড়াশুনোর কাজ করেন মার্কস। পড়াশুনো

আর লেখালেখি। নতুন নতুন রচনার খসড়া তৈরি করেন। ভাল না লাগলে কোনটা বা ছিঁড়ে ফেলেন আবার কোনটা বা নতুন করে ভাল করে লেখেন। স্ত্রী জেনি সংসারের অভাব অনটনের কথা প্রায় কিছুই জানান না মার্কসকে। কারণ জেনি জানতেন স্বামীকে সেকথা জানিয়ে কোন ফল হবে না। উল্টো শুধু ব্যাঘাত ঘটবে তাঁর কাজে। সারা দুনিয়ার শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর চিরদিনের মত দুঃখ দূর করার এক বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারে যিনি সব সময়ের জন্য দেহ ও মনের দিক থেকে ব্যস্ত, ব্যক্তিজীবনের বা পারিবারিক জীবনের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবার সময় কোথায় তাঁর।

তাছাড়া জেনিও চান না ব্যক্তিজীবনের এই সব ছোটখাটো কথা ভেবে ভেবে মনটা ছোট হয়ে যাক মার্কসের, তাঁর মহৎ লক্ষ্য থেকে সরে এসে তিনি শুধু তাঁর ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকুন চিরদিনের জন্য।

এই সময় মার্কসের কনিষ্ঠ পুত্র মারা গেল হঠাৎ অসুখে। কিন্তু দুদণ্ড বসে বিষণ্ণ হয়ে ভাবনা বা শোকপ্রকাশের সময় নেই তখন তাঁর। কিছুদিন আগে হতেই এক বিরাট কাজে হাত দিয়েছেন তিনি। বিন্দু-মাত্র অবকাশ নেই সে কাজের চাপের মাঝে। শ্রম, মূলধন, উৎপাদন, বণ্টন, শ্রমিকের বেতন প্রভৃতি অর্থনীতির বিষয়গুলিকে নতুন করে ভেবে দেখতে শুরু করেছেন মার্কস। দুনিয়ার সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার জন্য একটু মায়াকান্না কেঁদে অথবা দায়সারা গোছের একটু মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত হতে চান না তিনি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে মূলধনের থেকে শ্রমের মূল্য কত বেশী, পুঁজিবাদী মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য ফাঁকি দিয়ে ভোগ করে কিভাবে, কিভাবে তাদের শোষণ করে চলে, তথ্যভিত্তিক বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন।

১৮৫০ সালে এঙ্গেলস ইংলণ্ডে চলে এলেন। এঙ্গেলসকে দেখে অনেকখানি সাহস পেলেন মার্কস। এঙ্গেলসও আশ্বাস দিলেন, কিছু

ভাববেন না; আপনি আপনার কাজ করে যান, দেখি কি করতে পারি। আয়ের নতুন উৎস কোথায় কিভাবে পাওয়া যায়, সংসার কিভাবে চালানো যায় তা আমি দেখছি।

লণ্ডনে মার্কসের সঙ্গে দেখা করেই ম্যাঞ্চেষ্টারে চলে গেলেন এঙ্গেলস। কিন্তু এঙ্গেলসকেও যা হোক কিছু একটা করতে হবে। লণ্ডনে তাঁরও কোন আয়ের উৎস নেই। তাই চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন এঙ্গেলস। লেখালেখি ও পড়াশুনোর কাজ বন্ধ রইল কিছু-দিনের জন্য। মার্কসের কিছু রচনা প্রকাশের জন্যও চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিছুদিনের চেষ্টায় একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে কাজ পেলেন এঙ্গেলস। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাম্যবাদী ইস্তাহারের জার্মানী থেকে ইংরিজি অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করে ফেললেন। অনুবাদ করলেন হেলেন ম্যাকসালেন। এই অনুবাদটি প্রকাশিত হলো 'রেড রিপাবলিকান' পত্রে।

যদিও দুজনে দু' জায়গায় থাকতেন, মার্কস লণ্ডনে আর এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেষ্টারে তবু নিয়মিত পত্রালাপ হত দুজনের মধ্যে। এই সময় দু-জনের মধ্যে যেসব চিঠি বিনিময় হয় সেই সব চিঠিগুলির গুরুত্ব অনেক। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা হয় এই সব চিঠিতে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সঠিক জ্ঞান এবং প্রয়োগ কিভাবে রাষ্ট্রীয়, অর্থ-নীতিকে নতুন করে রূপদান করে, ইতিহাস, দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞান, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই বস্তুবাদ কিভাবে কাজ করে চলে তাঁরা তা খুটিয়ে আলোচনা করেন দুজনে।

মার্কসের সব লেখা চিঠিপত্রগুলি আলোচনা করে দেখা যায় ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত মার্কস মোটামুটিভাবে শুধু ভাবতেন দর্শনের কথা। সাম্য-বাদের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনার জন্য চিন্তার দিক থেকে দারুণ ব্যস্ত ছিলেন মার্কস। সর্ব্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক ভাবধারা এবং কর্মকৌশল সম্বন্ধে অনেক কিছু চিন্তা করেন অনেক কিছু লেখেন। তারপর ১৮৫০ সাল

থেকে তিনি ভাবতে শুরু করেন শুধু অর্থনৈতিক সমস্যার কথা। তাঁর ইচ্ছা ছিল ১৮৫১ সালের মধ্যেই তিনি তাঁর সমস্ত অর্থনৈতিক মতামত-গুলি নিয়ে তিন খণ্ডের একখানি বই লিখবেন।

কিন্তু সে ইচ্ছা সফল হলো না মার্কসের। প্রথমতঃ এত বড় পরিকল্পনাকে মাত্র এক বছরের মধ্যে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ সংসারের অভাব মার্কসের মনটাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। স্বচ্ছলতা না হোক সংসারটাকে টানাটানি করে চালাতে হলেও নিয়মিত একটা আয়ের উৎস দরকার। সেই আয়ের উৎস খোঁজার কাজেই প্রতিদিন অনেকটা করে সময় চলে যেতে লাগল মার্কসের। সুতরাং ঠিক সেই পরিমাণ লেখা ও চিন্তায় সময় নষ্ট হতে লাগল প্রতিদিন।

মার্কস তখন সপরিবারে থাকতেন লণ্ডনে ক্যাম্বারওয়েলে একটা ভাড়াটে ঘরে। কিন্তু তিনি তখন একেবারে বেকার। থাকবার একটা আস্তানা পেয়েছেন। কিন্তু কোন কর্মসংস্থান পাননি। জার্মানীর রাইন প্রদেশে ট্রেভসে মার্কসের সামান্য কিছু জমি ছিল। কিন্তু সেখানে যাবার কোন উপায় নেই বলে অন্যকে দিয়ে কোন রকমে সেই জমিটা বিক্রি করিয়ে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলেন মার্কস। আর সেই টাকায় প্রথম নির্বাসনের কয়েকটা মাস কোনরকমে কাটল।

মার্কস দেখলেন, অন্য কোন চাকরি করা সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে। তিনি চান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এখন একটা কিছু করতে যার সঙ্গে তাঁর চিন্তা ও নীতিগত আদর্শের থাকবে না কোন বিরোধ, যা নিবিয়ে যাওয়া সমাজ-বিপ্লবের আগুনকে নতুন করে জ্বালিয়ে তুলবে সারা ইউরোপের মধ্যে।

হঠাৎ একটি নতুন পরিকল্পনা করে এঙ্গেলসকে চিঠি লিখলেন মার্কস।

মার্কস জানালেন তিনি আবার একটি নতুন মাসিক পত্রিকা বার করতে চান। তার নাম হবে নয়ে রাইনিশে রেভ্যু। তার পাতার

সংখ্যা হবে মাত্র আশী। একটি জয়েন্ট ষ্টক কোম্প্যানি গড়ে তুলে তারই উপর ভার দেওয়া হবে এই পত্রিকা চালাবার উপযুক্ত টাকা যোগাড় করার। মার্কসের ইচ্ছা, এই পত্রিকা তিনি লণ্ডন থেকে সম্পাদনা করবেন, তা প্রকাশিত হবে জার্মানীর হামবুর্গ শহর থেকে।

মার্কস আরও বললেন, আমার বিশ্বাস সমাজবিপ্লব আবার শুরু হবে ফ্রান্স থেকে। আর এই পত্রিকা তৈরি করবে তার নতুন পটভূমি। বৈপ্লবিক চিন্তার ছাইচাপা স্ফুলিঙ্গগুলো ছড়িয়ে দেবে মানুষের মনে মনে।

এঙ্গেলসও তাই চাইছিলেন। তাই কোন আপত্তি করলেন না। বরং খুশি হয়ে চেষ্টায় নেমে পড়লেন মার্কসের পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্য।

কিন্তু প্রথম সংখ্যা বার করতেই অনেক বেগ পেতে হলো দুজনকে। শুধু টাকার অভাব নয়, ভাল লেখা পাওয়াও সমস্যা হয়ে উঠল। মার্কস আর এঙ্গেলসকেই লিখতে হলো প্রায় সব লেখা। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, নয়ে রাইনিশে রেভ্যুর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৮৫০ সালের ১লা জানুয়ারি। কিন্তু লেখা যোগাড় করে হামবুর্গে পাঠাতে দেরি হয়ে যাওয়ায় তা হলো না।

বেরোতে দেরি হলেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না পাঠকদের পক্ষ থেকে। যাই হোক মার্কস ও এঙ্গেলসের বহু মূল্যবান লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে তৈরি হতে লাগল নয়ে রাইনিশে রেভ্যু পরের সংখ্যার জন্য। কিন্তু বিপ্লবের কোন লক্ষণ আর দেখা গেল না। বুর্জোয়ারা তখন মনের আনন্দে পুঁজি সঞ্চয়ে ব্যস্ত, পেটি বুর্জোয়ারাও বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। শ্রমিকরা হতাশা ও ক্লান্তির অনতিক্রম্য নিবিড়তায় বাধ্য হয়ে নিজেদের সঁপে দিয়েছে ভাগ্যের হাতে।

তবু মার্কসের আশা একেবারে ফুরিয়ে গেল না। শুধু মার্কস নন,

স্বয়ং প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় সরকারও মনে করত, লাল বিপ্লব আবার খুব শীঘ্রই শুরু হবে। হয়ত হত। কিন্তু হঠাৎ তার সম্ভাবনাটা দূর হয়ে গেল। হঠাৎ খবর এল আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় এক সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

নয়ে রাইনিশে রেভ্যুর দ্বিতীয় সংখ্যায় এই খনি আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্বন্ধে লিখলেন মার্কস। লিখলেন, আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে এই খনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে নিঃসন্দেহে।

পরের মাসে এই ধারণাই সকলের মনে দেখা দিতে লাগল যে, ইউরোপে সমাজ বিপ্লব এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রয়ে গেল। ক্রমে এই ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হলো আর সেই বিশ্বাস ধীরে ধীরে মার্কসের মনটাকেও ছেয়ে ফেলল। তিনি তাঁর পত্রিকার একটি সংখ্যায় স্বীকার করলেন, আজ বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা তার সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে থেকে যেভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, তাতে ঠিক এখন বিপ্লবের কোন কথাই উঠতে পারে না। তিনি লিখলেন,

There can be no talk of a real revolution when the productive forces of bourgeois society are flourishing as luxuriantly as possible within the framework of bourgeois conditions. Such a revolution can only take place in periods when these two factors, the modern forces of production and the bourgeois forces of production are in antagonism each to the other.

মার্কস বললেন, আমি মনে করি, একমাত্র যখন এই বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক উৎপাদন পদ্ধতির সংঘর্ষ বাধবে আর তার ফলে ধ্বসে যেতে শুরু করবে বুর্জোয়া উৎপাদনব্যবস্থা তখনই শুরু হবে প্রকৃত সমাজ বিপ্লব।

সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনির সাহায্যে দিনে দিনে সমৃদ্ধ

হয়ে উঠতে লাগল ইউরোপের পুঁজি। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ফলে ধীরে ধীরে বিকল হয়ে আসতে লাগল সাম্যবাদী ইস্তাহারের ফলশ্রুতি। ব্যর্থ হয়ে এল বিপ্লবের ঘোষিত বাণী। স্তিমিত হয়ে এল সব আশা। আর শেষ হয়ে গেল শিশু নয়ে রাইনিশে রেভ্যুর আয়ু।

১৮৪৯ সালের শেষ। নতুন বছরের শুরুর মধ্যেই কমিউনিষ্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সংস্কার ও পুনর্গঠন হয়েছিল আর তার কেন্দ্র হয়েছিল লণ্ডন। এই নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য মার্কসের কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। কারণ আকস্মিক কোন বড় রকমের একটি বাস্তব ঘটনা কত সদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা বোঝার মত অন্তর্দৃষ্টি তাদের ছিল না। তাঁরা তাই প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে লাগলেন মার্কসের। বলে বেড়াতে লাগলেন বিপ্লবের পরিস্থিতি সম্বন্ধে মার্কসের ধারণা ভুল।

১৮৫০ সালের মার্চ মাসেই কমিউনিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা বিপ্লবের পক্ষে কতখানি অনুকূল তা ব্যাখ্যা করে একটি আবেদন প্রচার করল। তাতে লেখা হলো, বিপ্লবের কাল আসন্ন। গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখতে বা খতম করতে চাইলেও আমরা চাই বিপ্লবকে দীর্ঘজীবী করতে। যতদিন পর্যন্ত না সর্বহারারা রাষ্ট্রশক্তি দখল করতে পেরেছে, যতদিন পর্যন্ত না সকল সমাজের উৎপাদনব্যবস্থা সর্বহারাদের হাতে এসেছে, শুধু কোন একটি বিশেষ দেশে নয় যতদিন না সারা দুনিয়ার সব দেশে সর্বহারারা জয়ী হয়েছে ততদিন আমাদের বিপ্লব চলবে। কোন শ্রেণীর বাধা আমরা মানব না।

আবেদনপত্রে আরও বলা হলো, এই বিপ্লব আনবে ফরাসী শ্রমিক শ্রেণী। সর্বহারা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী গণতান্ত্রিক পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে ঠিক ততখানি হাত মেলাবে যতখানি তাদের শ্রেণীশত্রুদের খতম করার জন্য দরকার।

এই আবেদনপত্রে শুধু মার্কসের সই ছিল না। সমগ্র আবেদন-

পত্রটি মার্কসকে দিয়েই লেখানো হয়েছিল। ইচ্ছা না থাকলেও অতি উৎসাহীদের চাপে পড়েই তা লিখেছিলেন মার্কস।

শুধু আবেদনপত্র প্রচার করেই ক্ষান্ত হলেন না কেন্দ্রীয় কমিটি, ব্রুনো বয়ারকে পাঠান হলো কোলোনে। কোলোনে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে ফেললেন বয়ার। অনেক সমর্থকও পেয়ে গেলেন বয়ার। বয়ারের গড়া প্রতিষ্ঠান কৃষক শ্রমিক ও যুবকদের মধ্যে ভালভাবেই ছড়িয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে গোটা গ্রীষ্মকালটাই চলে গেল। গাছে গাছে সব পাতা ঝড়ে গিয়ে নতুন কলি গজিয়ে উঠল। কিন্তু প্রত্যাশিত বিপ্লব আর এল না। জার্মান বুর্জোয়ারা ফেঁপে উঠতে লাগল দিনে দিনে। সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়াতে লাগল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে লাগল পেটি বুর্জোয়ারা।

কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিকূল সরকারের নির্মম তাড়া খেয়ে যে সব বিপ্লবী বাস্তত্যাগীরা লণ্ডনে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাঁরা কমিউনিষ্ট লীগের সদস্য হয়েছিলেন, তাঁরা আর চুপ করে বসে থাকতে চাইলেন না। তাঁরা ইতিহাসের শিক্ষা ও বাস্তব অবস্থার যুক্তিকে অস্বীকার করে এই মুহূর্তেই লড়াই চাইলেন। পরিবর্তন চাইলেন তাঁদের দুরবস্থার।

লীগের সাধারণ সদস্যদের এই প্রবল অসহিষ্ণুতার ছায়া কেন্দ্রীয় কমিটিতে এসে পড়ল। মতবিরোধ ঘটল নেতাদের মধ্যে। লুই ব্রাঁ ম্যাৎসিনি, রোলিন, রুগে, উইলিক এঁরা সবাই গোঁড়া বিপ্লবপন্থী। ক্রমে এই বিরোধ চরমে উঠল।

অবশেষে ১৮৫০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে উইণ্ডমিল ষ্ট্রীটের পার্টি অফিসে কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী সভা বসল। দুই বিরুদ্ধ মতবাদীদের তর্ক বিতর্ক হতে হতে উত্তেজনার ঝড় বইতে লাগল। দেখতে দেখতে মতবিরোধ যুক্তিতর্কের পথ ছেড়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ

শুরু করল। উইলিক ত এক সময় মার্কসকে 'ডুয়েল ফাইটে' চ্যালেঞ্জ করলেন। এরপর আর কখনই একসঙ্গে কাজ করা যায় না। তাই মার্কসই প্রথম ভাঙ্গনের প্রস্তাব তুললেন।

কমিউনিষ্ট লীগ ভেঙ্গে গেল। দুই দলে ভাগ হয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। মার্কসই হলেন এই মতবিরোধের মূল কেন্দ্রস্থল। তাই দশজন সদস্যের মধ্যে একদল গেলেন মার্কসের পক্ষে আর একদল গেলেন তাঁর বিপক্ষে। মার্কসের সঙ্গে রইলেন এঙ্গেলস, বয়ার, ইকরিয়াস, ফ্যাণ্ডার আর কনর‍্যাড স্ক্র্যাম। তাঁর বিপক্ষে গেলেন উইলিক, স্ক্যাপার, লেম্যান আর ফ্রাঙ্কেল।

লীগের ভাঙ্গন সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে মার্কস বললেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ এই সদস্যরা দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে একেবারে গোঁড়া আদর্শবাদী, তাঁরা মোটেই বাস্তববাদী নন। বর্তমান বাস্তব অবস্থা ও কার্যকারণ সম্পর্ক বিচার না করে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছাটাকেই বিপ্লবের পরিস্থিতি বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরে নিচ্ছেন। আমরা সব সময় শ্রমিকদের এই শিক্ষাই দিতে চাই যে, তোমরা বিপ্লবের জন্য সব দিক দিয়ে তৈরি হও। শুধু সমাজের বাস্তব অবস্থা নয়, তোমাদের নিজেদের আমূল পরিবর্তনের জন্য বিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর অন্তর্বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। এইভাবে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য হয়ে উঠতে হবে তোমাদের। কিন্তু ওঁরা, অর্থাৎ আমার অতিবিপ্লবী বন্ধুরা শ্রমিকদের বলছেন, এই মুহূর্তেই আমরা ক্ষমতা চাই আর তার জন্য এখনই ঝাঁপিয়ে পড় বিপ্লবে আর তা যদি না হয় তবে বিছানায় গিয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোও। আমরা যখন জার্মান শ্রমিকদের অনুন্নত অবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, ওঁরা জার্মান কুটির-শিল্পীদের শ্রেণীগত ও জাতিগত কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করছেন। গণতান্ত্রিকরা যেমন 'জনগণ' কথাটাকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে তেমনি ওরাও সর্বহারা কথাটাকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। বিপ্লবের আদর্শ ও

কর্মপদ্ধতির উন্নয়নের কোন চেষ্টা না করে ওঁরা কতকগুলো বৈপ্লবিক শব্দের উপরেই জোর দিচ্ছেন বেশী।

যাই হোক লীগের ভাঙ্গনের পর থেকে রাজনীতির কাজ অনেক কমিয়ে দিলেন মার্কস। তাছাড়া পূর্ব ইউরোপের লীগের পুনরুজ্জীবনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান অফিস্ কোলোনে স্থানান্তরিত করলেন। সেখানে প্রায় ছয় মাস ধরে ভালই কাজ করে গেল কেন্দ্রীয় কমিটি। বেছে বেছে অনেক লোককে সদস্য করল। ভিতরে ভিতরে অনেক প্রচারকার্য চালাল। কিন্তু হঠাৎ পুলিশের নজরে পড়ায় সব নষ্ট হয়ে গেল। এই সময় হঠাৎ একদিন পুলিশ বহু কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করে ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করল। কমিউনিষ্ট লীগের সদস্যদের এই বিচারই আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে 'কোলোন ট্রায়াল' নামে খ্যাত।

কিন্তু পরে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো পুলিশের এ কাজ সম্পূর্ণ অন্যায় ও বেআইনী। কারণ লীগের অফিসে গিয়ে সদস্যদের গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ যে সব কাগজপত্র উদ্ধার করে তাতে আপত্তিকর কিছুই ছিল না। ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধের কোন প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছিল না।

মার্কস পরিবারের আর্থিক অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ। টেডসের বাড়ি বিক্রির টাকা ফুরিয়ে গেল। নয়ে রাইনিশে রেভ্যু পত্রিকাখানি দুই তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পরই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মার্কসের শেষ আশাও ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক ট্রিবিউনে প্রতি সপ্তায় দুটো করে লেখা পাঠিয়ে ছ পাউণ্ড করে যে পারিশ্রমিক পেতেন তাতে সংসার চলত না। সুখ-অসুখ ত দূরের কথা।

মার্কস দম্পতি ১৮৪৯ সালের জুন মাসে লণ্ডনে বাস্তত্যাগী হয়ে যখন আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে ছিল তিনটি সন্তান। দুটি মেয়ের পর একমাত্র ছেলে এডগার। এক বছরের মধ্যে আর একটি নবজাতক

এসেছিল তাঁদের সংসারে। এসেছিল একটি মেয়ে। নাম রাখা হয়েছিল ফ্রান্সিসকা। কিন্তু আসার কিছুদিনের মধ্যেই এই নিঃস্করুণ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয় ফ্রান্সিসকাকে। তার কোন দোলনা ছিল না। কিন্তু সে মারা গেলে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করার জন্য কফিন কেনারও টাকা ছিল না। তখন তার মা পাগলের মত পাশের বাড়িতে ছুটে গিয়ে মেয়ের শেষকৃত্যের জন্য মাত্র দু পাউণ্ড ধার করে নিয়ে আসেন।

মার্কসের পুরনো বন্ধু জোশেফ ওয়েডমেয়ার আমেরিকায় গিয়ে বস-বাস করছিলেন। তিনি হঠাৎ একদিন একটি চিঠিতে জানালেন তিনি একটি সাময়িক পত্রিকা বার করবেন এবং তাতে লেখা পাঠাতে পারেন মার্কস, আর সে লেখার জন্য ভালই টাকা দেওয়া হবে মার্কসকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ওয়েডমেয়ার জানালেন এখন কাগজ বার করা সম্ভব নয়। পরে অবশ্য 'ডাই রেভোলিউশান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করলেন ওয়েডমেয়ার। কিন্তু বার করলেও তা চলেনি। মার্কসের 'এইট্রিনথ ব্রুমেয়ার' রচনাটি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

মার্কসের নির্বাসনের একটি বছর কেটে গেল। তখন ১৮৫০ সালের জুন মাস। মার্কস তখন থাকতেন লণ্ডনের ডীন স্ট্রীটে দু কামড়া-ওয়ালা একটা ভাড়াটে বাসায়। দুখানা মাত্র ঘর। তার মধ্যে একখানা বৈঠকখানা হিসাবে আলাদা রাখতে হয়, লোক আসা যাওয়ার বিরাম নেই। আর মাত্র একখানা ঘরেই রান্না, খাওয়া, শোয়া পড়াশুনো সব কিছুই করতে হয়। মার্কস তাই ঘরে বেশী থাকতেন না। ঘরে পড়ালেখার বড় অসুবিধা বলে তিনি প্রায়ই চলে যেতেন লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বসে পড়তেন লিখতেন আর চিন্তা করতেন। সেখানে বাড়ির অভাব-অনটনের কথা, ছেলেদের সুখ-অসুখের কথা কানে যেত না তাঁর।

স্ত্রী অবশ্য সব কথা জানাতেন না মার্কসকে। নিজেই সব দুঃখ কষ্ট

সহ্য করে যেতেন মুখ বুজে। কারণ তিনি জানতেন মার্কস অত্যন্ত সংবেদনশীল আর স্বাধীনচেতা মানুষ। একমাত্র বন্ধু এঙ্গেলস ছাড়া আর কারো কাছে কোন সাহায্য চাইতেন না। কিন্তু এঙ্গেলস একাই বা কত পেরে উঠবেন। এঙ্গেলস তখন ম্যাঞ্চেষ্টারে তাঁর বাবার এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে যা পেতেন তা থেকে প্রায়ই কিছু কিছু করে পাঠাতেন মার্কস পরিবারে।

একদিন মার্কসকে কিছু না বলে জেনি মার্কসের বন্ধু ওয়েডমেয়ারের কাছে একখানি চিঠিতে তাঁদের সংসারের দুঃখ কষ্টের সব কথা জানিয়ে কিছু সাহায্য চাইতে বাধ্য হলেন। একখানি দীর্ঘ চিঠিতে তিনি লিখলেন, প্রিয় হের ওয়েডমেয়ার,

প্রায় একটি বছর কেটে গেল আপনি এবং আপনার স্ত্রী আপনাদের বাড়িতে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন আমাদের। কিন্তু আপনাদের সেই সাদর অভ্যর্থনার বিনিময়ে কিছুই দিতে পারিনি আমরা।

আজ অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই এ চিঠি লিখছি আপনাকে। এই চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পাঠিয়ে দেবেন। আপনি দেখবেন রেভ্যু পত্রিকা থেকে কিছু পাওয়া যায় কিনা। আপনি জানেন এই পত্রিকার জন্য আমার স্বামী টাকা পয়সা ও পরিশ্রম দিয়ে অনেক কিছু করেছে। নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙের জন্যও তিনি কি করেছেন তা তাঁর কোলোনের বন্ধুরা জানেন। জানি না কি কারণে বিক্রেতাদের দোষে না ব্যবস্থাপকদের গাফিলতিতে বন্ধ হয়ে গেল এই দুটি পত্রিকা।

আজ এখানে আমার স্বামী খুব কষ্টের মাঝেই আছেন। সাংসারিক অভাব অনটনের অজস্র খুঁটিনাটি তাঁর দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামকে তীব্র করে তুলছে। তাঁর শান্ত সমাহিত আত্মচেতনাকে করেছে পীড়িত।

আপনি জানেন মিষ্টার ওয়েডমেয়ার, নিজের বলতে কিছুই আমরা রাখিনি, সর্বস্ব খুইয়েছি পত্রিকার খরচ চালাতে গিয়ে। পত্রিকার দেনা

মেটাবার জন্যে আমি ফ্রাঙ্কফোর্টে গিয়েছিলাম রূপোর বাসন বন্ধক রাখতে। আমার স্বামী প্যারিসে গেলেন প্রতিবিপ্লবের সময়। তিনটি শিশুকে নিয়ে আমিও গেলাম তাঁর সঙ্গে নিদারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই আবার নির্বাসিত হলাম আমরা।

আবার আমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এলাম লণ্ডনে। একমাস পর আমাদের চতুর্থ সন্তানের হলো জন্ম। লণ্ডনের মত ব্যয়বহুল জায়গায় নিঃস্ব অবস্থায় তিনটি সন্তানের ব্যয়ভার বহন করতেই পারি না; তার উপর আবার চতুর্থের আবির্ভাব। আমাদের অল্প যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল তা বিক্রি করে যা পাওয়া গিয়েছিল তা ফুরিয়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যে। 'রিভিউ' পত্রিকা থেকে চুক্তিমত টাকা এল না। যাও বা এল তা অতি সামান্য। ফলে আমরা ভয়াবহ দুরবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম।

আমি আপনার কাছে মাত্র একটি দিনের কথা বর্ণনা করব। তার থেকে বুঝতে পারবেন আমাদের যত দুঃখ কষ্ট পৃথিবীর খুব কম বাস্তু-ত্যাগী বা নির্বাসিত ব্যক্তি ভোগ করেছেন। আমাদের নবজাত শিশুটির জন্য একজন ধাত্রী রাখা অসম্ভব আমাদের পক্ষে; এজন্য আমার বুক ও পিঠে দারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি নিজেই শিশুটিকে দেখা শোনা করতে লাগলাম। শিশুটি ছিল জন্ম থেকেই ভীষণ রোগা। এক অজানিত রোগযন্ত্রণায় দিনরাত শুধু চীৎকার করত। রাত্রে এমন কি দুতিন ঘণ্টাও ঘুমোত না। রোগযন্ত্রণার তীব্রতায় মাঝে মাঝে আমার স্তনটাকে এমন ভাবে টানাটানি করত যে আমার স্তনটিতে ঘা হয়ে গেল। দুধ খেতে গেলে দুধের পরিবর্তে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসত তার মুখে।

এইভাবে একদিন আমি সেই রুগ্ন মৃতপ্রায় শিশুটিকে নিয়ে বসে আছি আমাদের বাসায় এমন সময় হঠাৎ আমাদের বাড়িওয়ালী এসে হাজির। আগেকার চুক্তিমত তাঁকে আমরা বাড়িভাড়া বাবদ আড়াই থেলার দিয়ে দিয়েছি. আর কথা ছিল বাকিটা বাড়ির মালিককে পাঠিয়ে

দেব পরে। কিন্তু তিনি বললেন, সে চুক্তি তিনি মানবেন না এবং সেই মুহূর্তে তিনি বাকি বাড়িভাড়া বাবদ পাঁচ পাউণ্ড চাইলেন। কিন্তু তখন ঐ টাকা দিতে না পারায় দুজন পুলিশ নিয়ে এসে আমাদের যাবতীয় জিনিষপত্র বিছানা এমন কি ছেলেদের দোলনা ও খেলনা-গুলিও দেনার দায়ে ক্রোক করলেন। ছেলেগুলি একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তারা মাত্র দু ঘণ্টা সময় দিয়ে বলল, এর পর আমাদের সব জিনিষ নিয়ে যাবে। আমি তখন নিরুপায় হয়ে খালি ঠাণ্ডা মেঝেতে যন্ত্রণায় ছটফট করছি আর আমাদের শীতার্ত শিশুগুলি আমার চারপাশে কাঁদছে।

খবর পেয়ে আমাদের একান্ত বন্ধু ন্যাম সাহায্যের জন্য শহরে চলে গেল। কিন্তু সেও একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে এল।

পরের দিন সত্যি সত্যিই আমাদের বাসা ছেড়ে দিতে হলো। সেদিন অত্যন্ত ঠাণ্ডা তার উপর রোদ নেই। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু তারই ভিতর আমাদের বাসা ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসতে হলো। আমার স্বামী বাসাবাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথাও কোন আশ্রয় পেলেন না। ঠিক এমন সময় সব পাওনাদারেরা তাদের বিল নিয়ে হাজির হলো। আমি তখন আমাদের যাবতীয় জিনিষপত্র বিক্রি করে সব দেনা মিটিয়ে দিলাম। এই চরম বিপদের সময় আমাদের একজন বন্ধুর সহায়তায় আমরা একটি জার্মান হোটেলে এক সপ্তার জন্যে সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড ভাড়ায় দুখানি ছোট ছোট কামরা পেলাম। তার ঠিকানা ১, লাইসেস্টার ষ্ট্রীট, লাইসেস্টার স্কোয়ার, লণ্ডন।

আমায় ক্ষমা করবেন। জানি আমার চিঠিখানি খুব বড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি পারছি না। আজকের এই সন্ধ্যায় আর অপরিসীম বেদনার বিগলিত উচ্ছ্বাসে অন্তর আবার উপচে পড়ছে এবং আমার মনে হচ্ছে আপনার মত আমাদের একজন পুরণো অন্তরঙ্গ

বন্ধুর কাছে সব কথা খুলে বললে সে বেদনার কিছুটা লাঘব হবে। তবে আপনি কিন্তু ভাববেন না দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি আমরা। কখনই তা নয়। কারণ আমি জানি আমাদের মত অনেকেই কষ্ট করে। আমার পক্ষে বরং এটা আনন্দের কথা আমার প্রিয়তম স্বামী এখনও আমার পাশে রয়েছেন। তবে সবচেয়ে যেটা আমায় কষ্ট দেয় সেটা হচ্ছে এই যে এই সব ছোটখাটো অভাব অনটনের ঘটনায় আমার স্বামীর অনেকখানি অমূল্য সময় ও উদ্যমের অপচয় হয় এবং যিনি একদিন বহু লোককে অকাতরে সাহায্য করেছেন, আজ তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই, কিন্তু এতেও কারো কাছে কিছু চান না আমার স্বামী। তাই আপনার কাছে আমার এ চিঠি লিখতে হচ্ছে লুকিয়ে। অবশ্য চিঠি লেখার কথা তিনি জানেন। কিন্তু এত কথা লেখা বা কোন সাহায্য চাওয়ার কথা তিনি জানেন না। তিনি শুধু জানেন তাঁর প্রাপ্য টাকা ওখান থেকে পাঠিয়ে দেবার জন্য চিঠি লিখছি আপনাকে।

হে বন্ধু বিদায়। আপনি ও আপনার স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আপনার শিশুটির প্রতি ভালবাসা জানিয়ে এ চিঠি শেষ করছি। এত অভাব অনটনের মাঝেই আমাদের শিশু তিনটি ভালভাবেই বেড়ে উঠেছে। আমাদের দুটি মেয়ে একটি ছেলে। মেয়ে দুটি খুবই সুন্দরী, ফোটা-ফুলের মত সব সময় যেন হাসছে আর ছেলেটিও স্বাস্থ্যবান এবং আমাদের বিশেষ আনন্দ দেয়। ছেলেটা সারাদিন চীৎকার করে গান গায়। গান নয়, কবি ফ্রেলিগ্রাথের মত এক বিরাট ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য বিশ্বের সর্বহারাদের ডাক দিচ্ছে। ইতি।

ফ্রেলিগ্রাথ একজন বিপ্লবী কবি। মার্কসের নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুং পত্রিকাখানি সরকারী দমন নীতির চাপে বন্ধ হয়ে গেলে ফ্রেলিগ্রাথ একটি কবিতা লিখে বিদায় জানিয়েছেন পত্রিকাটিতে। ১৮৩৯ সালের মে মাসে এই কবিতাটিতে তিনি লিখেছিলেন,

বিদায়। হে বন্ধু বিদায়। কিন্তু চিরদিনের জন্য নয়
আবার আমি আসব, কিছুতেই মারতে পারবে না আমার আত্মাকে।

শত্রুদের সঙ্গে আরো অদম্যভাব আরো সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে,
আবার আমি বজ্রের মত আবির্ভূত হব এক ভয়াবহ আকস্মিকতায়,
আবার আসব আমি ঠিক সেইখানে যেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি।
আজ এক মৃত্যুহীন ঘৃণা নিয়ে আমি মরছি,
আমার হাতে রয়েছে এখনো এক ভয়ঙ্কর তরবারি,
আমার কণ্ঠে এখনো ধ্বনিত হচ্ছে বিপ্লবের ধ্বনি
আমার কবরের ওপর যে ঘাসেরা জন্ম নেবে একদিন
তারাই এক একখানি তরবারি রূপে ধ্বংস করবে
অত্যাচারী প্রুশায় সরকার আর জারকে।

শুধু এই নয়, আরও অনেক বৈপ্লবিক কবিতা আছে ফ্রেলিগ্রাথের। আছে অনেক জ্বালাময়ী কথার গুচ্ছ। বিপ্লবী রবার্ট ব্লামের মৃত্যুতে একটি কবিতার মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন কবি ফ্রেলিগ্রাথ।

১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমে ভিয়েনাতে বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ব্লাম। তিনি ছিলেন জার্মানীর ফ্রাঙ্কফোর্টের ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লীর একজন উগ্র বামপন্থী সদস্য। তিনি একজন নামকরা বাগ্মীও ছিলেন। অক্টোবর বিপ্লবের সময় ভিয়েনাতে গিয়ে বিপ্লবী বাহিনীর নেতৃত্বভার নিজের হাতে নিয়ে অষ্ট্রীয়ার সরকারী বাহিনীর গতিরোধ করেন। এজন্য গুলি করে হত্যা করা হল ব্লামকে।

বিপ্লব চলাকালে কোলোনে এক সভা বসেছিল। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। কোথাও কোন তিল ধারণের জায়গায় নেই। এমন সময় একটি টেলিগ্রাম হাতে মার্কস ঢুকলেন সেই সভায়। এক নীরব গাম্ভীর্যে সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন মার্কস। সভার সকলের দৃষ্টি তখন মার্কসের মুখের উপর নিবদ্ধ। টেলিগ্রামটি পড়ে শোনালেন মার্কস, সামরিক আইনজারির ফলে ভিয়েনাতে রবার্ট ব্লামকে গুলি

করে হত্যা করা হয়েছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর আবার ফেটে পড়ে ক্রুদ্ধ জনতা। চীৎকার করে শপথ নেয়, ব্লামের হত্যার আমরা প্রতিশোধ নেব। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এর জবাব দেব।

ফ্রেলিগ্রাথ তাঁর কবিতায় লিখলেন,

আজ হতে চল্লিশ বর্ষর আগে
কোলোনের একটি ঘরে যে শিশুটি
এক আদিম কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার মার কোলে
আজ হতে আট দিন আগে ভিয়েনার এক ধূলিধূসর পথে
লুঠিয়ে পড়েছে সে রক্তাক্ত দেহে।
কিন্তু ভুল করছ তোমরা
সকরুণ বিলাপধ্বনি কখনই প্রতিশোধ নয়,
শোকাশ্রু আর আগুন এক নয়।
প্রকৃত প্রতিশোধকারী লাল পোষাক পরে
চোখে জল আর হাতে রক্ত নিয়ে রণদামামা বাজিয়ে
এগিয়ে আসবে যুদ্ধের জন্য ;
শত্রুর নিপাত না করে সে ছাড়বে না।

মার্কসপত্নী তাঁদের বন্ধু ওয়েডমেয়ারকে যে দীর্ঘ চিঠিখানি লিখেছিলেন তা পড়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয় বিস্ময়ে ও বেদনায়। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। কিন্তু মার্কস পরিবারের এই লোমহর্ষক দুঃখের এইখানেই শেষ নয়। এই দুঃখের সময়েই জেনি মার্কস তাঁর মার মৃত্যুতে বাপের বাড়ি থেকে অনেক মূল্যবান বাসনপত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পান। এই সময় ছেলেদের নিয়ে জার্মানীর ট্রিয়ের শহরে গিয়ে দিনকতক থাকেন।

এদিকে জার্মান হোটেলে থাকার দিন ফুরিয়ে যায়। মার্কস তাই ঠিক করলেন তাঁর স্ত্রীর ওইসব রূপোর বাসনগুলি বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আবার নতুন ঘর ভাড়া নেবেন কোথাও। কতকগুলি রূপোর চামচ একটি দোকানে বন্ধক দিতে গেলে দোকানদার সন্দেহ

করে মার্কসকে। তার সন্দেহ হলো, মার্কসের মত একজন গরীব লোকের পক্ষে এই সব পুরনো দামী বাসন থাকা বা কোথাও থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই পুলিসে খবর দিয়ে সে গ্রেপ্তার করাতে চাইল। পরে অবশ্য মার্কস সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলে এই সন্দেহজাল থেকে মুক্ত করেন নিজেকে। বাকি গয়নাগুলি সেই দোকানদারকেই বিক্রি করেন একে একে।

এগার

১৮৫০ সালের নতুন বছরেরও অর্ধেক কেটে গেল। স্ত্রীর বাসন বিক্রির টাকায় নতুন ঘরভাড়া নিয়ে অন্য এক জায়গায় উঠে গেলেন মার্কস। অর্থকষ্ট সামান্য পরিমাণে কমল। কিন্তু নতুন বিপদ দেখা দিল সংসারে।

দারিদ্র্যের মত রোগের অতিথি শত অবাঞ্ছিত হলেও একবার কোন সংসারে এলে আর যেতে চায় না। তাছাড়া অভাবের সংসারে ত কথাই নেই। পায়রাখুপীর মত ছোট ছোট প্রায়ান্ধকার ঘর। আলো হাওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য নেই, পুষ্টিকর খাবারের স্বচ্ছলতা নেই। রোগ সহজেই আক্রমণ করে, সারা সংসার দখল করে মৃত্যুর এক করাল ছায়ার কালো ডানা মেলে বুক চেপে বসে থাকে।

লিভারের অসুখ হলো জেনি মার্কসের। ১৮৫১ সালের আগষ্ট মাসে মার্কস তাঁর বন্ধু ওয়েডমেয়রেকে লিখলেন, আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। এভাবে আর কিছুদিন চলতে থাকলে আমার স্ত্রীকে আর বাঁচানো যাবে না। তার উপর আছে প্রতিপক্ষদের বিরোধিতা। আমার স্ত্রী যাঁকে সারাদিন কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় তাঁকে আবার ডেমোক্র্যাটদের কচকচি আর গালাগালিও শুনতে হয়।

এর পর ফ্রান্সিসকা নামে মার্কসের জন্মরুগ্ন শিশু কন্যাটি মারা যায়।

এই বিরাট পৃথিবীতে এত আলো এত হাওয়া এত মাটি এত ফসল; তবু তার কিছুই প্রাণভরে ভোগ করতে পেল না ফ্রান্সিসকা, শুধু এক সীমাহীন রিক্ততা ও নিঃস্বতার এক নিষ্করুণ আকাশে একটি যন্ত্রণার বৃত্তের মাঝে কয়েকটি বছর ধরে ঘুরপাক খেয়ে চলে গেল চিরদিনের মত।

প্রথমে স্ত্রী তারপর মার্কস নিজে। তারপর ছোট মেয়ে জেনি। মার্কস নিজেও লিভারের অসুখে কয়েক সপ্তাহ শয্যাগত হয়ে রইলেন। এই সময় এঙ্গেলসকে একখানি চিঠিতে মার্কস লেখেন, আমার স্ত্রী বিশেষ অসুস্থ। তার দেহের ওজন অনেক কমে গেছে।

পরে আর একটি চিঠিতে লেখেন, আমার স্ত্রীর অসুখ। তার উপর ছোট মেয়ে জেনিও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু ডাক্তার ডাকার পয়সা নেই। আমাদের পরিবারের সবাই আট দশ দিন শুধু রুটি আর আলু খেয়ে আছে। বর্তমানের আবহাওয়ায় শুধু এই খেয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

বিপদের উপর বিপদ। একমাত্র পুত্রসন্তান, বংশের প্রদীপ এডগার এতদিন ভালই ছিল। অনির্বান প্রদীপের মতই অন্ধকারের মাঝে আলো দিত সারা সংসারটাকে। হাসি খুশিতে মাতিয়ে রাখত সবাইকে।

এবার এডগারের করল অসুখ। পরের পর কয়েকটি সপ্তাহ ভুগল। তারপর একদিন মার্কসের কোলেই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান এডগার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আজ জীবনে যেন প্রথম দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন মার্কস। এতদিন অজস্র ঝড়ের নিষ্ঠুর প্রহারে যিনি জর্জরিত হননি, যিনি এক অপরাজেয় দেবদারু গাছের মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সমস্ত প্রতিকূলতার সামনে আজ তিনি যেন সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেলেন। এ শোক এ দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল মার্কসের কাছে।

এঙ্গেলসকে লিখলেন মার্কস, এডগারের শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পর থেকে আমি তীব্র মাথার যন্ত্রণায় ভুগছি। আমি কোন কিছু ভাবতে পারছি না। কোন কিছু যেন দেখতে বা শুনতে পাচ্ছি না। এই

দুঃখের দিনে একমাত্র তোমার বন্ধুত্বের চিন্তাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে এঙ্গেলস। আর আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে অদ্ভুত অস্পষ্ট একটা আশা। সে আশা এই যে, হয়ত বা এমন একদিন আসবে যেদিন তোমায় আমায় মিলে আমরা দুজনে সারা দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য কিছু না কিছু করতে পারব।

রাজনীতি এবার একেবারে ছেড়ে দিলেন মার্কস। দিনরাত শুধু অর্থনৈতিক গবেষণার কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন। কিন্তু শত কাজের মধ্যে থেকেও সারাদিনের মধ্যে একটিবার সময় করে বেরিয়ে আসতেন মার্কস। লাল আলো ঝরা অপরাহ্নে কোন এক পার্কের সবুজ ঘাসের উপর খেলতে থাকা ছেলেদের মাঝে শিশুর মত মিশে যেতেন মার্কস। সঙ্গে থাকত এক প্যাকেট মিষ্টি। খেলা শেষে সকলকে ভাগ করে দিয়ে দিতেন। পাড়ার ছেলেরা বলত ডাডি মার্কস।

এঙ্গেলস ছাড়া আর একজন পরম বন্ধু ছিল মার্কস পরিবারের। সে হলো লেঞ্চেন। জেনি ওয়েস্টফ্যালেন যখন কার্ল মার্কসকে বিয়ে করে স্বামীর ঘর করতে আসেন বাপের বাড়ি ছেড়ে তখন তাঁর মা ব্যারনপত্নী ভন ওয়েস্টফ্যালেন লেঞ্চেনকে জেনির সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। লেঞ্চেনকে জেনির সঙ্গে দিয়ে বলেন, সবচেয়ে ভাল একটা জিনিষ দান করলাম তোমায়।

ওয়েস্টফ্যালেন পরিবারে চাকরি নিয়ে যখন প্রথম ঢোকে লেঞ্চেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র আট কি নয়। বয়সের দিক থেকে প্রায় জেনির সমবয়সী লেঞ্চেন। জেনির সঙ্গে দুই বোনের মত একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। দুজনে অনেক সুখ ভোগ করেছে। তারপর জেনির বিয়ের পর তার ছায়াসঙ্গিনীরূপে একই সঙ্গে অকাতরে অবিরাম দুঃখ-ভোগ করে চলেছে। লেঞ্চেনের মত অসময়ের বন্ধু দেখা যায় না।

লেঞ্চেন মার্কস পরিবারের সঙ্গে প্রথমে ট্রিয়ের থেকে প্যারিসে গিয়েছে, তারপর সেখান্ থেকে গিয়েছে ব্রাসেলস্। সেখান থেকে পরে কোলোনে; তারপর এই লণ্ডনের নিদারুণ নির্বাসন জীবনে।

মার্কস দম্পতির সব ছেলেদের একে একে হতে দেখেছে সে। নিজের হাতে মানুষ করেছে। কাউকে কাউকে মরতেও দেখেছে। ভাগ্যের সব বিড়ম্বনা দারিদ্র্যের সবগুলি কশাঘাত, ক্ষুধার সমস্ত যন্ত্রণা আর পাওনা-দারদের সমস্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা মার্কস দম্পতির সঙ্গে সমানভাবে নীরবে সহ্য করেছে লেঞ্চেন। সে কখনও তাঁদের ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। অনেক সময় মার্কস পরিবারের দুঃখ-কষ্টের সবচেয়ে মোটা ভাগটাই নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিত লেঞ্চেন। নিজের সমস্ত শ্রম, সাধনা ও সঞ্চয় নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে সাহায্য করত সংসারকে চরম বিপদের কবল থেকে রক্ষা করত সকলকে। অনেক সময় হয়ত দেখা গেল, বাড়িতে খাবার কিছু নেই, কিছু কেনার মত টাকা পয়সাও কিছু নেই। ছেলেদের মুখে দেবার পর্যন্ত কিছু নেই। এমন সময় কোথা হতে রুটি আর আলু সিদ্ধ নিয়ে খাবার টেবিলে পরিবেশন করল লেঞ্চেন।

অবাক বিস্ময়ে লেঞ্চেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন মার্কস দম্পতি। মনে মনে ভাবতেন লেঞ্চেন যাদু জানে। ভাবতেন সে যেন আস্ত এক দেবদূত তা না হলে নিবিড় নিচ্ছিদ্র এই হতাশার অন্ধকারে তার ঐন্দ্রজালিক ডানা মেলে এক ঝাঁক আলোর পশরা নিয়ে এমন করে হঠাৎ এসে হাজির হতে পারত না। তা না হলে এমন করে তাঁদের তাক লাগিয়ে দিতে পারত না।

কিন্তু মনে তাঁরা যাই ভাবুন লেঞ্চেনের উপর কথা বলার সাহস কারো ছিল না। সবাইকে খাবার ভাগ করে দিয়ে নিজে খেতে পাবে কিনা তাও জিজ্ঞাসা করার সাহস পেতেন না তাঁরা। লেঞ্চেনের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারতেন না তাঁরা। লেঞ্চেনকে দেখে এক এক সময় তাঁদের মনে হত, সে যেন এক আশ্চর্য পক্ষীমাতা যে সব বড় ঝাপ্টা সহ্য করে আহার জুটিয়ে এনে তার শাবকদের মুখে গুঁজে দিচ্ছে। কোথা থেকে এই আহার সে পেল, তার নিজের আছে কিনা তা যেন তার শাবকদের জানার কোন প্রয়োজন নেই।

উইলহেম লেবনেখট এক জায়গায় বলেছেন, লেঞ্চেন ছিল মার্কস পরিবারের একরকম সর্বেসর্বা। এমন কি মার্কস নিজে শান্ত মেষ-শাবকের মত তার সব হুকুম ও আবদার মেনে চলতেন। এক একবার মার্কস যখন খুব রেগে গিয়ে তর্জন গর্জন করতেন তখন একমাত্র লেঞ্চেনই অবলীলাক্রমে তাঁর কাছে গিয়ে শান্ত করতেন তাঁকে।

মার্কসকে অন্তরে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও বাইরে লেঞ্চেন এমন একটা ভাব দেখাত যাতে মনে হত, মার্কস যত বড় চিন্তাশীল পণ্ডিত বা জন-নেতাই হ'ন না কেন, তার কাছে তিনি এক অবোধ শিশু।

রাজনীতির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে একেবারে ছিনিয়ে নিয়ে বৃটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীর একটি পড়ার ঘরে তখন আশ্রয় নিয়েছেন মার্কস। তখন ১৮৫২ সাল। নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজের নির্জন গভীরে। দাস ক্যাপিটাল লেখার কাজ শুরু হয়েছে সবেমাত্র।

বাড়িতে বড় জ্বালা বড় অভাব। রুগ্ন অথবা ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না, অসহায় গৃহিণীর সকরুণ চাউনি আর মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস আর সহ্য হয় না মার্কসের। পড়াশুনার চিন্তা বা লেখালেখির কথা ভাবতেই পারা যায় না বাড়িতে। তাই এই সাধারণ গ্রন্থাগারে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন মার্কস।

কিন্তু দারিদ্র্যের পীড়ন থেকে সেখানেও নিস্তার নেই। নির্জন চিন্তা ও নিবিড় পড়াশুনোর অফুরন্ত সময় ও অব্যাহত সুযোগ পেলেও সে চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ির কথা রুজি রোজগারের কথা ভাবতে হয়। সমগ্র বিশ্ব সমাজের সাধারণ অর্থনীতির কথা কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে নিজের সংসারের খাওয়া পরার জন্য উপায় খুঁজতে হয়। এজন্য সেই গবেষণার টেবিলে বসেই আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের জন্য লেখা লিখতে হয়। সে লেখা লিখবার জন্য ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজ-নৈতিক অবস্থা বা ঘটনাবলীর কথা জানতে হয়। অনেক খোঁজ খবর রাখতে হয়।

এমনি করে ইংলণ্ডের রাজনীতির কথা জানতে গিয়ে তিন জন নামকরা লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন মার্কস। পরে এরা প্রত্যেকেই পরম শুভানুধ্যায়ী হয়ে ওঠেন মার্কসের। এঁরা হলেন ডেভিড আর্কাহার্ট, জুলিয়ান হার্নে ও আর্নেষ্ট জোনস।

আর্কহার্ট ছিলেন তখন একজন রুশবিরোধী বৃটিশ রাজনীতিবিদ। সেকালের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের রুশঘেঁষা নীতি মোটেই পছন্দ করতেন না তিনি। তিনি বলতেন, পামারস্টোন হচ্ছেন রাশিয়ার কেনা গোলাম। পামারস্টোনবিরোধী বৃটিশ উদারনীতিবাদীরা এজন্য ভালবাসতেন আর্কাহার্টকে।

একদিন রাজনৈতিক খবরাখবরের জন্য আর্কাহার্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন মার্কস। প্রথম আলাপেই ঘনিষ্ঠতা হলো দুজনের। অনেক কথা ও ভাবের বিনিময় হলো। ধীরে ধীরে এক স্থায়ী সম্বন্ধ গড়ে উঠল। আর্কাহার্টের 'ফ্রী প্রেস' নামক কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখলেন মার্কস। কিন্তু তা সত্বেও আর্কাহার্টের রাজনৈতিক মতবাদকে কোনদিন সমর্থন করতে পারেননি মার্কস। কারণ আর্কাহার্ট ছিলেন সেকালের চার্টিস্ট আন্দোলন বিরোধী, অথচ মার্কস ছিলেন এই আন্দোলনের সমর্থক।

রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে হার্নে ও জোনসের সঙ্গে মার্কসের ঘনিষ্ঠতা হলো বেশী। এঁরা দুজনেই ছিলেন চার্টিস্ট আন্দোলনের জনপ্রিয় নেতা। হার্নে এসেছিলেন সর্বহারা শ্রেণী থেকে। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে পরে সাংবাদিকতাকে বেছে নেন পেশা হিসাবে। আর জোনস রক্তের দিক থেকে অভিজাত সমাজের মানুষ হলেও এ সমাজকে অন্তরের অঙ্গে ঘৃণা করতেন তিনি।

সে যাই হোক, এঁরা দুজনেই বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন মার্কসকে। তাঁর সমাজবিপ্লব সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা ও ভাবধারাকে সমর্থন করতেন মনেপ্রাণে। তাঁর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিপুলতায় আশ্চর্য হতেন, একাগ্রতায় অভিভূত হতেন।

হার্নের রেড রিপাবলিকান নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল। তাতে মার্কসের কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া রাইনিশে রেভ্যু পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি রচনারও অনুবাদ প্রকাশ করেন।

আর্নেষ্ট জোনস অনেক সময় নানাভাবে সাহায্য করতেন মার্কস্ পরিবারকে। কিন্তু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মার্কসের ঝগড়ার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয় মার্কসের, লেবনেখটের সঙ্গেও এমনি একবার ভুল বোঝাবুঝি হয়।

লেবনেখটও ছিলেন মার্কস পরিবারের একজন নির্ভরযোগ্য বন্ধু। তিনি প্রায় রোজই একবার করে আসতেন। ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেন। ছেলেরাও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসত। একদিন না এলে সবাই তার খোঁজ করত।

কিন্তু একবার মার্কসের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাঁর বাড়িতে আসা ছেড়ে দেন লেবনেখট। তখন ইংলণ্ডে শ্রমিকদের শিক্ষাসংস্থা নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে তখন শুরু হয় এক তীব্র অন্তর্বিরোধ। ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠানটি। মার্কস এটা পছন্দ করতেন না। তাঁর ইচ্ছা লেবনেখট এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করুন। কিন্তু তা না করায় তিনি কিছুটা রেগে যান লেবনেখটের উপর। তা বুঝতে পেরে মার্কসকে মনের দুঃখে এড়িয়ে চলতে থাকেন লেবনেখট।

লেবনেখটের কিন্তু আসলে কোন দোষ ছিল না। তিনি শিক্ষা-সংস্থার বিবদমান দুটি দলের কোনটিতে যোগ না দিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। পরে মার্কসও তা বুঝতে পারেন।

একদিন নিতান্ত আকস্মিকভাবেই দেখা হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। সেদিন বিকালে অন্যদিনকার মতই ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন মার্কস। এমন সময় উল্টো দিক থেকে লেবনেখট আসছিলেন সেই পথ ধরেই। মার্কস তা দেখতে পাননি। নিচের দিকে চেয়ে কি

ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলেরা লেবনেখটকে দেখে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। লাফিয়ে গিয়ে লেবনেখটের হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে। তারা সবাই একবাক্যে বলতে থাকে আজ আমরা তোমাকে ছাড়ব না। আমাদের বাড়ি তোমাকে নিয়ে যাবই।

এবার তা দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন মার্কস। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন, শিশুরা তাদের প্রকৃত বন্ধুকে চিনতে কখনও ভুল করে না, আর চেনার পর কখনও ভুলে যায় না।

ছুটে এসে হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন লেবনেখটকে। বাড়ি নিয়ে গেলেন পরম আদরের সঙ্গে। দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও ভুল বোঝা-বুঝির পর আবার মিলন হলো দুই বন্ধুতে।

পরে পুরনো কমিউনিষ্ট লীগের একজন সদস্য এবং কোলোন কমি-উনিষ্ট ট্রায়ালের একজন আসামী লেসনার লণ্ডনে আসেন। এসে শ্রমিকদের শিক্ষাসংস্থাটির সব ভার তুলে নিয়ে আবার তাকে নতুন করে গড়ে তোলেন। লেসনার ছিলেন গরীব ঘরের ছেলে। পেশায় তিনি ছিলেন একজন সাধারণ দর্জি।

ধীরে ধীরে এক নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হলো যেন শিক্ষাসংস্থার মধ্যে। দলে দলে শ্রমিকরা এসে সদস্য হতে লাগল। পুরনো সদস্যরা আবার ফিরে এসে যোগ দিল। মার্কসও তাঁর এই সংস্থা সম্বন্ধে তাঁর পুরনো বিতৃষ্ণার কথা ভুলে গেলেন। এই সংস্থার তরফ থেকে লেবনেখট ও লেসনার শ্রমিক সদস্যদের সমাবেশে কতকগুলি বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করেন মার্কসকে।

মার্কসও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। তাঁর রাজনীতিভিত্তিক অর্থ-নীতিচিন্তার মূল কথাগুলিকে কতকগুলি বক্তৃতার মাধ্যমে সহজ ভাষায় তুলে ধরেন তিনি স্বল্প শিক্ষিত শ্রমিকদের সামনে। এক বিরাট পণ্ডিত হয়েও প্রতিটি শ্রমিককে তাঁর পরম বন্ধু বলে মনে করতেন মার্কস।

তাঁর সারা বক্তৃতার মধ্যে এমন একটি কঠিন শব্দও প্রয়োগ করতেন না যা তাঁর শ্রমিকবন্ধুরা সহজে বুঝতে না পারে।

খুব একজন ভাল বক্তা ছিলেন না মার্কস। তাঁর কথার মধ্যে মাঝে মাঝে রাইন প্রদেশের পরিভাষাগত আঞ্চলিক টান দেখা দিত। তবু যখনি যা কিছু বলতেন তিনি, এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে সমৃদ্ধ হয়ে মুক্তোর মত ঝরে পড়ত কথাগুলো। শ্রোতাদের মনে গভীরভাবে দাগ কাটত প্রতিটি কথা।

কোন কথা না বোঝার কিছু ছিল না। না বোঝার মত কিছু বলতেন না। তবু বলা শেষ হয়ে গেলে শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করতেন মার্কস। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন না করলে মার্কস তখন নিজেই প্রশ্ন করতেন শ্রোতাদের। ফলে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠত তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু। ভ্রান্তির কোন কুয়াশা কোন ফাঁকে কখনও জমে থাকলে নিঃশেষে তা যেত মিলিয়ে।

মার্কসের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা বলতে গেলে আরও দুজনের কথা বলতে হয়। তা না বললে এ কথা বলা অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তাঁদের প্রতিও অবিচার করা হয়। এ দুজন বন্ধু হলেন কবি ফ্যার্ডিনাণ্ড ফ্রেলিগ্রাথ আর উইলহেম উল্ফ।

কবি ফ্রেলিগ্রাথ লণ্ডনে এসেই ঘোষণা করলেন তিনি শুধু মার্কস এবং তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেই মিশবেন। এই সময় লণ্ডনের নির্বাসিত উদ্বাস্তুরা ফ্রেলিগ্রাথকে নিয়ে আপন আপন দলে টানাটানি শুরু করে দেয়। কিন্তু কোন দলে বা কারো কাছে না গিয়ে ফ্রেলিগ্রাথ চলে যান একমাত্র মার্কসের কাছে। তিনি ছিলেন একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। মাইনে পেতেন ভালই এবং মাইনের টাকা থেকে প্রতি মাসেই কিছু কিছু সাহায্য করতেন নির্বাসিত উদ্বাস্তুদের।

উইলহেম উল্ফ ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সাইলেশিয়ার একজন হোটেল মালিকের ছেলে। বাবার মৃত্যুর পর কিছু সম্পত্তি পান উল্ফ। তাতেই তাঁর ভাল ভাবেই চলে যেত। উল্ফের সঙ্গে মার্কসের বন্ধুত্ব দীর্ঘ দিনের,

সেই রাইনিশে ৎসাইটুং পত্রিকার :জন্মদিন থেকে। দূরত্বের ব্যবধান অথবা বিরহকালের দীর্ঘতা সে বন্ধুত্বকে ম্লান করতে পারেনি কিছুমাত্র। জীবনে বিয়ে করেননি উল্‌ফ এবং মার্কসকে তিনি এত ভাল-বাসতেন যে একমাত্র মার্কসকেই তিনি তাঁর সব সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্বাচিত করে যান তাঁর জীবদ্দশাতেই। আর সত্যি সত্যিই উল্‌ফের মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু ছিল তা মার্কসই পেয়ে যান।

বারো

নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে মার্কস শুধু সমসাময়িক বৃটিশ রাজনীতির অবস্থা বা ঘটনার কথা লিখতেন না; পৃথিবীর যে কোন দেশে যখন কোন গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটত তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে কিছু না কিছু লিখতেন মার্কস। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোন গণতান্ত্রিক গণবিপ্লবই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবের প্রেরণা আর উৎসাহকে বাড়িয়ে তোলে, সর্বহারাদের চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রামের পথ পরিষ্কার করে দেয়।

মার্কস তাই লিখলেন, ভারতবর্ষ ও চীনের বিপ্লবের কথা। লিখলেন, স্পেন আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লবের কথা। ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের পটভূমিকায় তাইপিং বিপ্লব ১৮৫৪—৫৬ সালের স্পেন বিপ্লব ও ভারতের সিপাহী বিদ্রোহে জনগণের ভূমিকার প্রশংসা করে অনেক কিছু আলোচনা করেন মার্কস।

মার্কস দেখলেন চার্টিস্ট আন্দোলন সফল হবার কোন আশা নেই। কারণ তখন বৃটিশ ব্যবসায়ীরা উপনিবেশের টাকায় রাতারাতি ফুলে ফেঁপে আন্দোলনের নেতাদের হাত করে ফেলেছিল।

নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকায় ভারত সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন মার্কস। তখনও সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়নি। তার আগেই ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শেষ অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিকাকে বৃটিশ ধনতন্ত্রের

বিকাশের একটি অঙ্গ হিসাবে দেখেন মার্কস। ভারতে কোম্পানী তখন একচেটিয়া কারবার বানিয়ে যাচ্ছিল। বৃটেনের উদীয়মান শিল্পপতিরা কোম্পানীর এই একচেটিয়া কারবারের অধিকারের অবসান ঘটায়। ভারতের বিভিন্ন রকমের কাঁচামালের অভাব নেই। এই সব কাঁচা-মালের সাহায্যে অনেক শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য চাই নতুন নতুন উৎপাদিকা শক্তির সৃষ্টি। আর এই উৎপাদিকা শক্তির সৃষ্টির জন্য দরকার রেলপথের ও সেচব্যবস্থার প্রসার।

এরপর ভারতের গ্রাম ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন মার্কস। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের সমাজব্যবস্থা গ্রামকেন্দ্রিক। কিন্তু মার্কস তখন দেখলেন, ভারতের এই গ্রামীন সমাজব্যবস্থা প্রতি-ক্রিয়াশীল। এই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থার ফলেই নানারকমের কুসংস্কার আর সংকীর্ণতার অন্ধকার যুগ যুগ ধরে ব্যাপ্ত করে আছে জনগণের মনকে।

মার্কসের মতে ইংরেজের ভারতে আসার পর ভারতের গ্রাম ব্যবস্থায় যে ভাঙ্গন ধরেছিল তাতে একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। কারণ শুধু হাতে গড়া কুটির শিল্প ও প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতের মত অনুন্নত দেশের কখনই উন্নতি হতে পারে না। এই উন্নতির জন্যে প্রথমে চাই ধনতন্ত্রের বিকাশ আর ব্যাপক শিল্পায়ন। ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটায় তাতে দেশের উৎপাদিকাশক্তি অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। ধনতন্ত্রের বিকাশ কোন দেশে পূর্ণ না হলে সমাজবিপ্লবের দ্বারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ইংরেজরা ভারতের প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থার কোন সংস্কার না করলেও কল কারখানা ও রেলপথ নির্মাণের নতুন শিক্ষা প্রচলনের দ্বারা মোটামুটি একটা ভাঙ্গন এনেছিল গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ জীবনের মধ্যে। আর তার ফলে প্রগতির পথে দেশকে এগিয়ে দিয়েছিল বেশ কিছুটা।

ভারতে প্রচুর কয়লা আর লোহা পাওয়া যায়। রেলপথ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শিল্প গড়ে উঠল দেশে। ইংরেজরা তুলো আর বিভিন্ন কাঁচা মাল সংগ্রহের জন্য রেলপথ স্থাপন করলেও তার ফল দাঁড়াল অন্য। দেখা দিল শিল্পের বিকাশ। শিল্পের বিকাশ মানেই ধনতন্ত্রের বিকাশ।

অবশ্য ধনতন্ত্রের বিকাশ আর তার ফলস্বরূপ উৎপাদন শক্তি বাড়লেই যে কোন দেশের চূড়ান্ত উন্নতি বা প্রগতি হবে, দেশবাসীর সব দুঃখ ঘুচে যাবে তা নয়। সে উন্নতি বা প্রগতির জন্য চাই সমাজ-বাদের প্রতিষ্ঠা ; চাই দেশের সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জনগণের মালিকানা। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে ধনতন্ত্রের বিকাশ ছাড়া সমাজে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র হয় না আর শোষণ তীব্র না হলে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নিরঙ্কুশ মালিকানার জন্য জনগণের শ্রেণীসংগ্রামও তীব্র হয়ে ওঠে না। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথও পরিস্কার হয় না।

১৮৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের শেষ দিকে ধনতন্ত্রের বিকাশ কিভাবে সমাজতন্ত্রের সূচনা করে অল্প কথায় তা চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেন। যে কোন বস্তু বা ঘটনার মত ধনতন্ত্রের মাঝখানেও আছে অন্তর্বিরোধ আর সেই অন্তর্বিরোধই ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের পর নিয়ে যায় তাকে পতনের দিকে। ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শোষণ ও শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষোভ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠে বিপ্লবের রূপ নেয় আর ঠিক তখনই প্রগতিশীল জাগ্রত জনগণ ধনীদের কাছ থেকে নিঃশেষে ছিনিয়ে নেয় যত মালিকানা আর প্রভুত্ব। মার্কস বললেন,

Bourgeois industry and commerce create these material conditions of a new world in the same way as geological revolutions have created the surface of the earth. When a great social revolution shall have mas-

tered the results of a Bourgeois epoch, the market of the world and the mordern powers of production and subjected them to the Common control of the most advanced peoples, then only will human progress cease to resemble that hideous pagan idol who would drink the nectar but from the skulls of the slain.

প্রবন্ধটির নাম "The Approaching Indian Loan." এখানে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তার মর্ম হলো এই যে, ধনতন্ত্র থেকে সমাজ-তন্ত্রে রূপান্তর একটি অনিবার্য ঘটনা। যেমন বহু ভূতাত্ত্বিক বিপ্লব পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠে এনেছে বহু রূপান্তর; সৃষ্টি করেছে পাহাড় পর্বত, নদ নদী আর সমুদ্রের তেমনি বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা আর একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্য সূচনা করবে এক নতুন পৃথিবীর ও এক নতুন সমাজের। আর তার জন্য রচনা করবে নতুন নতুন বাস্তব অবস্থা। উন্নত প্রগতিশীল জনগণ বৃহত্তর সমাজবিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে খতম করে উৎপাদনশক্তি কেড়ে নিলেই হবে নতুন যুগের সূচনা। সম্ভব হবে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। একটি সুন্দর ও সার্থক উপমার সাহায্যে ধনীদের শোষণের চিত্রটি এঁকেছেন মার্কস। ধনতান্ত্রিক যুগে ও সমাজে দেশের উন্নতি বলতেই বোঝায় ধনিক শ্রেণীর উন্নতি। গরীব নিঃস্ব শ্রমিকদের রক্ত শোষণ করা বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে শুধু একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে সেই ভয়ঙ্কর নররক্তপিপাসু পেগান দেবতার যে মরার মাথার খুলি ছাড়া অন্য কোন পানপাত্র থেকে কোন কিছু পান করবে না। নররক্তপায়ী সেই অদ্ভুত পেগান দেবতার মত ধনীরাও যেন গরীবদের রক্ত ছাড়া আর কিছুই পান করবে না।

এরপর ভারতের ভূমি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন মার্কস। তিনি বললেন ভারতের কৃষি ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক। সামন্ততান্ত্রিক এই ভূমি ব্যবস্থা ভারতে রচনা করেছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের এক

শক্ত সামাজিক ভিত্তি। রক্ষণশীল বৃটিশ শাসকশ্রেণী তাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এদেশে সৃষ্টি করল নতুন জমিদারশ্রেণী। জমিদারি আর রায়তদারির ভিত্তিতে সম্পত্তির উপর সৃষ্টি হলো নতুন মালিকানার জটিলতা।

বৃটিশ শাসনের ভূমি ব্যবস্থা কেমন ছিল একটি বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করেন মার্কস। আর এই ব্যাখ্যার পটভূমি হিসাবে নেন অযোধ্যার তালুকদারদের সম্বন্ধে লর্ড ক্যানিংএর ঘোষণা প্রসঙ্গ। সামন্তবাদী বৃটিশ সরকার সব সময় রক্ষা করে চলত অভিজাত জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থকে আর সঙ্গে সঙ্গে নির্মমভাবে পদদলিত করে চলত শোষিত চাষীদের স্বার্থ আর সুখ সুবিধার কথাকে। গরীব প্রজাদের পীড়ন করে যারা খাজনা আদায় করত তারাই ছিল সরকারের কাছে প্রিয় ও গণমান্য আর যারা খাজনা দিত তাদের কোন দাম ছিল না। অযোধ্যার জমিদার-প্রজা দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বৃটিশ নীতি থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। খাজনা দাতা প্রজাদের সব অধিকার নস্যাৎ করে দিয়ে অযোধ্যার তালুকদারদের স্বার্থই অক্ষুন্ন রেখেছিল বৃটিশ সরকার। গরীব চাষীদের কাছ থেকে সব স্বত্তাধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের জমির উপর কায়েম করেছিল তালুকদারদের অবিসংবাদী প্রভুত্ব।

বৃটিশ আমলে বহু দেশীয় রাজ্য ছিল এদেশে। পররাষ্ট্র ব্যাপার বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দিয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা ছিল স্বাধীন। জমিদার তালুকদার থেকে দেশীয় রাজাদের শোষণ ছিল আরও তীব্র আরও নিরঙ্কুশ। এই দেশীয় রাজাদের সম্পর্কে মার্কস কোন কিছু আলোচনা করেননি। তিনি শুধু বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন সমস্যার কথা। কারণ তিনি দেখে-ছিলেন বৃটিশ ভারতের জনগণের থেকে দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণ ছিল সব দিক থেকে পিছিয়ে। এবং বৃটিশ ভারতের জনগণ জেগে উঠে মুক্তি সংগ্রামে নামলেই জেগে উঠবে সারা ভারত।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে মার্কস কোন কথা না বললেও

জাতিভেদ প্রথার কুফলের কথাটি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। ধর্ম ও জাতিভেদ আসলে হলো অর্থনৈতিক অসাম্যের কুফল ছাড়া আর কিছুই নয়। বুর্জোয়ারা তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য এই ভেদপ্রথায় ইন্ধন জুগিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। দেশের জনগণ যখন আসল শ্রেণীচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে, যখন তারা বুঝতে পারবে সারা পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি অন্য কোন ধর্ম নেই, আছে শুধু শোষক আর শোষিত, বুর্জোয়া আর সর্বহারা, ধনী আর গরীব এই দুটো জাত, তখন তারা শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত করে দেবে যতসব জাতিগত ও শ্রেণীগত ভেদ।

মার্কস বলেছেন মোগল যুগে ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য ছিল অনেক বেশী। এই রাজনৈতিক ঐক্য না থাকার জন্য ভারতীয় জনগণ একযোগে কখনও স্বেচ্ছাচারী কোন রাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করতে পারেনি। ইতিহাসে বারবার তারা পরিণত হয়েছে, বিদেশী শক্তির শিকারে। মার্কস দেখলেন বৃটিশ আমলে রেলপথ ও তার ব্যবস্থার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় আগের থেকে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় দেশে।

এর পর ভারতে দেখা দিল ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ। অত্যাচারী বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য এই মহাবিদ্রোহ অজস্র অগ্নিতরঙ্গে উত্তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল দিকে দিকে। যে ভাড়াটে ভারতীয় সিপাইদের দিয়ে ভারতকে শাসন করছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সেই সিপাইরাই মেতে উঠল এক জীবনমরণ মুক্তিসংগ্রামে। ১৮৫৯ সালে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসাবে স্বাগত জানালেন এই সিপাহী বিদ্রোহকে। বিপ্লবী মার্কস এ বিদ্রোহের মধ্যে খুঁজে পেলেন এক বৃহত্তর গণবিপ্লবের স্বর্ণ সূচনা।

আমাদের দেশের সুরেন সেন প্রমুখ কয়েকজন ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে অভিহিত করতে অস্বীকার করেন। এমন কি সাম্যবাদী নেতা রজনী পাম দত্ত এই বিদ্রোহকে

এক নিছক সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করেন। যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন স্বত্ববিলোপ নীতির ফলে দেশীয় রাজা ও সামন্তরা ক্ষমতা ও অধিকার হারিয়ে এই বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের দ্বারা চালিত এই বিদ্রোহ ব্যাপক গণসমর্থন লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু মার্কস এ বিদ্রোহের মধ্যে দেখতে পান গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কয়েকটি লক্ষণ। তাঁর যুক্তি হলো এই যে, এই বিদ্রোহের উদ্ভব যেখান থেকেই হোক না কেন, এ বিদ্রোহ চালিত হয়েছিল একমাত্র সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সিপাইরা এই প্রথম দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের ইংরেজ কর্তাদের হত্যা করে। হিন্দু-মুসলমানরা তাদের ধর্মগত বিভেদ ভুলে গিয়ে একযোগে সংগ্রাম করতে থাকে। এ বিদ্রোহ প্রথম হিন্দুদের দ্বারা শুরু হলেও বিদ্রোহীরা সর্বসম্মতভাবে দিল্লীর সিংহাসনে একজন মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে তাঁকে তাদের জাতীয় নেতা বলে মেনে নেয়। আর একটা কথা, বিদ্রোহ এক জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি প্রধান প্রধান শহরে। গণসমর্থন না থাকলে কখনই এমন ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারত না এ বিদ্রোহ।

মার্কস আরও লিখেছিলেন, ক্রমে এমন আরও অনেক ঘটনা প্রকাশিত হবে যাতে করে জনগণ ভুল বুঝতে পারবে যাকে তিনি সাময়িক বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দিতে চাইছেন আসলে তা জাতীয় বিদ্রোহ।

ইংরেজদের তৎপরতায় পৃথিবীর নানা দেশের সংবাদপত্রে তখন সিপাইদের বর্বরতার কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে শুধু দেখানো হচ্ছিল একমাত্র সিপাইরাই নিষ্ঠুরভাবে ইংরেজদের উপর অত্যাচার করে। মার্কস তার প্রতিবাদ করে লেখেন, 'it would be an unmitigated mistake to suppose that all the cruelty is

on the side of the sepoys, and all the milk of human kindness flows on the side of the English.

একথা মনে করা একান্তভাবে ভুল হবে যে একমাত্র সিপাইরাই ছিল নিষ্ঠুর আর মানবিক দয়ার যত নির্মল দুধ প্রবাহিত হয়েছিল শুধু ইংরেজদের অন্তর থেকে।

মার্কসের মতে, যে কোন কারণেই হোক সিপাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল বলেই দিল্লীর পতন হয়, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এই বিদ্রোহ।

সিপাই বিদ্রোহের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার যে দ্রুত অবনতি ঘটে সে বিষয়েও আলোচনা করেন মার্কস। আথিক সংকটের চাপে জাতীয় ঋণের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, লণ্ডনের মুদ্রার বাজার থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে বাধ্য হয় ইংরেজ সরকার। ভারতীয় ধনিকদের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা সফল হয়নি। তারা সাড়া দেয়নি সরকারের আবেদনে।

সিপাই বিদ্রোহের পরেও ভারতের মুদ্রাবাজার থেকে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করে বৃটিশ শাসকশ্রেণী। কারণ তখন রেলপথ, বন্দর ও সেচখাল নির্মাণের জন্য প্রচুর টাকার দরকার হয়। এই সব খরচ চালাবার জন্য ভারত সচিব দেশীয় ধনিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দিতেন। দেশীয় ধনীদের তাঁরা বলতেন 'native Capitalists. কিন্তু বড়লাট প্রায়ই জবাবে জানাতেন, সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তারা লণ্ডনের মুদ্রাবাজার থেকে ঋণ করতেন আর সেই ঋণের সুদ মেটাতেন ভারতীয় রাজস্ব থেকে।

ইংরেজ শাসনে ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ কত ভয়ঙ্কর ছিল তা বিশেষ দরদের সঙ্গে তুলে ধরেন মার্কস। ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণ টাকা প্রতি বছর চলে যেত বৃটেনে। প্রথমত ভারতীয় রাজস্ব হিসাবে যেত প্রতি বছর পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড। তার উপর ইংরেজ কর্মচারীরা পাঠাতেন তাঁদের সঞ্চয় আর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা পাঠাতেন তাদের

লাভের অংশ। ভারতের মত গরীব অনুন্নত দেশের পক্ষে এই আর্থিক ক্ষতি সত্যিই ছিল ভয়াবহ। তাছাড়া ইংরেজরা শুধু ভারত থেকে সব টাকা লুণ্ঠন করে দেশে নিয়ে যেত। ভারতের উন্নয়নের দিকে মোটেই নজর দিত না। ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি বিনিয়োগ ছিল খুবই কম।

মার্কসের মতে ভারতের কর ব্যবস্থাও ছিল পীড়নমূলক। আপাততঃ ভারতীয় করের হার নিচু বলে মনে হলেও ভারতের গরীব জনসাধারণের কাছে তাই ছিল খুব বেশী। হৃদয়হীন ইংরেজ সরকার তাদের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছিল এই দুঃসহ করের বোঝা। আর এই কর আদায়ের জন্য শাসকশ্রেণী নির্মমভাবে নির্যাতন করত করদাতাদের উপর। নানারকমের বর্বর প্রথার আশ্রয় নিত।

সাম্রাজ্যবাদ জর্জরিত ভারতের মুক্তি সম্বন্ধেও চিন্তা করেন ভারতবন্ধু মার্কস। এ বিষয়ে দুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন ভারতের মুক্তি দুভাবে আসতে পারে। এ মুক্তি আসতে পারে, যদি ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীকে তাড়িয়ে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। কারণ কোন সমাজবাদী প্রগতিশীল কোন শ্রমিক সরকার সাম্রাজ্যবাদ বা পররাজ্যপীড়নের নীতিকে কখনই সমর্থন করবে না। অথবা এমনও হতে পারে যে কালক্রমে ভারতীয় জনসাধারণই বিপ্লবের দ্বারা ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাবে।

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ইংলণ্ডে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকদল ভারতের ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনকে আর ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা না করে স্বাধীনতা দেয় তাদের। এদিকে ধনতন্ত্রের বিকাশ জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে আরও। ভারতের ধনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নবজাগ্রত শ্রমিকশ্রেণী বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে এক নতুন শক্তিরূপে গড়ে ওঠে। তাছাড়া দেশের ধনী ব্যবসায়ী ও বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাটরা বিদেশী পুঁজি-

পত্তিদের তাড়াবার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনকে সাহায্য করে নানা ভাবে।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার প্রবক্তা মার্কস দেখলেন দেশে দেশে যে সব আন্দোলন হচ্ছে তা উপর থেকে দেখে রাজনৈতিক মনে হলেও তার মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক। সমকালীন বিভিন্ন দেশের সংকট আর্থিক সংকটের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মার্কস অর্থনীতির ব্যাখ্যায় একটি সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুললেন।

এর ফলস্বরূপ ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে একটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেন মার্কস। তার নাম Grundrisse der kritik der Politiclren Oekonomic অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনার কয়েকটি মূল কথা। এই রচনা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির আলোচনা ও ক্যাপিটাল রচনার ভিত্তি বলা যেতে পারে।

পরের বছর জুন মাসে অর্থাৎ ১৮৫৯ সালে পুরো পাণ্ডুলিপিটি নতুন করে প্রকাশের জন্য রচনা করেন। প্রকাশিত হলে এর নাম হয় Contribution to the critique of Political Economy. এই রচনায় তিনি প্রথম অর্থতত্ত্ব ও উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ ভাবে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে এঙ্গেলস পরে বলেন, এই উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মার্কস ১৮৫০ সাল থেকেই গবেষণা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে আরও ভালভাবে না জেনেশুনে বা নিশ্চিত না হয়ে কিছু প্রকাশ করতে চাননি। গবেষণা কাজে ভালভাবে সন্তুষ্ট না হয়ে কখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না মার্কস।

মার্কস আসলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখতে চেয়েছিলেন। তারই প্রথম খণ্ডরূপে এই রচনাটির পরিকল্পনা করেন। আট বছর পরে সে পরিকল্পনা বদল করে ক্যাপিট্যাল এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এ রচনায় যা কিছু আছে তাই আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে ক্যাপিটালে। এই রচনায় মার্কস দেখালেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল কথাগুলি কি। তিনি

দেখালেন কোন সমাজের উন্নতি বা অগ্রগতির প্রথম কথা হলো উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সামঞ্জস্য এবং সার্বিক সাযুয্য। ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে কোন মিল থাকে না। যে শ্রমিকরা অক্লান্ত শ্রমের দ্বারা উৎপাদনশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তারা উৎপাদনের কোন অংশ না পাওয়ায় স্বভাবতই তারা উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে তোলে। সমাজে শ্রমিক মালিক, শোষক ও শোষিত এই দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। একমাত্র বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তনের দ্বারাই এর সমাধান করা যেতে পারে।

মার্কস তাঁর 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা' বইখানির মুখবন্ধে সমাজ-বিবর্তনের কয়েকটি পর্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মানব-সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আদিকাল হতে আজ পর্যন্ত এশিয়াটিক, প্রাচীন, ফিউডাল ও আধুনিক বুর্জোয়া এই চারটি যুগে ভাগ করেন।

১৮৫৭-৫৮ সালের পাণ্ডুলিপিতে পুঁজিবাদের উদ্ভবের আগে পৃথিবীর সমাজব্যবস্থায় চারটি সংগঠনের উল্লেখ করেন। এগুলি হলো, এশিয়াটিক, শ্ল্যাভোনিক, ক্ল্যাসিকাল ও জার্মানীয়। এই চারটি সংগঠনকে মার্কস প্রাচীন প্রাথমিক সংগঠনের বিভিন্ন টাইপ হিসাবে তুলে ধরেছেন। শেষের দুটি সংগঠন থেকে ইউরোপীয় ফিউডালইজমের উদ্ভব হয়েছে।

বনিয়াদ ও উপরিগঠন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস বলেন, মানব সমাজের আদি পর্যায়ে সার্বিক সম্পত্তির ধরন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে: যেমন ইউরোপের প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল ব্যবস্থা যেখানে ভূসম্পত্তি ও কৃষিভিত্তিক নগর ছিল সামাজিক পরি-বর্তনের কেন্দ্রস্থল। অথবা জার্মানীয় ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রতিটি পৃথক পৃথক পরিবার। যেখানে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তায় আংশিক বিকাশ সম্ভব। আর একটি প্রাথমিক সমাজসংগঠন হলো এশিয়াটিক ব্যবস্থা।

আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ থেকে কিভাবে যৌথ ও ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হয় তা দেখানোই ছিল মার্কসের আলোচনার মূল বিষয়। তাঁর মতে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনে মানুষের প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষের সহজাত। এই সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে মানুষ। জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় মানুষকে। গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের কল্পনা একটি নির্বোধ ধারণা।

মার্কসের মতে এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ হলো সম্প্রদায়গত সার্বজনীন সম্পত্তি। এ ধরণের ব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্প্রদায়ের সভ্য হিসাবে সম্পত্তির মালিক ভাবতে পারে নিজেকে। এখানে সমাজের সব সম্পত্তি সকলের সম্পত্তি।

কিন্তু পরে রাজা বা সম্রাটের আবির্ভাব হয়েছে। সম্পত্তির গোষ্ঠীগত মালিকানার উপর নিজের দখলগত স্বত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে। মার্কসের মতে প্রাতিজনিক একটি মহাসমগ্রতা যেন 'সম্রাট উপাধি' ধারী একটি ব্যক্তির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এইভাবেই উদ্ভব হয়েছে প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের। সার্বজনীন শ্রম ও ফলের নৈবেদ্য হিসাবে সমস্ত উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিবেদন করা হত স্বৈরাচারী রাজা বা সম্রাটের কাছে। এখানে রাজা বা সম্রাট হচ্ছে গোষ্ঠীকল্পিত ভগবৎ-সত্তার জীবন্ত প্রতীক।

মার্কসের মতে এশিয়াটিক সমাজ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো গ্রাম অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি স্থানিক সম্প্রদায়। হাতের কাজ ও চাষের কাজই হলো এই সব সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি। অত্যন্ত নিম্নমানের সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একটি গ্রামীণ সম্প্রদায়। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের কোন সংযোগ থাকে না বলে রাস্তাঘাটের একান্ত অভাব।

মার্কস তাঁর ক্যাপিটালে আবার দেখিয়েছেন নিম্নমানের কৃষিকার্য এবং কুটিরশিল্পই হলো ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি এশিয়ার দেশগুলির

উৎপাদন ব্যবস্থার বনিয়াদ। শহর এ ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

তবে মাঝে মাঝে এক একটি জায়গায় শহর গড়ে উঠেছে। কিন্তু শহর গড়ে উঠেছে একমাত্র সেই সব জায়গায় যেখানে বহির্বাণিজ্যের সুবিধা আছে আর যেখানে রাষ্ট্রশাসক তাঁর খাজনা বা উদ্বৃত্ত উৎপাদন শ্রমের পরিবর্তে বিনিয়োগ করেন। আসলে কিন্তু গ্রাম-কেন্দ্রিক এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থার মাঝে শহর একটি কৃত্রিম আয়োজন।

এঙ্গেলসের মতে এশিয়াটিক সমাজব্যবস্থা হাজার হাজার বছরের। মার্কসও এক জায়গায় বলেছেন, অতীত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেহারা যতই পরিবর্তনশীল মনে হোক না কেন, অতি প্রাচীনকাল থেকে এর সামাজিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে।

এই সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন, এশিয়ার পল্লীজীবন জড়ত্বপূর্ণ। সামাজিক অগ্রগতির জন্য যে আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা দরকার তা সেখানকার পল্লীবাসীদের নেই। যে মানুষ পরিবেশের প্রভু হতে পারে তাকে তারা তার দাস করে রেখেছে। যে সমাজ আপনি গড়ে উঠেছিল তাকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করেছে; এইভাবে অবিরাম তারা প্রকৃতি পূজার আয়োজন করে চলেছে। এই প্রকৃতি পূজার অর্থ হলো বানর, হনুমান ও কামধেনু অবলার পায়ে প্রকৃতির সম্রাট যে মানুষ তার আত্মনিবেদন।

যে দেশের উৎপাদন পদ্ধতি যত ট্র্যাডিশনাল বা পুরনো ধাঁচের সে দেশের সমাজব্যবস্থা তত রক্ষণশীল তত অপরিবর্তনশীল। আর পুরনো ধাঁচের উৎপাদনপদ্ধতি কৃষি ব্যবস্থায় আর কুটির শিল্পে সবচেয়ে বেশীদিন টিকে থাকে। প্রাচ্যের দেশগুলো কৃষি ও কুটিরশিল্প প্রধান বলে পুরনো উৎপাদনপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সমাজব্যবস্থাও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে।

প্রাচ্য দেশগুলোর সমাজব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও অপরিবর্তনশীলতার আর একটি কারণ আছে।

উৎপাদন ব্যবস্থার দুটি দিক আছে—কৃষি ও শিল্প। এই দুই দিকের মধ্যে একটি সুষম সাযুয্য বা সামঞ্জস্য না থাকলে কোন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই টিকে থাকতে পারে না। এশিয়ার দেশ-গুলোতে শিল্প বলতে যা ছিল তা একমাত্র হস্তশিল্প বা কুটিরশিল্প। সেখানে কৃষি ও কুটিরশিল্প বরাবর মিলে মিশে সংজনন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সংগঠনের কাজগুলি নীরবে করে এসেছে। ফলে উৎপাদন চক্রটি একেবারে কখনও ভেঙ্গে পড়েনি এবং সমাজের অর্থনীতির কাঠামোটার কখনও উন্নতি সাধন করতে না পারলেও তাকে ভেঙ্গে পড়তে দেয়নি।

মার্কস প্রাক পুঁজিতান্ত্রিক যে সব প্রাথমিক সংগঠন ও সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন যার অন্যতম হলো এশিয়াটিক ব্যবস্থা, সেগুলো আবার সব এক ধাঁচে গড়া নয়। তবে তা না হলেও চরিত্রগত মিল আছে তাদের মধ্যে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে শ্লাভোনিক সংগঠন এশিয়াটিক সংগঠনেরই কিছুটা পরিবর্তিত রূপমাত্র। আবার মেক্সিকান পেরুভিয়ান ও কেল্টিক সংগঠনগুলোর মূল বনিয়াদ হলো এশিয়াটিক ব্যবস্থা অর্থাৎ সার্বজনীন শ্রম সংগঠন। তবে রাশিয়ার গ্রামীণ কৃষি-ব্যবস্থা এশিয়াটিক ব্যবস্থা থেকে একটু ভিন্ন ধরণের। কারণ সেখানে চাষী আগে থেকেই তার বসতবাড়ি ও বাড়িসংলগ্ন বাগানের মালিক।

ইউরোপে ব্যক্তিগত দাসপ্রথা থাকলেও সেখানে ব্যক্তিগত অধিকারের সামাজিক স্বীকৃতি থাকায় সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশলাভের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এশিয়াটিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত থাকায় সম্প্রদায়গত এক সাধারণ দাসত্ব বিরাজ করে এসেছে সেখানে। ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা সেখানে বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি।

কিন্তু আগে বা প্রাচীনকালে যাই থাক মার্কসের আমলেই এশিয়ার ভূমি ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে। আগে যেখানে ছিল জমির সম্প্রদায়গত বা সার্বিক মালিকানা সেখানে জমির উপর দীর্ঘকালীন ব্যক্তিগত

মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এশিয়াটিক সমাজ ব্যবস্থারও কিছুটা পরিবর্তন হয়। তবে এ পরিবর্তন বাইরে থেকে আসা অর্থাৎ বৃটিশ পুঁজিবাদের আঘাতের ফলে সেখানে ভাঙ্গন ধরে পুরনো সমাজব্যবস্থায়। তা না হলে হয়ত এ ভাঙ্গন ধরত না। কারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ এ ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পরিবর্তনের কোন বীজ নিহিত ছিল না।

রাশিয়ার সমাজকে 'প্রায় এশিয়াটিক' বলে অভিহিত করেছেন মার্কস। কারণ সেখানে তিনি দেখেছেন সার্বজনীন ও সম্প্রদায়গত স্বত্বাধিকার ও ব্যক্তিগত মালিকানার সহ-অবস্থান। রাশিয়ার মধ্যে অদ্ভুত একটি ক্ষমতা দেখেছিলেন মার্কস। তিনি দেখলেন পুঁজিবাদী নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার ভাল ফলগুলো গ্রহণ করে রাশিয়া তার গ্রামীণ সম্প্রদায়গত প্রাচীন সংগঠনকে ধ্বংস না করে তার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। তাকে এক উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং মার্কসের মতে প্রাথমিক পর্যায়ের সংগঠনগুলোর মধ্যে রাশিয়ার সংগঠন একটি উন্নততম পর্যায়।

তবে সে যাই হোক এশিয়াটিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্রী সম্রাট তার আমলারগুলী আর জমিদার সম্প্রদায়ই ছিল উদ্বৃত্ত উৎপাদন ভোগী শাসকশ্রেণী। তারাই গরীব প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা ভূমি-রাজস্বের উদ্বৃত্ত ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিত নিজেদের মধ্যে। এ বিষয়ে ১৮৬১-৬৩ সালের উদ্বৃত্ত মূল তত্ত্বে উল্লেখ করেছেন মার্কস। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড জোনসের কথাও উদ্ধৃত করেছেন তিনি। আর জমিদারদের উদ্বৃত্ত আহরণ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন তাঁর ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে।

এশিয়াটিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আমলাদেরও একটি ভূমিকা ছিল। কিন্তু এই আমলা প্রথা কিভাবে গড়ে ওঠে আর তার আসল ভূমিকাই বা কি সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু আলোচনা করেননি মার্কস। যদিও বোনাপার্টিজম্ এর ব্যাখ্যায় তিনি ইউরোপীয় আমলা প্রথার উল্লেখ করেছেন।

তেরো

'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সমালোচনা' বইখানি প্রকাশের পর কিছু দিনের জন্য অর্থনৈতিক গবেষণা ছেড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর দিকে মন দিলেন মার্কস। খণ্ড ইটালি ও জার্মানীর একত্রীকরণের জন্য আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অস্ট্রীয়ার সাম্রাজ্যবাদী শাসন-পাশ হতে মুক্ত হতে চাইছে ইটালি।

এই সব ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিলেন মার্কস। ১৮৪৮ সালের মত এবারও তিনি সমর্থন করলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে। তিনি শুধু চাইলেন এ আন্দোলন আরও ব্যাপক হোক, জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, পেটি-বুর্জোয়া ও ভূমিকৃষকরা তাতে আরও ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করুক। ইটালি, জার্মানী, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া যে কোন দেশের রাজনৈতিক সমস্যার কথা আলোচনা করুন না কেন তাতে গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে জোরাল ভাষায় সমর্থন করতেন মার্কস। এক ব্যাপকতর গণ সমর্থন ও গণশক্তির ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাইতেন সে আন্দোলনকে।

১৮৫৯ সালে অষ্ট্রীয়া-ইটালি-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধে ফরাসী দেশের লুই বোনাপার্টের কারসাজিটিকে তুলে ধরেন মার্কস। ইটালির মুক্তির ধুয়ো তুলে নিজের রাজকীয় স্বার্থের কথাটাকে ঢেকে রাখতে চাইছিলেন বোনাপার্ট। মার্কস বললেন, ইটালির ঐক্য এবং স্বাধীনতা একমাত্র জাতীয় অভ্যুত্থানের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। একমাত্র জাতীয় অভ্যুত্থানের দ্বারাই ইটালির জনগন অষ্ট্রীয়ার শাসনপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করে একক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে সেখানে। বাইরের কোন শক্তির সাহায্যে নয়।

মার্কস আরও বললেন, বোনাপার্টের হয়ে যারা প্রচার করছে তারা ইটালির জনগণের শত্রু নয়, তারা জার্মান বিপ্লবেরও শত্রুতা করে

ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে জোরদার করছে। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত 'হের ভগ' নামে একটি পুস্তিকায় মার্কস বোনাপার্টের দালালদের তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করেন।

এই সময় জার্মানীর ঐক্য নিয়ে মার্কস ও ফার্ডিন্যাণ্ড ল্যাসেলের মধ্যে তীব্র মতভেদ হয়। প্রুশিয়াকে সমর্থন করে ল্যাসেল বললেন প্রুশিয়ার সাহায্যে জার্মানীর ঐক্যকরণ সম্ভব। অর্থাৎ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এক প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে। 'ইটালির যুদ্ধ ও প্রুশিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় তাঁর মত প্রকাশ করে প্রচার করতে লাগলেন ল্যাসেল।

কিন্তু মার্কস বললেন, না, তা হবে না। জার্মানীর ঐক্য প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে একেবারে নিচের তলা থেকে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে।

যাই হোক মার্কস ও ল্যাসেলের মতভেদ চরমে ওঠে, ল্যাসেল যখন জার্মান শ্রমিকদের সাধারণ সংস্থার প্রধান হয়ে ওঠেন। মার্কস অত্যন্ত রেগে গেলেন এই কারণে যে এই সংস্থার প্রধান হয়ে এমন কতকগুলি কর্মসূচী ল্যাসেল গ্রহণ করলেন যেগুলি সাম্যবাদী ইস্তাহারের একেবারে উল্টো। তিনি ধরলেন সম্পূর্ণ অন্য পথ। বলতে লাগলেন অন্য কথা। শ্রেণীসংগ্রাম ধর্মঘট প্রভৃতি শ্রমিক আন্দোলনের নির্ধারিত পথগুলি এড়িয়ে গিয়ে ল্যাসেল শ্রমিকদের বললেন এক নতুন নিয়মতান্ত্রিক পথ ধরতে যে পথে সবচেয়ে ঝুঁকি কম। শ্রমিকদের সামনে তিনি তুলে ধরলেন এক ভ্রান্ত আশার ছবি। বললেন, তোমরা প্রুশীয় সরকারের বিরোধিতা করো না। কারণ প্রুশীয় সরকার উৎপাদক সংস্থা গড়ে তুলে সমস্ত রকমের শোষণ থেকে মুক্ত করবে তোমাদের। ল্যাসেলের একমাত্র দাবী হলো প্রাপ্তবয়স্ক সকলের জন্য সমান ভোটাধিকার। এমন কি তিনি বিসমার্ককেও কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে সমর্থন করবেন বলে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, বিসমার্ক যদি সকলকে

ভোটাধিকার দেন তাহলে তারা তাঁর আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি সমর্থন করবেন।

ল্যাসেলের আর একটি দোষ ছিল। তিনি শ্রেণীসংগ্রামে কৃষক সম্প্রদায়ের কোন গুরুত্ব স্বীকার করতেন না। উল্টো কৃষকদের তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলে গালাগালি করতেন। অথচ মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনেই সব সময় কৃষকদের সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই মনে করতেন।

এদিকে ল্যাসেল বিসমার্কের সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা চালালেও সেকথা বেশীদিন গোপন রইল না মার্কসের কাছে। সেকথা শুনে ল্যাসেলকে তিনি বললেন, প্রুশীয় রাজদরবারের মুখপত্র। যাই হোক ল্যাসেল হঠাৎ মারা যেতেই ব্যাপারটিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল এইখানেই। এঙ্গেলস মন্তব্য করলেন, বিসমার্কের সঙ্গে ল্যাসেল যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন তা সত্যি সত্যিই ভয়ঙ্কর। আসলে সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি এক নির্মম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিক্রিয়াশীল প্রুশীয় সরকারের কাছে শ্রমিকদের স্বার্থকে বিকিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

মার্কস এবার পুঁজিবাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য তথ্যনির্ভর আলোচনায় মন দিলেন।

পুঁজিবাদ সম্বন্ধে মার্কস তাঁর বক্তব্য মোটামুটিভাবে তুলে ধরেন 'সাম্যবাদী ইস্তাহারে'। পরে অর্থবিজ্ঞানের খুঁটিনাটির সঙ্গে এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে আলোচনা করেন 'দাস ক্যাপিটাল' এর প্রথম খণ্ডে। কিন্তু তার সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্বন্ধে অনেক কিছু চিন্তা করেন মার্কস।

মার্কস তাঁর 'হলি ফ্যামিলি' বা পবিত্র পরিবার গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, সমাজবাদী তাত্ত্বিকেরা সর্বহারাদের মধ্যে যে যুগান্তকারী শক্তির সন্ধান পেয়েছেন তার কারণ এই নয় যে তাঁরা সর্বহারাকে দেবতা ভাবেন। বরং তার উল্টোটাই। মানুষ বলতে যা বোঝায়,

এমন কি, আজীবন দারিদ্র্য শোষণ লাঞ্ছনা আর বিড়ম্বনার চাপে মনুষ্যত্ববোধ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে সর্বহারাদের মধ্য থেকে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা সর্বহারাদের মনুষ্যতর জীবে পরিণত করেছে। আজ অবশ্য চেতনা জেগেছে তাদের মনে। এই অমানুষিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শক্তি পেয়েছে তারা।

এই সর্বহারা শ্রেণী পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। মার্কস জগতের সব বস্তুর মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার ও স্ববিরোধিতার সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি দেখালেন অন্যান্য সব বস্তুর মত পুঁজিবাদের মধ্যেও অন্তর্বিরোধ আছে। তার মানে এই যে পুঁজিবাদ যত শক্তিমান হবে ততই তার সমস্যাও বেড়ে যাবে। পুঁজিবাদ শুধু নিজের সমস্যা সৃষ্টি করে না, যে সর্বহারা শ্রেণী তার কবর খোঁড়ে, সর্বহারা শ্রেণীকেও সৃষ্টি করে সে। এই সর্বহারা শ্রেণীই সর্বাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের ধ্বংস করে! মার্কস তাই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে বলেছেন আন্তর্জাতিক সমাজবিপ্লবের অগ্রগামী পথিক।

কিন্তু অনেকে মার্কসের এই মতবাদের সমালোচনা করে বলেন, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে শ্রমিক-শ্রেণী পুঁজিবাদের মূল চরিত্র মেনে নিয়ে সংস্কারবাদী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণী কখনই বিপ্লবী হয়নি। কখনও যে হবে তার আশাও নেই।

কিন্তু আমার মতে একথা মার্কসীয় তত্ত্বের কোন ভ্রান্তি বা অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে না। যারা একথা বলেন তাঁদের মনে রাখা উচিত, ঐ সব দেশে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে আর তার ফলে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে নিযুক্ত কর্মীদের বেতনও বেড়েছে। শ্রমিকরা বিপ্লব না করেও পুঁজি-পতিদের কাছ থেকে কিছু কিছু সর্ত আদায় করতেও পেরেছে। ও দেশের পুঁজিপতিরা উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে ও তাদের জীবন-

যাত্রার মান উন্নত করে মার্কসীয় তত্ত্বের অভ্রান্তি ও সত্যতাকেই প্রমাণিত করেছেন। কারণ তারা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত গলদ কোথায় অর্থাৎ পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ ঠিক কোথায় নিহিত আছে তা হয়ত আগে থেকেই বুঝতে পেরে সচেতন হয়েছেন সে বিষয়ে।

সর্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লবী মনে করার কারণ শুধু সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি মার্কসের অন্ধ আবেগ বা বিশ্বাস নয়। এর পিছনে আছে তথ্যনির্ভর বৈজ্ঞানিক যুক্তি। তিনি দেখিয়েছেন সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীই সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং পুঁজিবাদের অপরিহার্য অঙ্গ। তারাই আসলে পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক। সুতরাং তারা যদি ইচ্ছা করে তাহলে এই পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতেও পারে। আর এই ইচ্ছাটা জাগাও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয় তাদের পক্ষে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার গলদের ফলে তারা যাবতীয় জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও এমন কি মনুষ্যত্ববোধ থেকে বঞ্চিত।

অনেকে আবার প্রশ্ন করতে পারে সর্বহারারা কিভাবে বিপ্লবী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান সর্বহারাদের এই বৈপ্লবিক শ্রেণীতে রূপান্তরের পিছনে কোন বিশেষ প্রক্রিয়া কাজ করে কি না।

কিন্তু মার্কসের মতে এই রূপান্তরের পিছনে আলাদা কোন প্রক্রিয়া নেই, আসলে পুঁজিবাদের মধ্যেই নিহিত আছে বিপ্লবের বীজ। যে প্রক্রিয়া পুঁজিবাদকে গড়ে তোলে সেই প্রক্রিয়াই সর্বহারাদের সৃষ্টি করে। আবার সেই প্রক্রিয়াই সর্বহারাদের বিপ্লবী শ্রেণীতে পরিণত করে।

মার্কস বলেছেন, এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো, মূলধন গড়ে তোলার আদিম পর্যায়। এই পর্যায়ে পুঁজিপতিরা উৎপাদনের হাতিয়ার বা উপকরণগুলি শ্রমিকদের হাত থেকে কৌশলে কেড়ে নেয়। শ্রমিকরা শুধু বেতনভোগী মজুরে পরিণত হয়। তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে খুব কম বেতন দিয়ে তাদেরশ্রম কিনে নেওয়া হয়। এইভাবে উপাদানের সমস্ত উপাদানগুলি হাত করে পুঁজিপতিরা

ক্রমাগত পুঁজি বাড়িয়ে চলে। এইভাবে পুঁজিবাদ যত বাড়তে থাকে পুঁজিপতিরা তত উৎপাদনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে থাকে নিজেদের হাতে, সর্বহারারাও তত সংখ্যায় বেড়ে উঠতে থাকে। ততই শোষণও বাড়তে থাকে।

এই শোষণের পিছনে একটি রহস্য আছে।

আসলে মজুরি হচ্ছে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য। কিন্তু পুঁজিপতি মালিকরা শ্রমিকদের মজুরি হিসাবে যা দেন তা তাদের শ্রমের দ্বারা তৈরি উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে অনেক কম। এইভাবে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের ফাঁকি দিয়ে তাদের ঠিকমত মজুরি না দিয়ে তা সঞ্চয় করতে থাকেন। এই সঞ্চয়ই বাড়তে বাড়তে পুঁজিতে পরিণত হয়।

পুঁজির পরিমাণের সঙ্গে সর্বহারা শ্রমিকদের সংখ্যাগত আধিপত্যও বাড়তে থাকে। যে পুঁজিপতির একটা কারখানা আছে, পুঁজি বাড়লে তিনি আর একটা কারখানা বাড়ান। কিন্তু শ্রমিকদের সংখ্যাগত আধিপত্যই তাদের বিপ্লবী হওয়ার কারণ নয়। শ্রমিকদের ঠকিয়ে তাদের প্রাপ্য মজুরি বা শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য না দিয়ে পুঁজিসঞ্চয় ও অতি-মুনাফার লোভ বেড়ে যায় নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই। তা যদি না বাড়ত, শোষণের তীব্রতা যদি ক্রমশ প্রকট না হয়ে উঠত তাহলে সর্বহারা শ্রেণীর লোকেরা কিছুতেই বিপ্লবী হয়ে উঠত না। শুধু শোষিত বা সর্বহারা কেন, কোন মানুষই জন্ম থেকে বিপ্লবী হয়ে ওঠে না। দীর্ঘ দিনের বঞ্চনা লাঞ্ছনা আর ক্ষোভই মানুষকে বিপ্লবী বা বিদ্রোহী করে তোলে তিলে তিলে।

পুঁজিবাদ কখনও একদিনে শিকড় গেড়ে ওঠে না কোন দেশে। পুঁজিবাদ বিকাশের দুটি যুগ আছে। মার্কসের ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের ইংরাজি সংস্করণের সম্পাদনা করতে গিয়ে ভূমিকায় এঙ্গেলস বলেছেন, অর্থনীতির ইতিহাসে দুটো বিরাট ও ভিন্ন প্রকৃতির যুগ আছে। প্রথম হচ্ছে উৎপাদনের যুগ। এ যুগে মানুষের কায়িক পরিশ্রমেরই প্রাধান্য ছিল। তখন যন্ত্রের আবির্ভাব হয়নি। আর

দ্বিতীয় হচ্ছে যন্ত্রশিল্পের যুগ। এ যুগে যন্ত্রই প্রধান হয়ে ওঠে উৎপাদনের ক্ষেত্রে।

এই দুই যুগের সীমারেখার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব। এই শিল্প বিপ্লব প্রথম শুরু হয় ১৭৩৫ সালে যখন ইংলণ্ডের উইয়াট সুতোকাটা কলের আবিস্কার করেন। এই শিল্প বিপ্লব নানা রকমের বহু নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে চরম আকার ধারণ করে ১৮১৫ সালে।

পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এই দুই যুগের ভূমিকার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু সে পার্থক্য যতই থাক্, মার্কসীয় অর্থনীতি-বিদদের কাছে তার কোন গুরুত্ব নেই। কারণ মার্কসীয় অর্থনীতিকদের মতে এই দুই যুগের যা পার্থক্য তা শুধু বাইরের, আসলে এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। স্থির ও পরিবর্তনশীল মূলধন, অর্থের পুঁজিতে রূপান্তর, পুঁজিবাদ, উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি, উৎপাদনের উপাদান, উৎপাদন ক্ষমতার প্রসার প্রভৃতি অর্থনীতির মূল প্রত্যয়গুলি সমান থাকে দুই যুগেই। তত্ত্বের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই দুই যুগের। অর্থনীতির মূল তত্ত্ব বা প্রত্যয়গুলি দুই যুগেই সমান প্রযোজ্য।

মার্কস অবশ্য দুই যুগেরই কথার উল্লেখ করেছেন। দুই যুগেরই কিছু না কিছু অবদান আছে পুঁজিবাদের বিকাশের ইতিহাসে। মার্কস বলেছেন, ইতিহাসে দেখি শ্রমবণ্টন হচ্ছে উৎপাদন যুগের বৈশিষ্ট্য আর এই শ্রমবণ্টন বার বার ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ক্রমশ সার্থক হয়ে ওঠে।

উৎপাদন যুগের সবচেয়ে বড় অর্থনীতিবিদ হলেন অ্যাডাম স্মিথ। তিনিও শ্রমবণ্টন বা শ্রমবিভাগের প্রশংসা করেছেন। শিল্পের পৃথক পৃথক অংশ পৃথক পৃথক ভাবে উৎপন্ন হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা তাদের আপন বিশেষায়িত দক্ষতার পরিচয় দেবার সুযোগ পায়। ফলে উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাসে এটি একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ।

উৎপাদন যুগ ছিল প্রাচীন কারিগরি শিল্পের উন্নত রূপ। নানা ধরণের কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বহু সুদক্ষ শিল্পী এক একটি সংস্থাতে জড়ো হয়ে কাজ করত। বংশানুক্রমে তাদের কারিগরি দক্ষতা সন্তান সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হত।

কিন্তু উৎপাদন যুগের একটি বড় রকমের দোষ হলো এই যে, এই যুগের শোষণ সত্বেও শ্রমিকদের কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক চেতনা ছিল না। এ যুগের কুশলী কারিগরেরা প্রায়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও রক্ষণশীল হত। তার ফলে তারা প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা ত দূরের কথা সে ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল নিজেদের। ক্রমবর্ধমান বা পুঁজিবাদ যে শোষিত শ্রমিকদের সর্বহারা শ্রমিকদের স্বার্থের একান্ত পরিপন্থী এবং এই পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে মুক্তি আনতে হলে যে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন সেকথা তাদের মাথায় আসেনি।

তাছাড়া নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারের ব্যাপারেও অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল উৎপাদন যুগ। তবে এই সব রক্ষণশীলতা সত্বেও একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, সে যুগের ভাবধারা নতুনকে সহ্য করতে পারত না কিছুতেই। সে যুগের চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র যদি নতুন নতুন উদ্ভাবনার উপযোগী না হত তাহলে শিল্পবিপ্লবের উদ্ভব বা বিকাশ মোটেই সম্ভব হত না। অবশ্য পুরনো পদ্ধতির অনুরাগীরা প্রায়ই বাধা সৃষ্টি করেছে নতুন উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে। আর তাছাড়া কোন নতুন উদ্ভাবনা অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসেনি উৎপাদন পদ্ধতি থেকে, এসেছিল সম্পূর্ণ বাইরে থেকে। কিন্তু সে যাই হোক, এ যুগের লোকেরা না চাইলেও যন্ত্রযুগ অপরিহার্য ও অপ্রতিহতভাবেই ধীরে ধীরে দখল করে নিয়েছিল উৎপাদন যুগের সব ক্ষেত্রগুলিকে। নতুনকে না চাইলেও বাধা দিতে পারেনি তার অগ্রগতিকে।

এরপর এল যন্ত্রযুগ। প্রথমে শিল্পের একটি শাখায় যন্ত্র এল। কিন্তু একটি শাখায় যন্ত্রের আবির্ভাব ও তার সার্বিক প্রয়োগের সঙ্গে

সঙ্গেই অন্য শাখাতেও শুরু হয়ে গেল গবেষণা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সব শাখাতেই ছড়িয়ে পড়ল যন্ত্র এবং পরিশেষে তা এক প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল সমাজের গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার।

এই যন্ত্রযুগ সম্বন্ধে মার্কস বললেন, শিল্পের এক শাখায় পরিবর্তন এলে অন্য শাখাতেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। যেমন যন্ত্রে সুতো কাটা হলে সুতো বোনাও শেষ পর্যন্ত যন্ত্র হতে বাধ্য। সুতোবোনার যন্ত্র আসার ফলে কাপড়ের উৎপাদন আরও উন্নত হলো। সুতোকাটার যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে দিন দিন আবিষ্কারের উৎসাহ দেখা দিল এবং জিন আবিষ্কারের ফলে তুলো থেকে বীজ আলাদা করার কাজ সহজ হলো। সুতরাং উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে গেল।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, শিল্প ও কৃষিতে এই সব যান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য দিকেও এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। অন্যান্য নতুন নতুন দিকেও যন্ত্রশিল্প আবিষ্কৃত হলো। যাতায়াত যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলো। একে একে এল রেল, ষ্টীমার, জাহাজ, টেলিগ্রাম প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প।

তবে একটা জিনিষের অভাব রয়ে গেল এত কিছু সত্ত্বেও। বড় রকমের লৌহশিল্পের কাজ সম্ভব হলো না তখনও। কারণ খুব বড় লোহাকে পিটিয়ে, ছেনে, কেটে নতুন আকারে গড়তে হলে যেসব বড় বড় যন্ত্রের দরকার সে যুগে তখনও তা আবিষ্কৃত হয়নি।

যন্ত্রশিল্পকে স্বাবলম্বী হতে হলে যন্ত্র তৈরী করার বড় বড় যন্ত্র দরকার। আর এই সব যন্ত্রই আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার হাতিয়ার। এই সব যন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে রেল ও সমুদ্রগামী জাহাজে অভাবনীয় উন্নতি ঘটল। আরও নতুন নতুন দানবাকৃতি যন্ত্রপাতির দরকার হলো।

আগেকার উৎপাদন যুগের পুঁজিবাদ ছিল রক্ষণশীল। শুধু তাই নয়, আগেকার উৎপাদনব্যবস্থার প্রকৃত রহস্য ও সামাজিক পদ্ধতিটি বাইরের মানুষের কাছেও এমন কি শ্রমিকদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল।

যার ফলে উৎপাদনক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ ও উপক্রিয়াগুলোকে ধাধা বলে মনে হত। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার আবির্ভাব ও তার ব্যাপক প্রয়োগের ফলে উৎপাদনব্যবস্থা ও তার ক্রিয়া উপক্রিয়ার সব রহস্যগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠল সকলের কাছে। তাছাড়া শিল্প হয়ে উঠল স্বাবলম্বী। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার ফলে শিল্পকে আর সুদক্ষ কারিগরের কলাকৌশলের উপর বা তাদের মর্জির উপর নির্ভর করতে হলো না।

কিন্তু যন্ত্রশিল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তার বৈপ্লবিকতা। যন্ত্রশিল্পের প্রকরণগত ভিত্তি হলো সব সময় বিপ্লবাত্মক। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি বা প্রকরণকেই চরম বলে গণ্য করা হয় না। কারণ নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন পুরনো পদ্ধতিকে প্রায়ই উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। শিল্পকে নিয়ে চলেছে ক্রমোন্নতির অন্তহীন অনির্দেশ্য পথে।

মার্কস মনে করতেন আধুনিক যন্ত্রশিল্পের এই বিপ্লবাত্মক ভূমিকা মানুষের সমাজ জীবনেও ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য কারণ কোন সমাজই প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পৃথক থাকতে পারে না। আধুনিক সমাজজীবনের ভাবধারাও তাই পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার ছাঁচে স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে।

যন্ত্রশিল্পের এই বিপ্লবাত্মক ভূমিকা আধুনিক যুগের শ্রমিকশ্রেণীর মনেও এনে দিয়েছে বিপ্লবের ছোঁয়া। আজ পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত সর্বহারা শোষিত শ্রমিকশ্রেণীরাও ভাবতে শুরু করেছে পুরনো যন্ত্রের মত অতি-মুনাফাখোর অবাঞ্ছিত পুঁজি-পতিদেরও বিপ্লবের দ্বারা যে কোন সময়ে সরিয়ে দিতে পারে তারা উৎপাদন-ব্যবস্থার ক্ষেত্র থেকে। পুঁজিপতিদের হাত থেকে প্রথাগত মালিকানা, সামাজিক প্রভুত্ব ও উৎপাদনের সব উপাদান কেড়ে নিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে শিল্প সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

অনেকে বলেন, যন্ত্রযুগে শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রাধান্য শ্রমিকদের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। কিন্তু যন্ত্রযুগে কারিগরি দক্ষতার কোন দরকার না থাকলেও অন্য দিকে লাভও কম হয়নি। যন্ত্র আসার ফলে অভাবনীয়ভাবে বাড়ল শ্রমিকদের সংখ্যা, বাড়ল দ্রুত কাজ করার ক্ষমতা। দেহগত শ্রমের কাজ যন্ত্র অনেকখানি নিয়ে নেওয়ায় কল কারখানায় মেয়ে ও শিশুদের পক্ষেও কাজ পাওয়া সহজ হয়ে উঠল। উৎপাদনের খরচও অনেক কমে গেল।

তবে শিল্পে যন্ত্রপাতির প্রাধান্যের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো, শ্রমিকদের শ্রমের চাহিদা হারের হ্রাস। যে কাজ আগে শ্রমিকরা হাত দিয়ে করত, এখন তা যন্ত্রের দ্বারা হতে লাগল। মজুরির হারও কমে গেল। কাজের সময়ও বাড়তে লাগল। যন্ত্রের সঙ্গে তখন তাল মিলিয়ে চলতে বাধ্য হলো শ্রমিকরা। শ্রমিকদের মধ্যে বেকারি বাড়তে লাগল। তবে অবশ্য মূলধন ও পুঁজি বাড়িয়ে নতুন নতুন অনেক কল কারখানা করে বেকার শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হতে লাগল। এইভাবে পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্ক নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে উঠল দিনে দিনে। পুঁজিপতিদের মর্জি ও দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল শ্রমিকশ্রেণী।

এইভাবে দেখা যায়, পুঁজির আদিম সংগঠনকালে যে শ্রমিকশোষণ শুরু হয়েছিল তা চরম পরিণতি লাভ করল যন্ত্রযুগে। দেখা যায়, শুধু পুঁজিবাদই সর্বহারাদের শত্রু নয়, পুঁজিপতিদের দ্বারা যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারাই সর্বহারাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

কিন্তু এটা গেল শুধু অর্থনীতির কথা।

অর্থনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে আধুনিক যন্ত্রযুগের উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শক্তি ও গুরুত্ব অনেক কমেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দিকে তাদের ক্ষমতা অনেক বেড়েছে, একথাও অস্বীকার করা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে জেগেছে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীগত ঐক্যবোধ। উৎপাদন যুগে কারিগরদের

মধ্যে গুণগত ঈর্ষা ছিল। সুদক্ষ কারিগররা বেশী মাইনে পেত, তার ফলে সাধারণ কারিগররা ঈর্ষা করত তাদের। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে একতার কথা ভাবতেই পারত না। শ্রেণী হিসাবে তাদের যে গুরুত্ব আছে একথাও তারা ভাবতে পারত না। ভাবতে পারত না পুঁজির থেকে শ্রমের গুরুত্ব উৎপাদনের ক্ষেত্রে কম ত নয়ই, বরং অনেক বেশী এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় অঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকশ্রেণী। ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করলে পুঁজিপতিদের হাত থেকে উৎপাদন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে যে কোন সময়ে।

এই সব অনেক কথাই এখনকার যন্ত্রযুগের শ্রমিরা ভাবতে শিখল। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার কাঠামোটা এমন ভাবেই তৈরি যে, তাতে শ্রমিকরা সর্বহারা ও বিপ্লবী হয়ে উঠতে বাধ্য। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের মূল্যবোধও পরিবর্তিত হতে বাধ্য। পুঁজিবাদী সমাজে শোষণ-নীতি যেখানে যেখানে চরমে উঠেছে, পুরনো সমাজব্যবস্থার প্রতি তাদের আকর্ষণ উবে গেছে; তাদের সমস্ত রক্ষণশীল মনোভাব দূর হয়ে গেছে। ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে তাদের পুরনো মূল্যবোধ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একেবারে। মনুষ্যত্ব, স্থায় ও নীতি সম্পর্কে তাদের ধারণাও আমূল পাল্টে গেছে।

আধুনিক যন্ত্রশিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো শ্রমিকদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের সৃষ্টি। দীর্ঘ দিনের শোষণ, নিপীড়ণ ও নৈরাশ্যের ফলে সর্বহারা শ্রমিকরা আজ কাজ বা কাজের ফল থেকে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষ ও এমন কি নিজেদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যে কাজের ফল তারা পাচ্ছে না সে কাজ করে কি হবে? এই নিদারুণ অভাব আর দারিদ্র্য কতদিন চলবে? যে ঈশ্বর তাদের এই শোষণ ও দারিদ্র্য থেকে বাঁচাতে পারে না সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেই বা কি হবে—এই ধরণের এক ব্যাপক শূন্যতাবোধ আজ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে শ্রমিকদের সমগ্র মনোভূমিকে। ঈশ্বরে তাদের বিশ্বাস নেই, প্রকৃতির সঙ্গেও কোন আন্তরিক যোগাযোগ নেই।

কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা বা বিযুক্তি একদিক দিয়ে ভালই করেছে শ্রমিকদের। শ্রমিকরা সব কিছু থেকে বিযুক্ত হয়ে নিজেদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বুঝতে শিখেছে অনেক কথা, যে কথা উৎপাদন যুগের কারিগররা বুঝতে পারেনি। তারা বুঝতে পেরেছে তাদের দুরবস্থার জন্য তাদের ভাগ্য বা ভগবান দায়ী নয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার ত্রুটিই তার জন্য একমাত্র দায়ী। আজ তারা এও বুঝতে পেরেছে যে শ্রেণীগত ঐক্যবোধ ও আপোষহীন সংগ্রামের দ্বারা এই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব। এই নবজাগ্রত ক্রমবর্ধমান শ্রেণীচেতনার ফলে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে শুধু তারা আগ্রহীই হয়নি, তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও সামাজিক ক্ষমতা লাভও করেছে।

এইজন্য মার্কস ও এঙ্গেলস সাম্যবাদী ইস্তাহারে বলেছেন, 'সর্বহারাদের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার আর কিছুই নেই। কিন্তু তারা জয় করতে পারবে সমগ্র পৃথিবী।' সামাজিক কর্মে তারা বিশ্বানুগ হয়ে উঠেছে। বিশ্বের শ্রমিকদের সঙ্গে আজ তারা একাত্মতা বোধ করছে।

যাই হোক, মার্কসের এই বক্তব্য যে শুধু কথার কথা নয় তা প্রমাণিত হলো ১৯১৭ সালে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব মার্কসের এই বক্তব্যের সত্যতাকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করল সন্দেহাতীত ভাবে।

রাশিয়ায় তখন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যন্ত্রশিল্প। পুঁজিবাদ তখন গড়ে উঠেছে সবেমাত্র। পুঁজিবাদের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হয়েছে সর্বহারা শ্রমিকসমাজের আর মার্কসের কথামত দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়েছে এক সর্বাত্মক বিপ্লবে। মার্কসের কথা ও ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হলো। সর্বহারা বিপ্লবী শ্রমিক-শ্রেণী মার্কসীয় পদ্ধতিতেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায়

এ বিপ্লব হয়নি কেন। শোষণগত যে ক্ষোভ বিপ্লবে ফেটে পড়েছে রুশ সর্বহারাদের মধ্যে, কেন তা বিপ্লবী করে তুলতে পারেনি উত্তর আমেরিকা বা পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকদের? এতে কি মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিকতা খণ্ডিত হয় না? পশ্চিম ইউরোপের ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদ যন্ত্রশিল্পের প্রথম যুগ পেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই, তবু সেখানে কোন বিপ্লব হলো না। উল্টো নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক মনোভাবকে দিনে দিনে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। তাহলে কি পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার ব্যাপারে মার্কসীয় নীতি ও পদ্ধতির অসহায়তাই প্রমাণিত হয় না?

কিন্তু এর উত্তরে বলা যায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা শিল্পোন্নত শোষণকারী দেশগুলির যেমন ঐশ্বর্য বাড়ায়, তেমনি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করে। কিন্তু পুঁজিবাদ ত শুধু একটি দেশের মধ্যেই আটকে থাকে না এবং দুই একটি শিল্পোন্নত দেশের দিকে তাকিয়েই পুজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বোঝা যাবে না। পুঁজিবাদের একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে। এর থেকে বোঝা যায় অনেক সাম্রাজ্যবাদী দেশ অনেক ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে শোষণ করে শিল্পে উন্নত হয়ে উঠেছে। একদিন ভারতের কাঁচামাল লুণ্ঠন করেই গ্রেট ব্রিটেন শিল্পোন্নত হয়েছিল। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে একদিন পৃথিবীর এক ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিল্পের দেশ আর অন্য ভাগগুলি তার চাহিদা মেটানো অর্থাৎ কাঁচা মাল সরবরাহ করার জন্য রয়ে গিয়েছিল অনগ্রসর কৃষির দেশ।

আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশগুলির শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেও অনগ্রসর অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশগুলির অগণিত কৃষি ও শিল্প শ্রমিকদের আজ সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভিয়েতনাম, চীন, কিউবা প্রভৃতি কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব সার্থক হয়েছে। এই সব দেশের বিপ্লবী জনসাধারণ মার্কসীয় পদ্ধতিতেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করেছে।

তাছাড়া পুঁজিবাদ যতদিন থাকবে, পুঁজিবাদ যত উন্নত হবে, শোষণ থাকবেই। সর্বহারাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাও ততদিন থাকবেই।

১৯১৭ সালে লেনিনের একখানি বই প্রকাশিত হয়। এইটির নাম Imperialism: the Highest state of Capitalism. এই এই বইটিতে লেনিন বলেছেন, স্বল্পসংখ্যক শিল্পোন্নত দেশের হাতে পৃথিবীর বৃহৎ জনসমাজ ঔপনিবেশিক ও অর্থনৈতিক চাপে আজ ক্লিষ্ট এবং তা থেকেই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের জন্ম। আপাদমস্তক অস্ত্র দিয়ে ঢেকে পুঁজিবাদী দস্যুরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য ভোগ করছে।

লেনিন আরও বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিবাদীরা এই লুঠের মালের কিছু অংশ কিছু শ্রমিককে ঘুষ হিসাবে দিয়ে তাদের স্বচ্ছল শ্রমিক বানিয়ে তুলেছে।

এই যুক্তি দিয়েই দেখানো যায় শিল্পোন্নত দেশের পুঁজিপতিরা এই ভাবে প্রায় সব শ্রমিকদেরই তথাকথিত স্বচ্ছলতা দিয়ে তাদের স্তব্ধ করে রেখেছে। তাদের বৈপ্লবিক উদ্যমকে ভেতো করে রেখেছে।

পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ার অনগ্রসর দেশগুলির কৃষিজাত কাঁচা মাল কম দরে নিয়ে তাদের অসংখ্য কৃষি ও শিল্প শ্রমিককে দারিদ্র্য ও দুর্দশার কবলে ফেলে নিজেদের শিল্পোন্নত করেছে। অনগ্রসর দেশগুলি আজ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হলেও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়নি আজও।

মার্কস তাই বলেছেন, গত শতাব্দীর মধ্যভাগের সর্বহারারা যেমন বিপ্লবাত্মক ছিল, আজকের এই সর্বহারারাও তেমনি বিপ্লবাত্মক।

পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্কস যে ভাষ্য রচনা করেছেন তার থেকে বোঝা

যায়, সর্বহারারা সব সময় বিপ্লবী নাও হতে পারে। যেমন রক্ষণশীল উৎপাদনের যুগে তারা বিপ্লবী ছিল না ; কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর যন্ত্র ও প্রযুক্তবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের ফলে তারা বিপ্লবী হয়ে ওঠে।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সর্বহারাদের বিপ্লবের সম্ভাবনা কম, একথা মেনে নিলেও পুঁজিবাদ তার সমাধি রচনাকারী বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীর জন্ম দেয়, মার্কসের একথা ভুল মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ পুঁজিবাদকে কখনও দুই একটি দেশের মধ্যে আলাদা ভাবে বিচার করলে হবে না, তাকে বিচার করতে হবে তার আন্তর্জাতিক চরিত্রের মাধ্যমে।

পুঁজিবাদ দুভাগে বিভক্ত। শোষণকারী দেশগুলির পুঁজিবাদ আর শোষিত দেশগুলির পুঁজিবাদ। শোষিত দেশগুলি পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় পরমুখাপেক্ষী থাকতে বাধ্য হয় এবং তারাই সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ এবং আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর ইতিহাসই একথা প্রমাণিত করেছে। দেখিয়ে দিয়েছে বিপ্লবী সর্বহারারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়ে উৎপাদনক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারে।

চৌদ্দ

আজকের মানুষ আমরা সকলেই প্রায় খণ্ড জীবন যাপন করছি। কেমন যেন সংকীর্ণ হয়ে পড়েছি আমরা সবাই। আত্মা ঈশ্বর প্রকৃতি ও সমাজসম্পর্ক হতে বিচ্যুত হয়ে মানুষ তার চারদিকে আমিত্বের গণ্ডী দিয়ে ঘিরে রেখেছে। যে অখণ্ড জীবনচেতনা বা সমগ্রতা মানুষের সর্বাঙ্গীন প্রকাশধর্মিতার মূল কথা, যা সব ধর্মের ভিত্তিভূমি, যে কোন শিল্পরসের প্রাণবস্তু, প্রেম ও সৌন্দর্য উপলব্ধির

প্রধানতম শর্ত, সে জীবনচেতনার পরম আশ্বাস·আজকের মানুষ কোন কিছুতেই পাচ্ছে না।

মার্কস এর নাম দিয়েছেন 'এ্যালিয়েনেশন' বা বিচ্ছিন্নতা। তিনি বলেছেন মুনাফালোলুপ সম্পত্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিগত মালিকানা-ভিত্তিক সমাজই মানুষের মধ্যে এই ব্যাপক বিচ্ছিন্নতা ও আত্মচ্যুতির একমাত্র কারণ। 'আমার বিষয়সম্পত্তি, আমার টাকাকড়ি, আমার জিনিষ আমি কাউকে দেব না'—এই ধরণের একটা স্বার্থসর্বস্ব অহং ভাব মানুষকে আজ খণ্ড করে রেখেছে বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে।

আজকের সমাজে পুঁজিই আসল রাজা। আজকের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ পুঁজি মহারাজের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। শোষণের শিকলে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা! আজকের পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিটি মানুষ যে অসুন্দর অস্বস্তিকর জীবন যাপন করছে মার্কস তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

'Private property has made us so stupid and onesided that an object is only ours when we have it, when it exists for us as Capital or when we possess it directly, eat it, drink it, wear it out on our body, live in it, in short use it.···For all the physical and spiritual senses, therefore, the sense of having····has been substituated.

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা আমাদের এমন সংকীর্ণ ও একদেশ-দর্শী করে তুলেছে যে যখন কোন বস্তু আমরা পুঁজি হিসাবে অথবা সরাসরি খাওয়া পরার জন্য ব্যবহার করি তখন আমরা সে বস্তুকে পুরোপুরিভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে যেতে চাই। তখন ওই বস্তুর উদয় এবং প্রভুত্বের স্পৃহা এমনভাবে আমাদের প্রাণকে আচ্ছন্ন করে থাকে যে আমরা আর কোন কথা ভাবতেই পারি না। তখন ব্যক্তিগত সেই বস্তুচিন্তা ছেড়ে জগৎ ও জীবনে প্রয়োজনাতীত কোন সত্যকে স্বীকার করতে পারি না আমরা।

এইভাবে সম্পত্তিকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সমাজে মানুষ মনুষ্যত্ব-বোধ ও সৌন্দর্যবোধ হারিয়ে ফেলে। অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু ছাড়াও প্রকৃতি জগতের মধ্যে যে অনেক সুন্দর জিনিষ আছে যাদের সঙ্গে আমরা আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, সেকথা মানুষ ভুলে যায়। আবার সমাজে সব মানুষই যে সমান এবং সমাজের সব মানুষের সঙ্গে স্বার্থলেশহীন এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব একথাও মানুষ ভাবতে পারে না। কারণ শুধু ব্যক্তিগত মালিকানা, অধিকারবোধ আর মুনাফালোভ তার মনকে সব সময় গ্রাস করে থাকে। অন্য সব মানুষকেও সে প্রয়োজন মেটাবার যন্ত্র হিসাবে দেখে।

মানুষের ইতিহাস ঘেঁটে মার্কস দেখিয়েছেন, মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, এই বস্তুসর্বস্বতা ও আত্মচ্যুতি আগেকার সব সমাজেই ছিল। কী দাস সমাজে, কী সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, কী পুঁজিবাদী সমাজে সর্বত্রই শোষক ও শোষিত সব মানুষই মনুষ্যত্ববোধ আত্মীয়তাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। যেদিন থেকে মানুষের সমাজে সম্পত্তির উপর সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম হয়েছে সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে এই এ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতা।

১৮৪৪ সালে তাঁর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপিতে সম্পত্তি-কেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সমাজের স্ববিরোধিতাটিকে চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন মার্কস। এই ধরণের সমাজে পণ্য উৎপাদন করতে করতে শ্রমিকরাও মনুষ্যত্ব হারিয়ে পণ্যে পরিণত হয়। তারা যত বেশী পণ্য বা বৈষয়িক সম্পদ সৃষ্টি করে, তারা নিজেরা তত নিঃস্ব হয়। ততই বেড়ে যায় তাদের জীবন ধারণের কষ্ট।

আবার পুঁজিপতিরাও এমন সুখে থাকে না এ ধরণের সমাজে। পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে তাদেরও প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। প্রতিযোগিতা অনেক সময় আনে তাদের মানসিক অশান্তি আর ধ্বংস।

কিন্তু পুঁজিপতিদের থেকে শ্রমিকদের বিপদই বেশী এ ধরণের সমাজে। কারণ যেখানে সম্পদ অর্থাৎ কৃষিজ ও শিল্পজ উৎপাদন যতই বাড়তে থাকে ততই শ্রমিকরা গরীব হতে থাকে। মার্কস তাই বলেছেন,

'The more riches the worker produces, the more his production increases in power and scope, the poorer he becomes···The more the worker produces, the less value—the less dignity—he himself has.'

শ্রমিকরা যতই পণ্য উৎপন্ন করে, যতই তারা সম্পদ বাড়ায় ততই তারা নিজেরা গরীব হতে থাকে। পণ্য যতই বাড়াতে থাকে ততই পণ্যের দাম কমতে থাকে। শ্রমজীবিরা যত বেশী মূল্য সৃষ্টি করতে থাকে, ততই কমতে থাকে তাদের মূল্য। যে পরিমাণ তারা উৎপাদন বাড়ায় সেই পরিমাণে তাদের উপভোগও কমে যায়। ঠিক এই জন্যই তাদের শ্রম থেকে শ্রমের ফল থেকে মনের দিক দিয়ে বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে শ্রমজীবিরা।

এইভাবে সমাজে পার্থিব সম্পদ যত বাড়তে থাকে শ্রমিকদের সামাজিক মর্য্যাদাও তত কমতে থাকে। শ্রমিকদের কাজের যত গুণগত উন্নতি ঘটতে থাকে, তাদের জীবনযাত্রার মান ততই কমতে থাকে, তাদের উৎপন্ন জিনিষ যত মার্জ্জিত ও সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে তারা নিজেরা তত অসুন্দর হয়ে উঠতে থাকে। নিজেদের বঞ্চিত করে নিঃস্ব করে তাদের শ্রমের সব ফসল নিঃশেষে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেয় শ্রমিকরা।

এই এ্যালিয়েনেশন বা বিযুক্তির আবার প্রকারভেদ আছে। যন্ত্র-শিল্পনির্ভর সমাজের মধ্যে চার রকমের এ্যালিয়েনেশন দেখেছেন মার্কস। প্রথমতঃ কর্ম বা কর্মপদ্ধতিগত বিযুক্তি। অর্থাৎ শোষিত হতে হতে শ্রমিকদের কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে। যন্ত্রগুলোকে মনে

হয় এক একটা দানব। সমস্ত কল কারখানার কাজগুলোকে তাদের মনে হয় তাদের রক্ত শোষণ করার এক একটা ফিকির।

তারপর হচ্ছে উৎপন্ন বস্তু হতে বিযুক্তি। অর্থাৎ শ্রমিকরা যখন দেখে উৎপাদন এত বাড়া সত্ত্বেও তাদের অভাব মিটছে না, জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ তারা পাচ্ছে না তখন তাদেরই দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর প্রতিও বিরক্তি আসে।

এরপর হচ্ছে আত্মগত বিযুক্তি। ক্রমাগত অভাব অনটনের দ্বারা নিষ্পেষিত হতে হতে নিজের জীবনের প্রতিই বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে শ্রমিক। বাঁচার আনন্দের কোন আস্বাদ না পেয়ে পেয়ে জীবনের কোন মানেই খুঁজে পায় না।

আর একরকম বিযুক্তির কথা বলেছেন মার্কস যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিযুক্তি হচ্ছে মানবিক ও সামাজিক সম্পর্ক হতে বিযুক্তি। শ্রমিকরা জীবনে স্বাধীনভাবে কাজ করতে বা ভাবতে পারে না। তারা শুধু খাওয়া পরা, বংশবৃদ্ধি করা প্রভৃতি দৈনিক কাজগুলিই স্বাধীনভাবে করে যেতে পারে, যে সব কাজগুলি পশুরাও স্বাধীনভাবে করে চলে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরাধীনতার জন্য শ্রমিকরা স্বাধীনভাবে পেশা বা নির্বাচন বা আনন্দদায়ক কাজকর্ম ইচ্ছামত করতে পারে না। সংকীর্ণ বিষয়বুদ্ধি, ক্ষমতালিপ্সা, লোভ, নানাধরনের শোষণের চাপে পড়ে শ্রমিকদের আত্মচ্যুত জীবনসত্তা মানবিক জীবনকর্মের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে পারেনি। বিকাশ সাধন করতে পারেনি তার বিশ্বানুগ ব্যক্তিত্বের।

কিন্তু মার্কস এই এ্যালিয়েনেশন বা বিযুক্তিকে শুধু শ্রমিক সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখেননি। তাঁর মতে এই বিযুক্তি প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় থাকলেও আজকের পুঁজিবাদী সমাজেই সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে এই বিযুক্তি এবং পুঁজিবাদীরাও এর আওতার মধ্যে পড়ে। তবে পার্থক্য এই যে শ্রমিকরা এই বিযুক্তি সম্পর্কে সচেতন এবং বিযুক্তির ফলে তারা বেশী কষ্ট পায়। কিন্তু পুঁজিবাদীরা এই বিযুক্তির জন্য কোন

অসুবিধা বা দুঃখ কষ্ট ভোগ করে না বলে এটাকে সহজভাবে মেনে নেয়। এটাকে মানবিক অস্তিত্বের এক অঙ্গ হিসাবে দেখে। সামাজিক সম্পর্ক থেকে তারাও বিচ্যুত। কিন্তু তারা মনে করে এটাই তাদের পক্ষে লাভজনক।

তারা ভাবে বিষয়চিন্তা ছেড়ে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে তাদের ক্ষতি হবে, পয়সা খরচ হবে। এইজন্যই তারা নিজেদের অন্যান্য সমাজ সম্পর্ক ও মানবিক সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন করে গুটিয়ে রাখে নিজেদের মধ্যে।

মার্কস তাঁর জার্মান ইডিওলজিতে বলেছেন, এই এ্যালিয়েনেশন বা বিযুক্তির উৎস হলো শ্রমবিভাগ। শ্রমবিভাগ শুধু বিযুক্তির নয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও উৎসস্থল। কেউ চাষবাস করবে, কেউ হাতের কাজ করে জীবনধারণ করবে—কৃষির আবির্ভাবের পরে প্রাচীন সমাজের এই বিধান থেকেই সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্কসের আগে যাঁরা অলীক সমাজবাদ বা স্থূল সাম্যবাদের কথা বলেছেন তাঁরা কিন্তু এই এ্যালিয়েনেশন বা বিযুক্তির বিষয় চিন্তা করতে পারেননি। তাঁরা শুধু ভেবেছেন একটি কথা। ভেবেছেন সমাজের সব সম্পত্তির উপর থেকে ব্যক্তিগত মালিকানাকে সরিয়ে দিয়ে সামাজিক মালিকানাকে কায়েম করতে পারলেই সর্বহারা মানুষের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে, অর্থনীতির সব স্ববিরোধিতা ঘুচে যাবে।

একমাত্র মার্কসই বলেছেন, শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে দূর করলে হবে না। মানুষের এই বিযুক্তিবোধেরও অবসান ঘটাতে হবে। মার্কস তাঁর 'পাণ্ডুলিপিতে' বলেছেন, স্থূল সাম্যবাদ সম্পত্তির ওপর সর্বহারা মানুষের সামাজিক মালিকানাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছে। কিন্তু এটাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে শ্রমিকরা কোনদিন সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না, তারা কোনদিন

বিষয় চিন্তার ঊর্ধ্বে কিছু ভাবতে পারবে না, তাহলে সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে অস্বীকার করা হবে শোচনীয়ভাবে।

মার্কস তাই বলেছেন, প্রকৃত সাম্যবাদী সমাজে মানুষের বিযুক্তি বা আত্মচ্যুতির পূর্ণ অবসান ঘটবে। মানুষ প্রতিষ্ঠিত হবে অখণ্ড মনুষ্যত্ববোধ ও প্রকৃত মানবধর্মে। ব্যক্তিগত মালিকানা শোষণ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আত্মচ্যুতির অবসান ঘটলে মানুষ বুঝতে পারবে বাইরের জগতের সঙ্গে তার কোন শত্রুতা নেই। তখন সে তার জ্ঞান কর্ম ও অনুভবশক্তি ও সৃষ্টিশক্তির দ্বারা বাইরের জগতের প্রকৃতি ও মানুষকে আপনার করে নিতে পারবে। তার থেকে অনেক পরিমাণে বাঁচার আনন্দ পাবে। মার্কস তাই বলেছেন,

'This Communism is····the genuine resolution of the conflict between man and Nature and between man and man—the true resolution of the strife between existence and true being.'

সম্পত্তিকেন্দ্রিক সমাজে মানুষ সব সময় খণ্ড চেতনায় অপূর্ণ। এই সমাজের খণ্ডিত মানুষ তার যে সমাজসত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে প্রকৃত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে তার সমাজসত্তা ফিরে পাবে। প্রকৃতি ও বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে মনেপ্রাণে যুক্ত হয়ে সে তার শ্রমকে ভালবেসে আরও সার্থক করে তুলবে। বিশ্বজনীন পূর্ণতার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে সার্থক করে তুলবে তার মানবধর্মকে।

মার্কস তখন অর্থনীতির গবেষণায় ডুবে থাকলেও তার বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে শ্রমিক জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দুটি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। একই সঙ্গে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ আর স্বপ্নচারী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বকপোলকল্পিত অলীক সমাজতন্ত্রবাদ বা স্থূল সাম্যবাদের বিরুদ্ধে।

ব্রুনো বয়ার ও তাঁর সহগামীরা প্রায়ই সমাজবিপ্লবের কাজে শ্রমিক জনসাধারণের ভূমিকাকে ছোট করে দেখতেন। তাঁরা বলে বেড়াতে

লাগলেন, অতীতে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে তার প্রধান কারণ জনতার আত্মপ্রতারণা। অর্থাৎ অজ্ঞ অনভিজ্ঞ জনগণ না বুঝেই সেই সব আন্দোলন সমর্থন করেছিল, না বুঝেই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথবা আন্দোলনগুলোর মূল আদর্শ ভাসা-ভাসা করে বুঝেই তাতে যোগ দিয়েছিল।

এইভাবে ব্রুনো বয়ারের দল বুদ্ধিজীবীদের থেকে জনতাকে আলাদা করে দেখতেন। তাঁরা মনে করতেন জনতা সব সময়ই নির্বোধ, কোন বুদ্ধিগত উপলব্ধি সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। আবার প্রুধঁ, ভিটলিং প্রভৃতি স্বপ্নচারী সাম্যবাদীরা বিপ্লবই চাইতেন না। তাঁরা ছিলেন মার্কসের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সবচেয়ে বড় শত্রু। তাঁদের বক্তব্য হলো এই যে সমাজে সর্বহারা ও সর্বস্ব অপহারক, শোষক ও শোষিতদের মধ্যে কোন শত্রুতার ভাব রাখলে চলবে না। শত্রুতার পরিবর্তে এক বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তাঁরা বলতেন, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক শান্তির জন্য চাই শ্রেণী-সহযোগীতা, শ্রেণীসংগ্রাম নয়।

কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের সব মতকে খণ্ডন করে সম্পূর্ণ, এক ভিন্ন কথা বললেন। তাঁরা শুধু শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজবিপ্লবের কথাই বললেন না, সর্বহারা শ্রমিক জনতাই যে এ বিপ্লব আনবে এবং এ বিপ্লবকে সার্থক করে তুলবে সেকথাও জোর দিয়ে বললেন।

মার্কস বললেন, বিপ্লব ছাড়া সর্বহারাদের মুক্তির কোন পথ নেই। তার কারণ যে পুঁজিবাদী সমাজে যে অমানুষিক শোষণরীতি ও বিধিব্যবস্থা তাদের নিঃস্ব করে তুলেছে, সেই সব রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থা আর তাদের পারিপার্শ্বিক ও আনুসঙ্গিক অবস্থাগুলোকে ধ্বংস করতে না পারলে সর্বহারাদের মুক্তি কখনই সম্ভব নয়। সর্বহারারাই সমাজে শোষণের কেন্দ্রবিন্দু তারাই সবচেয়ে রিক্ত নিজস্ব। রিক্ততা ও বঞ্চনার ক্ষোভ তাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী। অথচ সংখ্যায় তারা অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশী।

সব সমাজে। সুতরাং পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যদি একবার ফেটে পড়ে তাদের মধ্যে তাহলে বিপ্লব অনিবার্য। আর যেহেতু এ ক্ষোভ একদিন না একদিন ফেটে পড়বেই, বিপ্লবকে কেউ রুখতে পারবে না। প্রুঁধ ও ভিটলিং এর মত বুদ্ধিজীবী দার্শনিকদের নীতিশিক্ষার কচকচিতে কখনই কান দেবে না বুভুক্ষু জনতা। তাদের সহ্যের সীমা একদিন না একদিন ফুরিয়ে যাবেই।

১৮৪৮ সাল থেকেই ইউরোপের শ্রমিকরা সংক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আসছিল। শুধু তাই নয়, শ্রমিকরাই ছিল বিপ্লবের চালিকা শক্তি। কিন্তু তখন রাজতন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীকে। জয়ের ফসলটা কিন্তু ভোগ করেছিল বুর্জোয়াশ্রেণী একা। কুচক্রী বুর্জোয়া শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর মাথার উপর কাঁঠাল ভেঙ্গে গদি দখল করল। আর ক্ষমতা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজমূর্তি ধারণ করল তারা। শ্রমিকদের আক্রমণ করল নির্লজ্জ ও জঘন্যভাবে। তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে তাদের পরাস্ত করল।

কিন্তু বিপ্লবের প্রতি এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করার সমুচিত ফলও পেতে হয়েছিল বুর্জোয়া শ্রেণীকে। তারা তাদের শাসনকর্তৃত্ব বেশীদিন রাখতে পারেনি।

এর পর পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা গলা বাজিয়ে প্রচার করতে লাগল। তাদের কথা শুনে মনে হলো যেন এই সব গণতন্ত্রের মাধ্যমেই জনগণের সব সমস্যা হয়ে যাবে।

কিন্তু মার্কস বললেন, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র অত্যন্ত ফাঁকা জিনিষ। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কোনটাই সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় সোনার পাথরবাটি অথবা পাথরের সোনারবাটি। গণতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার বুর্জোয়া শ্রেণীই সবচেয়ে বেশী করে থাকে সব দেশে।

তাছাড়া পার্লামেণ্টারি সিসটেম বা সংসদীয় ব্যবস্থা একটা বাতুলতা মাত্র। যারা পার্লামেণ্টে গলাবাজি করে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে ইতিহাসের গতি পাল্টাবার কথা ভাবে, আদর্শ রাষ্ট্রস্থাপনের স্বপ্ন দেখে তারা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ব্যবস্থা একেবারে জনস্বার্থ বিরোধী, কারণ এই ব্যবস্থায় বুর্জোয়া আর পেটি বুর্জোয়ারাই লাভবান হয়।

যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা বিপ্লব রাষ্ট্রযন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে শুধু শাসন ব্যবস্থাকে পাল্টাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পুরনো প্রতি-ক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্র বুর্জোয়াদের শাসন শোষণের পথকে সুগম করে দেয়। তাই প্রোলেতারীয় বিপ্লবে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলে নতুন শ্রেণীহীন শোষণহীন আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করা। শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণী জয়ী হলে সমাজে একই সঙ্গে শোষণ ও অন্যান্য শ্রেণীর অবসান ঘটবে।

কিন্তু তার জন্য চাই কৃষক শ্রমিক ঐক্য-মৈত্রী। শ্রমিকদের বন্ধু হিসাবে কৃষকদের বিপ্লবের পথে টেনে আনতে হবে। মনে রাখতে হবে একমাত্র কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীই সফল করে তুলতে পারে বিপ্লবকে। লুই বোনাপার্টি কৃষকদের সাহায্যেই বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিয়ে স্বৈরাচারী শাসক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

১৮৫১-৫২ সালে জার্মানীতে যে সব বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের ঘটনা ঘটেছিল তার উপর একখানি বইয়ে আলোচনা করেন মার্কস। বস্তু-বাদী বিশ্লেষনের মাধ্যমে বিপ্লবের ব্যর্থতার কথাটি পরিষ্কার করে তুলে ধরেন। প্রথমে দেখা যায় জার্মানীর শ্রমিক কৃষক পেটি বুর্জোয়া, বুর্জোয়া সকল শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রুশিয়ার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে। প্রথম দিকে বিপ্লব ভালই চলতে থাকে। কিছুদিন পর বিশ্বাস-ঘাতক বুর্জোয়া শ্রেণী কিছু সংখ্যক পেটি বুর্জোয়াদের নিয়ে শত্রুপক্ষে যোগদান করে। কৃষকরা বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। শ্রমিক

শ্রেণী একা লড়াই করে যায়। শেষ পর্যন্ত লড়াই করে গিয়ে পরাজিত হয়।

জার্মানীর কৃষক যুদ্ধের উপর লেখা একখানি বইয়ে এঙ্গেলসও বলেন, কৃষকদের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উপরেই নির্ভর করছে জার্মানীর শ্রেণী সংগ্রামের সার্থকতা।

১৮৫৪-৫৬ সালের স্পেনের বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন মার্কস ও এঙ্গেলস 'স্পেনের বিদ্রোহ' বইখানিতে তাঁরা দেখান, স্পেনের সামন্তদের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সেখানে প্রথমে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরে শ্রমিক শ্রেণী এই বিপ্লবে যোগদান করে। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে মিলে বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এইভাবে বিভিন্ন দেশের বহু ঐতিহাসিক বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ বস্তুবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কস দেখিয়েছেন, কারা প্রকৃত বিপ্লবী এবং কারা বিপ্লবের শত্রু; কারা প্রথমে বিপ্লবে যোগ দিয়ে কপট সমর্থন ও সহযোগিতা দান করে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে বিপ্লবের প্রতি। তিনি দেখিয়েছেন সর্বাহারা শ্রেণীর প্রকৃত মিত্র কে। এই সব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্কস সর্বহারাদের ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন।

রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আমেরিকায় দাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে অভিনন্দন জানান মার্কস। এই দুটিই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাজনৈতিক সংগঠনের আদর্শ নমুনা হিসাবে প্যারিস কমিউনকেও অভিনন্দন জানালেন মার্কস। শ্রমিকশ্রেণী কোন রাষ্ট্র দখল করে ব্যবহার করবে না। তারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলে তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবে নিজেদের শক্তিকে।

প্যারিস কমিউনের আগেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি বা প্রথম আন্তর্জাতিক সমিতি অতিকষ্টে গড়ে তোলেন মার্কস।

১৮৫২ সালে কমিউনিষ্ট লীগ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। তবু অর্থনৈতিক গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের কাছে বিপ্লবের আদর্শ প্রচারের কাজ এঙ্গেলস-এর সাহায্যে ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন মার্কস। কিন্তু তাই বলে বিপ্লব সম্পর্কে কোনরকম হঠকরিতা তিনি পছন্দ করতেন না।

প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠার ঠিক কিছু আগে প্যারিসের শ্রমিকরা যখন অস্থির হয়ে ওঠে বিপ্লবের জন্য মার্কস তখন আন্তর্জাতিকের সভায় উপযুক্ত পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে বলেন তাদের। হঠকারিতার বিরুদ্ধে সাবধান করে দেন। কিন্তু মার্কস লণ্ডনে পৌঁছে যখন শুনলেন প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করলেন। শুধু নিজেই সমর্থন করলেন না, কমিউনকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠালেন দেশে দেশে।

বহুদিন পর ১৯০৫ সালে লেনিন বলেছিলেন, বর্তমান আন্দোলনে আমরা সবাই কমিউনের কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছি।

তবু মার্কসের বিপ্লবী আদর্শের অনেকেই বিরোধিতা করতে লাগলেন বিভিন্ন দেশে। ফ্রান্সের প্রুঁধপন্থীরা, ইংলণ্ডের ওইনপন্থী সুবিধাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ও জার্মানীর ল্যাসালের ইটালির মাৎসিনি অনুসরণকারীরা মার্কস ও এঙ্গেলসের আদর্শের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে যেতে লাগলেন। রাশিয়ার বাকুনিনপন্থীরাও মার্কসের বিরোধিতা করছিলেন। কিন্তু যারা স্বপ্নচারী, যারা আপোষকামী, যারা অদূরদর্শী এবং যারা সুবিধাবাদী তাদের কথা কেউ শোনে না। কেউ মনে রাখে না তাদের কথা। তাদের কথা হাওয়ায় ভাসমান শব্দের মত মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। জলের রেখার মত মুছে যায়।

যুগে যুগে অবশ্য বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের ধারণা কিছু কিছু বদলে যায়। কিন্তু বিপ্লব সম্পর্কে মার্কসের মূল আদর্শের সত্যতা বা কার্যকারিতা আজও খণ্ডিত হয়নি।

মার্কসের পর লেনিন বিপ্লবের আদর্শকে পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন

করে রূপদান করেন। মার্কসের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি আরও শক্ত ও পাকা হয়ে ওঠে। তাই অনেকে লেনিনবাদকে বলেন সাম্রাজ্যবাদ যুগের মার্কসবাদ।

মার্কস বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে বুর্জোয়া বিপ্লবের কাজকে সম্পূর্ণ করতে হবে।

১৮৪৮-৫০ সালের বৈপ্লবিক সংগ্রামের যুগে মার্কস শিক্ষা দিলেন, বুর্জোয়া বিপ্লবের কাজ শেষ করে শ্রমিকশ্রেণী সোজা চলে যাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে। বুর্জোয়াদের নতুন করে শক্তি সংহত বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চালিয়ে নিয়ে যাবার আর কোন সুযোগ দেবে না। অর্থাৎ মার্কস বলেছিলেন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন দেশে গণ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর লোকেরা একই সঙ্গে মিলে মিশে লড়াই করে যাবে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে যাবে। বিপ্লব সফল হলেই বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে। কারণ শ্রমিকশ্রেণী অত তাড়াহুড়ো করে ক্ষমতা দখল করায় প্রস্তুত থাকবে না কিন্তু সুবিধাবাদী বুর্জোয়ারা সব সময়ই ক্ষমতা দখলের জন্য তৈরি থাকবে। এই স্বার্থকে লক্ষ্য করেই তারা আন্দোলনে নামবে।

কিন্তু বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে শ্রমিকরা চুপ করে বসে থাকবে না। তারাও সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলবে নিজেদের শ্রেণী সংগঠন। তারা গড়ে তুলবে এমন এক বলিষ্ঠ পার্টি যা নিজেদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে লড়াই চালিয়ে যাবে। লড়াই চালিয়ে যাবে ততদিন যতদিন না তারা সম্পূর্ণ ক্ষমতা দখল করতে না পারে। সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

লেনিনের বিপ্লববাদেরও এই ছিল লক্ষ্য। মার্কসের এই শিক্ষা ও লক্ষ্যকে সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমকালীন ঐতিহাসিক অবস্থার পট-ভূমিকায় সফল করে তোলেন লেনিন। ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবের সময়

রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে লেনিন বললেন, প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব শ্রমিকদের হাতেই থাকবে। আর বুর্জোয়াদের পরিবর্তে শ্রমিকরা তাদের মেহনতী বন্ধু কৃষকদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলবে এই বিপ্লবে। রাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা যোগ দিলেও সংগ্রাম সফল হলে তাদের কোন মতেই শাসন ক্ষমতায় বসতে দেয়া হবে না। সংযুক্ত শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীই ক্ষমতা হাতে নেবে। এই ক্ষমতার নাম দিলেন লেনিন, শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের একনায়কত্ব।

লেনিন আরও বললেন, শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে এইভাবে যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চেয়ে ভাল। অনেক উন্নত।

১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবে লেনিন যে নতুন পথ ধরেন সেই পথ ধরেই মহান অক্টোবর বিপ্লব সম্ভব ও সার্থক হয়। রুশ বিপ্লবের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের মধ্যে দিয়ে বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হলেও প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি সব সময় সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হয় বিপ্লবীদের। কারণ আপাতত শান্ত নিষ্ক্রিয় থাকলেও নির্জিত শত্রুরা সুযোগ পেলেই মাথা তুলে ওঠবার চেষ্টা করবেই।

রুশবিপ্লবের পরও সেখানকার প্রতিবিপ্লবীরা ও সংশোধনবাদীরা এ চেষ্টা করেছিল। লেনিন জানতেন এ চেষ্টা তারা করবে। তাই তিনিও সতত সজাগ ও সক্রিয় ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে। বের্নষ্টাইন, কাউটস্কি অর্থনীতিবাদী ও মেনশেভিকরা, ট্রটস্কি, বুখারিন মার্কসবাদের বিপ্লবতত্ত্বের সংশোধন করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

লেনিন দেখলেন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের এই চেষ্টা সমাজ-তন্ত্রবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই অঙ্কুরেই বিনষ্ট করলেন তিনি এই চেষ্টাকে। এই কাজে লেনিনকে সাহায্য করেন বিপ্লবী নেতা স্টালিন। স্টালিন একবার এমিল লুডভিগকে বলেন, আমি নিজেকে লেনিনের শিষ্য হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।

রুশবিপ্লবে লেনিনের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে একথা অক্ষরে

অক্ষরে পালন করেন স্টালিন। শুধু তাই নয়, লেনিনের মৃত্যুর পরও তাঁর আদর্শকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যান তিনি।

স্টালিন বিশ্বাস করতেন সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করে বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদিক দিয়ে তিনি মার্কস ও লেনিনেরই সার্থক উত্তর সাধক ও ভাবশিষ্য। তবে তিনি বলতেন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য নির্ভর করছে কৃষিবিপ্লবের সাফল্যের উপর। সুতরাং জাতীয় গণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব হতে কৃষিবিপ্লবকে আলাদা করে দেখলে চলবে না।

স্টালিনের এই তত্ত্ব প্রচুর প্রেরণা যোগায় চীনবিপ্লবে। তিনি বলেছিলেন, চীনের নব জাগ্রত শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের অভ্যুত্থান ঘটাবে। সশস্ত্র শ্রমিক-কৃষকরা একযোগে সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে। স্টালিন আরও বলেছিলেন, চীনবিপ্লবের প্রধান ঝোঁক হবে কৃষকসমাজের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু চীনের মহান বিপ্লবী নেতা মাও সে-তুং একবার প্রতিবাদ করে বলেন, যেহেতু চীন কৃষিপ্রধান দেশ এবং কৃষকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানে সমাজ-বিপ্লবে কৃষকরাই নেতৃত্ব দান করবে। তাই তিনি বেশীর ভাগ কৃষকদের মধ্য থেকেই গণফৌজ গড়ে তোলেন।

পনেরো

শুধু মনের অফুরান উদ্যম দিয়ে দেহগত ক্লান্তিকে দূর করা যায় না। শ্রমজনিত সব ক্ষতিকে পূরণ করা যায় না। শুধু মনের শক্তি দিয়ে দেহগত দুর্বলতাকে রোধ করা যায় না। কোন মানুষই তা পারে না, মার্কসও তা পারেননি। দেহকে জোর করে বেশী খাটাতে গেলে দেহ তার প্রতিশোধ নেবেই। দেহ বেঁকে বসবেই।

কিন্তু এই সহজ কথাটা কোনমতেই বুঝতে চাইছিলেন না মার্কস।

লিভারের অসুখ থেকে সেরে ওঠার পরও দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন সমানে। তখন ১৮৫৭ সাল। মার মৃত্যুতে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে জেনি মার্কস কিছু টাকা দিয়েছিলেন স্বামীকে। সেই টাকায় প্রথম তাঁরা ভাল দেখে বাড়ি ভাড়া নিলেন লণ্ডনের ৯, গ্র্যাফটন টেরাসে। এই বাড়িতে উঠে যাবার পরই আবার অসুখে পড়লেন মার্কস। তবু ডীন স্ট্রীটের আগেকার বাসাটা থেকে এ বাসা অনেক ভাল, অনেক আরামদায়ক, একথা ভেবেও অসুখের মাঝেই কিছুটা স্বস্তি পেলেন মার্কস।

মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে। তাদের জন্য আলাদা ঘর দরকার। সুতরাং বড় দেখে বাসা একটার খুবই দরকার ছিল। কিন্তু নতুন বড় বাসায় এসেও শান্তি পেলেন না মার্কস। অভাবের তীক্ষ্নতা কিছুটা কমলেও দারিদ্র্য গেল না একেবারে। উল্টো বিপদের উপর বিপদ বাড়ল। অনেক খরচ বেড়ে গেল প্রতিমাসে। বাড়িটা বড় এবং বাড়তি ঘর থাকায় অনেক নির্বাসিত গরীব ব্যক্তি এসে প্রায়ই থাকা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করত। দারিদ্র্য আর নির্বাসনের জ্বালা হাড়ে হাড়ে নিজে জানেন মার্কস, তাই শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাদের সে অনুরোধ রক্ষা না করে পারতেন না।

বড় বাড়িতে মার্কস পরিবারের উঠে আসা দেখে দুই একজন নিন্দুক আবার বাইরে বলে বেড়াতে লাগল, মার্কসের অবস্থা ফিরেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে শ্রমিকদের টাকায় নিজে বিলাসিতা করছেন। কিন্তু এইসব নাচ প্রকৃতির লোকদের দায়িত্বহীন মন্তব্যে কোন রকম কান দিলেন না মার্কস।

এদিকে অসুস্থ অবস্থায় মার্কস বেশ বুঝতে পারলেন এ অসুস্থতা সাময়িক নয়। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। কয়েক বছর ধরে যে অপরিমিত অমানুষিক পরিশ্রম করে এসেছেন দিনের পর দিন এ অসুখ তারই সমুচিত প্রতিফল। এবারেও সেই লিভারের অসুখ। লিভার ঠিকমত কাজ করছে না। গায়ে ঠিকমত রক্ত সঞ্চার হচ্ছে না।

এই সময় মার্কসের দৈনন্দিন কর্মতালিকা ছিল সত্যিই ভয়াবহ। সারাদিন একরকম বৃটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরিতে থাকতেন। দাস ক্যাপিটাল লেখার জন্য অর্থনৈতিক গবেষণার কাজ তখন চলেছে পুরোদমে। তার মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে বসেই আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক ট্রিবিউনের জন্য লেখা তৈরি করতে হত। তার মাঝেই লণ্ডনের টাইমস পত্রিকার সম্পাদক প্রায়ই একজন বিশ্বস্ত লোককে মার্কসের কাছে পাঠিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাইতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতাসম্পন্ন মার্কসের রাজনৈতিক মতামতের উপর প্রচুর গুরুত্ব দিতেন সেকালের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকরা।

লাইব্রেরির কাজ দিনের মত সেরে বাড়ি ফিরতে রাত অনেক হয়ে যেত মার্কসের। এসে খাওয়ার পর আবার লিখতে বসতেন। বারণ করলেও শুনতেন না। তারপর সারা রাতের মধ্যে মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন। এত পরিশ্রম, কিন্তু কোন পুষ্টিকর খাবার নেই। তার উপর মনে আছে অসংখ্য উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। টাকা পয়সার চিন্তা। আর এজন্যই হয়ত খুব বেশী ধূমপান করতেন মার্কস। দেহমনের উপর ক্রমাগত জমতে থাকা নিবিড় ক্লান্তিটাকে সাময়িকভাবে কাটানোর জন্যই বোধ হয় অনবরত সস্তা দামের তামাকের সিগার খেতেন। শরীর খারাপের এটাও অন্যতম কারণ।

যাই হোক, ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য মার্কস কিছুদিনের মধ্যে সেরে উঠলেও আগেকার সেই বলিষ্ঠ দেহের অমিত তেজ ও প্রাণচঞ্চলতা আর ফিরে পেলেন না মার্কস্। ডাক্তারদের পরামর্শে দৈনন্দিন কর্ম-তালিকাকেও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য হলেন।

১৮৫৭ সাল থেকে ইংলণ্ডে চার্লস ব্র্যাডলাফের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে এক স্বাধীন চিন্তার আন্দোলন গড়ে ওঠে। অবশ্য মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই আন্দোলন খুব একটা বেশীদূর এগোতে পারেনি আর বেশীদিন চলেওনি। তবু বেশ কিছুদিন লণ্ডন শহরটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ব্র্যাডলাফের বক্তৃতায়।

বিশেষ করে প্রতি রবিবার বিকালের দিকে লণ্ডনের পার্কে পার্কে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন ব্র্যাডলাফ। আর তা শোনবার জন্য ভিড়ও জমত বেশ। জেনি মার্কস তাঁর দুই মেয়ে জেনি ও লরাকে নিয়ে প্রায়ই ব্র্যাডলাফের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। শুনতে ভাল লাগত তাঁর। ব্র্যাডলাফ ছিলেন গোঁড়া নাস্তিক। স্বাধীন চিন্তার নামে নাস্তিকতা-বাদেরই প্রচার করতেন তিনি।

এক একদিন স্ত্রীর সঙ্গে মার্কস নিজেও যেতেন। শুনতেন। কিন্তু খুব একটা ভাল লাগত না তাঁর। জেনি মার্কস তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্র্যাডলাফের নাস্তিকতাবাদ বিশেষ কাজে লাগবে।

কিন্তু মার্কস স্ত্রীর একথায় বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। তিনি ব্র্যাডলাফকে ঠাট্টা করে বলতেন নাস্তিকতাবাদের বিশপ। তিনি বলতেন ব্র্যাডলাফ ভবিষ্যতে একজন বুর্জোয়া উদারনীতিবাদীর বেশী কিছু হবে না; তুমি দেখে নিও। ব্র্যাডলাফের দৌড় এই পর্যন্ত।

পরে অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় মার্কসের এই ভবিষ্যৎ বাণী।

১৮৫৯ সালে মার্কসের 'এ ক্রিটিক টু দি পলিটিক্যাল ইকনমি' নামে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতির বইখানি প্রকাশিত হয়। এই সময় চার্লস ডারউইনের যুগান্তকারী বই 'দি ওরিজিন অফ স্পেসিজ' বইখানিও প্রকাশিত হয়। বিশ্বে মানব জাতির উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনের উপর ডারউইনের এই ঈশ্বরবিশ্বাসবিহীন বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৈপ্লবিক নির্ভীকতা দেখে আশ্চর্য হয়ে যান মার্কস। বইখানি পড়ে আনন্দ পান এবং সর্বত্র প্রশংসা করতে থাকেন। ইণ্টারন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পাদক হ্যারিসন রিলের মত অনেকে আবার ডারউইনের সঙ্গে মার্কসের বই-খানির তুলনা করেন। তাঁরা বলেন, ডারউইনের বইখানি জীব-বিজ্ঞান আর মার্কসের বইখানি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির উপর লেখা হলেও একই সময়ে প্রকাশিত দুখানি বই-ই যুগান্তকারী চিন্তার পথিকৃৎ। দুখানি বই-ই এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে মানুষের চিন্তার জগতে।

ইটালির ঐক্য ও স্বাধীনতার ব্যাপারে ল্যাসেলের সঙ্গে মার্কসের যে সব তিক্ত তর্ক বিতর্ক হয় তা অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এ তর্ক বিতর্ক শেষ হতে না হতেই আবার এক নতুন বিপত্তি শুরু হয়। এই সময় জার্মানীর হের ভগট নামে একজন ভদ্রলোক জার্মানীর কতকগুলি পত্র পত্রিকায় মার্কসের বিরুদ্ধে নানা-রকমের কুৎসা রটনা করতে থাকেন। তিনি বলে বেড়াতে থাকেন মার্কস দেশদ্রোহী শয়তান, সর্বহারাদের একনায়ক সেজে বসে আছেন।

এইসব কথাগুলি কানে আসতে লাগল মার্কসের। কিন্তু হাতের কাছে পত্রিকাগুলি না পাওয়ায় সেখানে লিখে কোন প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হলো না। তাছাড়া মার্কস দেখলেন যে সব পত্র পত্রিকায় ভগট মার্কসের নামে অপপ্রচার চালিয়েছেন সে সব পত্রিকা তাঁর প্রতিবাদ বা ভগটের বিরুদ্ধে কোন কথা হয়ত ছাপবে না। তাই ভগটের অভদ্রতা ও নীচতার সমুচিত জবাব দিয়ে একটি প্রতিবাদপত্র তাঁর নিজেরই ছাপা উচিত। কিন্তু তার জন্য টাকার দরকার। সংসার চালানোই দুষ্কর হয়ে পড়েছে, বাড়তি টাকা ত দূরের কথা।

এই সময় মামলায় জড়িয়ে পড়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন মার্কস। তার উপর নিরুপায় হয়ে আবার কিছু ঋণ করে ভগটের জবাবে এক প্রতি-বাদপত্র প্রকাশ করে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেন। ছাপার সময় স্ত্রী জেনি মার্কস প্রচুর সাহায্য করেন স্বামীকে। তবে একটা ব্যাপারে সান্ত্বনা পান মার্কস পুর্ব্ব ইউরোপ থেকে সম্প্রতি আসা ব্রোকহেম নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে লণ্ডন শহরে হঠাৎ আলাপ হয় মার্কসের। ব্রোকহেমের কাছ থেকে জানতে পারেন মার্কস, ল্যাসেল ও হের ভগট তাঁর যতই অপপ্রচার করুক জার্মানীতে ফ্রান্স সুইজারল্যাণ্ড ও ইংলেণ্ডের বহু ছাত্র যুবক ও শ্রমিক সমর্থন করে তাঁকে। তারা কোনদিন তাঁকে চোখে না দেখেও গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে তাঁর মতাদর্শকে।

হঠাৎ একদিন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন জেনি মার্কস।

ছেলেদের পাড়ায় এক বাড়িতে সরিয়ে রেখে আসা হলো। তারপর আর একজনের সাহায্যে রাত জেগে স্ত্রীর সেবা করে যেতে লাগলেন। একরকম নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুললেন মার্কস। ছেলে মেয়েদের কাউকে তাদের মার কাছে আসতে দেওয়া হত না। একটু সেরে উঠলে বাড়ির বারান্দায় একটি চেয়ারে বসে হাত নেড়ে ছেলেদের ভালবাসা জানাতেন জেনি।

স্ত্রী সেরে উঠলেন। কিন্তু ঋণের বোঝা আরও অনেক বেড়ে গেল। ডাক্তারের কাছে আগে থেকেই ধার ছিল। এক ধার শোধ দিতে না দিতে আবার ধার হত। কারণ একজনের অসুখ সেরে উঠতে না উঠতেই আবার একজন অসুখে পড়ত। অভাব অনটনের সংসারে রোগের কোন বিরাম ছিল না। তাই এই সময় ওষুধের দাম মেটাতে গিয়ে মার্কসকে শতকরা তিরিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত সুদে টাকা ধার করতে হয়েছে। কিন্তু তবু নিস্তার পাননি মার্কস নিষ্করুণ দুর্ভাগ্যের কুটিলতম কবল থেকে।

স্ত্রী যেদিন সম্পূর্ণভাবে সেরে উঠলেন ঠিক সেইদিনই আবার সেই লিভারের অসুখটা অতিশয় বেড়ে উঠল মার্কসের। শয্যাগত হয়ে পড়লেন মার্কস। স্ত্রীর অসুখের সময় দীর্ঘদিন ধরে খাওয়া দাওয়ায় যে অনিয়ম হয়েছে তার জন্যে পুরনো অসুখটা এবার বেড়ে গেল ভয়ানকভাবে। দিন কতক বেঁহুস হয়ে পড়ে রইলেন মার্কস। জীবনের কোন আশা বা আশ্বাস দিতে পারেন না চিকিৎসকরা।

অবশেষে ১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ভাল হয়ে উঠলেন মার্কস। কিন্তু কাজে হাত দিতে আরও দিনকতক দেরি হলো। কিন্তু সেরে উঠেও শান্তি পেলেন না মার্কস। কারণ পাওনাদারেরা তখন দিনের পর দিন বাড়ি আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

'দাস ক্যাপিটালের' প্রথম খণ্ডের খসরা প্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। সে কাজে হাত দেবার আগে কিন্তু টাকা চাই। অন্ততঃ কিছুটা স্বস্তি চাই মনে আর এই স্বস্তি পেতে হলে

পাওনাদারদের কিছু টাকা মেটাতেই হবে। 'হের ভগট' নামে যে প্রতিবাদপত্রটি প্রকাশ করেছেন মার্কস ধার করা টাকায়, তা থেকে একটি পয়সাও আয় হয়নি। এদিকে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনের কর্তৃপক্ষও তাঁর বেতন কমিয়ে দিয়েছে তার অসুখের জন্য।

এমন সময় হঠাৎ একটা কথা মনে এল মার্কসের। হঠাৎ একদিন স্ত্রীকে বলে বসলেন মার্কস, আমি ভাল হয়ে উঠে একবার হল্যাণ্ড যাব। হল্যাণ্ডই আমাদের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস। সেখানে এখনও আমাদের কাকা জীবিত আছেন। গিয়ে একবার দেখব যদি কিছু দেন।

দীর্ঘদিন পর সেদিন আমেরিকা হতে মার্কসের বন্ধু ওয়েডমেয়ারের এক চিঠি এসে হাজির। তাঁদের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বন্ধুর খবর পেয়ে মার্কস ও জেনি দুজনেই খুব খুশি হলেন। ওয়েডমেয়ারের স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে একখানি চিঠি লিখলেন জেনি।

আমেরিকায় নির্বাসিত ওয়েডমেয়ারও তাঁদের মতই বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন সেখানে। সেইজন্যই এতদিন কোন চিঠিপত্র লিখতে পারেননি।

বিশেষ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তাঁদের সংসারের সব খবরাখবর দিয়ে জেনি মার্কস লিখলেন, এত কষ্টের মাঝে এত অভাব অনটন সত্ত্বেও বেঁচে আছি শুধু ছেলেগুলোর মুখ চেয়ে। আমাদের জীবনের আলো যতক্ষণ ততক্ষণই ওদের আনন্দ। লরার বয়স এখন পনের, জেনির বয়স সাত আর ইলিনর বা টুসি হচ্ছে সবচেয়ে ছোট।

জেনি হয়েছে ঠিক ওর বাপের মত। অমনি কালো নরম ঘন চুল, উজ্জ্বল বড় বড় চোখ আর গায়ের রং। লরা হয়েছে ঠিক আমার মত। ওর চুলগুলো আমার মতই কোঁচকানো আর বাদামী রংয়ের। গায়ের রং দুজনেরই সমান উজ্জ্বল। ওদের দেখতে দেখতে আমিও যেন আমার শৈশবে আর কৈশোরে চলে যাই। অনেক আনন্দ পাই।

কিন্তু আমাদের ছোট মেয়ে ইলিনরই হচ্ছে বাড়ির সবার সবচেয়ে

প্রিয়। আমাদের একমাত্র পুত্রসন্তান এডগার যখন মারা যায় ইলিনরের জন্ম হয় ঠিক তখনই। সুতরাং নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ব্যথাহত অপত্য স্নেহ সবটুকু ওই মেয়েটার উপর গিয়ে পড়ে। আমাদের বড় মেয়ে তুটিও ইলিনরকে খুব ভালবাসে।

জার্মানীর সঙ্গে সঙ্গে ইংরিজিও শিখছে ইলিনর। আধো আধো মিষ্টি কথার ফুল সব সময়ই ফুটছে তার মুখে। ইলিনর কার্লেরও কম প্রিয় নয়। ইলিনরের মিষ্টি হাসি আর কথা তার বাবার অনেক দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেয়।

কিন্তু সব শেষে লেঞ্চেনের কথা না বললে সব কথা বলা হয় না। লেঞ্চেনের মত বিশ্বস্ত কর্মচারি এবং বন্ধু কোথাও দেখা যায় না। তোমার স্বামী তাকে দেখেছেন। তাঁকে শুধিয়ে দেখ, কত ভাল মেয়ে লেঞ্চেন, কত গুণ তার। সে আমাদের সঙ্গে ষোল বছর বাস করে আসছে এবং আমাদের সঙ্গেই সমানে মুখ বুজে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আসছে।

চিঠির শেষের দিকে জেনি উল্লেখ করেন, কেন তিনি ফেলিগ্রাম পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। যারা প্রথমে বন্ধু সেজে কাছে এসে বিশ্বাস উৎপন্ন করে পরে অকারণে দূরে চলে যায়, সে বিশ্বাসকে আঘাত করে তাদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন তিনি। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে অনমনীয় এবং স্পষ্টভাষী।

সত্যি সত্যিই কিছু প্রাপ্তির আশায় হল্যাণ্ডে চলে গেলেন মার্কস। সেখানে যেতে আরও বাধ্য হলেন মার্কস, কারণ আমেরিকায় অন্তর্বিপ্লবের জন্য নিউইয়র্ক ট্রিবিউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সাময়িক ভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। কম হলেও নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট যে টাকাটা পেয়ে আসছিলেন এতদিন তাও বন্ধ হয়ে গেল।

কাকা ফিলিপের কাছে সাহায্য চেয়ে একেবারে ব্যর্থ হলেন না মার্কস। কিছু পেলেন। প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও তাতে অন্ততঃ কিছুদিন চলবে। কিছু দেনা মিটবে। কিন্তু লণ্ডনে ফেরার

আগে একবার নিজের দেশ জার্মানী হয়ে ঘুরে যাবার ঠিক করলেন মার্কস। তখন ১৮৬১ সালের মার্চ মাস। নতুন রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছেন উইলিয়াম।

মার্কস প্রথমে বার্লিনে গিয়ে উঠলেন। শত মতভেদ সত্ত্বেও খবর পেয়ে ছুটে এলেন ল্যাসেল। এক নিবিড় বন্ধুত্বের সঙ্গে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন মার্কসকে। নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দিলেন। একদা নির্বাসিত নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মার্কসকে জার্মানী ঢুকতে অনুমতি দিলেন উইলিয়াম।

কিন্তু ল্যাসেল চেষ্টা করতে লাগলেন মার্কসের উপর নির্বাসন দণ্ড একেবারে মকুব করার জন্য। মার্কসকে জার্মানীর নতুন নাগরিকত্ব দান করার জন্য। ল্যাসেল মার্কসকে বললেন, লণ্ডন থেকে তোমাকে এখানে চলে আসতে হবে। আমরা আবার এক নতুন পত্রিকা বার করব।

মার্কসও তাই চাইছিলেন। বহু দিন পর বার্লিনে পা দিয়েই একথা প্রথম ভেবেছিলেন মার্কস। তাঁদের পার্টির এক মুখপত্র বার করে আবার শুরু করে দেবেন সমাজবিপ্লবের আদর্শ প্রচার। কারণ তিনি জানতেন সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে হলে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার দরকার। শুধু গবেষণামূলক বই লিখলে হবে না।

একথা জানতেন বলেই সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে অর্থনৈতিক গবেষণা কাজের গভীরে ডুবে গেলেও বিপ্লবের কথা কোনদিন ভোলেননি মার্কস। একথা ভেবেই ল্যাসেলের কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু ল্যাসেল বললেন, এই প্রস্তাবিত পত্রিকার সম্পাদক থাকবে তিন জন। তুমি আমি আর এঙ্গেলস। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মত যাচাইএর সময় তোমরা দুজনে যাতে আমায় নস্যাৎ করে দিতে না পার তার জন্য তোমার ও এঙ্গেলসের মিলিয়ে একটি মাত্র ভোট থাকবে।

মার্কস বললেন, আমি এঙ্গেলসকে সব কথা লিখে জানিয়ে দেখি।

মার্কস ল্যাসেলের ভ্রান্ত মতাদর্শের কথা আগে থেকে ভালভাবেই জানতেন। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অর্থহীন যুক্তিহীন উচ্ছ্বাসকে ঘৃণা করতেন। তবু আপাতত ল্যাসেলকে নিরাশ না করে সময় চাইলেন। কিন্তু এঙ্গেলসও তাঁকে জানালেন, পত্রিকার আদর্শের ব্যাপারে ল্যাসেলকে প্রাধান্য দেওয়া চলতে পারে না।

ল্যাসেলের প্রস্তাবকে মার্কস মানতে না পারলেও মার্কসের নতুন নাগরিকত্বের জন্য অনেক চেষ্টা করলেন ল্যাসেল। পুলিস অফিসার থেকে শুরু করে মন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল মার্কসের মত রাজতন্ত্র বিরোধী লোককে প্রুশিয়ার মত রাষ্ট্র কখনই হজম করতে পারবে না!

বার্লিন থেকে কোলোনে গেলেন মার্কস। সেখানে বৃদ্ধা মা ও কিছু পুরনো বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন পর দেখা করলেন। দেখা করে একই সঙ্গে আনন্দ এবং বেদনা দুইই পেলেন। বিশেষ করে বার্ধক্যজর্জরিতা মাকে দেখে কষ্ট হলো মনে। শুকনো পাতার মত কোন মতে লেগে আছেন এখনও জীবনের বৃন্তে, যে কোনদিন ঝরে পড়তে পারেন।

তখন এপ্রিল মাসের শেষ। মে মাসের প্রথমেই আবার লণ্ডনে চলে গেলেন মার্কস। বার্লিনে থাকার সময় একটা কাজ করেছিলেন মার্কস। ভিয়েনার 'ডাই প্রেসী' নামে এক পত্রিকার সঙ্গে লেখার এক চুক্তি করেন। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাকে কথা দেয়, মার্কসের প্রতিটি প্রবন্ধের জন্য তারা এক পাউণ্ড আর প্রতিটি সংবাদের জন্য দশ শিলিং করে দেবে। আর ঠিক এই সময়েই এক বছর পর নিউইয়র্ক

ট্রিবিউনও নতুন সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর সঙ্গে। আবার লেখা ছাপতে থাকে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে।

আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও সব দেনা শোধ হলো না। কাকার কাছ থেকে পাওয়া টাকা পথেই খরচ হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকা থেকে পাওয়া লেখার পারিশ্রমিকে সংসার চলে কোনরকমে। ফলে বাকি দেনা অপরিশোধ্যই রয়ে যায়।

আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবকে স্বাগত জানান মার্কস। তিনি বলেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ যেমন অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল, উণিশ শতকে আমেরিকার অন্তর্বিপ্লব তেমনি ইউরোপের মেহনতী মানুষদের প্রেরণা যোগাবে।

তিনি আরও বলেছিলেন, অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে এ যুদ্ধের গতি প্রকৃতি। তিনি বলেন, উত্তরে আছে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র আর দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে আছে অলিগার্কি ধরণের এক শাসনব্যবস্থা। সেখানে যতকিছু উৎপাদনমূলক মেহনতের কাজ করে নিগ্রোরা আর তার ফল ভোগ করে অলস শ্বেতাঙ্গরা। তিনি বলেন,

The Southern states are ruled by an oligarchy and an oligarchy is better suited for waging war, particularly an oligarchy like the one in the Southern states where all productive labour is performed by the Niggers and the four million whites are foot-booters by profession, but for all that I am prepared to stake my head that these fellows will get the worst of it in the end.

মার্কসের আর্থিক অবস্থা তখন এতই খারাপ যে, যে চাকরির কথা তিনি জীবনে কখনও ভাবেননি সেই চাকরির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। অবশেষে ইংলণ্ডের কোন এক রেল কোম্পানিতে কাজের প্রায় ঠিকও

হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর হাতের লেখা খারাপ বলে শেষ পর্যন্ত সে চাকরি হয়নি।

তাঁর নিজের শরীরও প্রায়ই খারাপ যাচ্ছিল। স্ত্রীর শরীরও ভেঙ্গে পড়েছিল। মেয়েদের স্কুলে যাবার পোষাক নেই। বড় মেয়ে লরা সংসারের দুরবস্থার কথা সব বুঝতে পেরে কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শিক্ষা শুরু করে দেয়।

মার্কস তখন অনেক ভেবে একটা উপায় ঠিক করলেন। তিনি ঠিক করলেন বড় দুজন মেয়েকে কোন ভদ্রবাড়িতে গৃহশিক্ষিকার কাজে ঢুকিয়ে দেবেন। ঘরের আসবাবপত্র বাড়ির মালিককে দিয়ে দেবেন। তারপর পাওনাদারদের কাছে নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করে স্ত্রী ও ছোট মেয়েকে নিয়ে গ্র্যাফটন টেরাসের পিছনের দিকে ছোট একটা কামরা ভাড়া নিয়ে উঠে যাবেন যেখানে খুব গরীবেরা থাকে।

অবশ্য এঙ্গেলসের জন্য শেষ পর্যন্ত তা করতে হয়নি মার্কসকে। সব কথা শুনে সাহায্যের উদার পশরা নিয়ে এগিয়ে আসেন চিরশুভার্থী এঙ্গেলস। এই সময় এঙ্গেলসের বাবা মারা যাওয়ায় বাবার জায়গায় তাঁদের 'আর্মেন এ্যাণ্ড এঙ্গেলস' নামক প্রতিষ্ঠানের তিনিই অংশীদার হন। সুতরাং আগের থেকে আরও বেশী পরিমাণে মার্কসকে সাহায্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে।

তবে এই সময় এক ব্যক্তিগত দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন এঙ্গেলস। মেরি বার্নস নামে যে আইরিশ মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে না করেই একসঙ্গে থাকতেন এঙ্গেলস সে হঠাৎ মারা যায়। এঙ্গেলস তখন শোকে অভিভূত হয়ে মার্কসকে লেখেন, আমি আমার অনুভূতিকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছি না। মেয়েটি আমাকে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসত।

এঙ্গেলস আশা করেছিলেন তাঁর এই চিঠির উত্তরে প্রচুর সান্ত্বনা ও সহানুভূতি পাবেন সবচেয়ে তার পুরনো বন্ধু মার্কসের কাছ থেকে। কিন্তু যা আশা করেছিলেন তা পেলেন না। এঙ্গেলসের প্রণয়িনী

মেরির মৃত্যুতে খুব একটা সান্ত্বনা দেখালেন না মার্কস। শুধু নিয়মমাফিক কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভাবের কথা জানালেন। বললেন, আমাকে হয়ত খুব আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর ভাববে। কিন্তু কোন উপায় নেই। আজ সারা লণ্ডন শহরের মধ্যে এমন একটা লোকও নেই যার কাছে সাহায্য চাওয়া ত দূরের কথা, আমি আমাদের অবস্থার কথা খুলে বলতে পারি। আমাকে এখন কিছু টাকা যোগাড় করে দিতেই হবে। তা না হলে এসপ্তাহ আমার পক্ষে সংসার চালানোও সম্ভব হবে না।

মার্কসের চিঠি যখন এঙ্গেলসের কাছে গেল তখনও মেরির মৃতদেহ সমাহিত হয়নি। এমন সময় মার্কসের চিঠি পেয়ে কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেন এঙ্গেলস। তিনি ক্ষুব্ধ হলেন শুধু মার্কসের টাকার তাগাদায় বা তাঁর সান্ত্বনার নিবিড়তার অভাবে নয়। এঙ্গেলসের দুঃখ হলো, মেরির মৃত্যুতে জেনি মার্কস একটা চিঠিও দিলেন না।

পরে অবশ্য মার্কস এর কারণের কথা জানান এঙ্গেলসকে। মার্কস লেখেন, মেয়েদের মন সত্যিই কি বিচিত্র! মেরির মৃত্যুর খবর পেয়ে জেনি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু কোন চিঠি দিতে পারেনি, সেজন্য অবশ্য তাকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সংসারের অভাবের কথা ভেবে ভেবে ওর মাথার ঠিক নেই।

যাই হোক, মেরির মৃত্যুর পর শোকবিহ্বলতা কিছুটা কমলে এঙ্গেলস উত্তর দিলেন মার্কসের চিঠির। লিখলেন, যাই হোক তোমার চিঠি পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছি। মেরির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মত একজন পরম বন্ধুকেও হারাইনি, এটা ভাবতে খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু তুমি যে টাকার কথা লিখেছ, তা এখন কোথায় পাব?

বাবার মৃত্যুর পর কারখানার অর্ধেক মালিকানা পেলেও টাকার খুব একটা স্বচ্ছলতা তখনও হাতে আসেনি এঙ্গেলসের। আমেরিকায় যুদ্ধ চলার জন্য কারখানার লাভ তখন খুবই কম হচ্ছিল।

কিন্তু তবু বন্ধুর চরম বিপদের দিনে চুপ করে থাকতে পারলেন না

এঙ্গেলস। অনেক চেষ্টা করে একশো পাউণ্ড যোগাড় করে পাঠিয়ে দিলেন মার্কসকে।

সেই টাকায় কিছুটা দায়মুক্ত হলেন মার্কস। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন, আমেরিকার অন্তর্বিপ্লব শেষ না হলে নিউইয়র্ক ট্রিবিউন নিয়মিত টাকা দিতে পারবে না এবং তাঁর অভাবের তীব্রতাও ঘুচবে না। কিন্তু তাঁর নিজের যতই কষ্ট হোক, স্বার্থের হানি যতই হোক, আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবকে রাশিয়ার ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা বলে অভিনন্দন জানালেন মার্কস। তিনি বললেন, এ যুদ্ধ হচ্ছে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিপীড়িত দাসদের বিদ্রোহ। ইউরোপের শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানালেন মার্কস, তারা যেন নিজ নিজ দেশের সরকারকে দক্ষিণ আমেরিকার ক্রীতদাসদের মালিকদের সাহায্য না করতে বাধ্য করে। বৃটিশ শ্রমিকরা তাদের সরকারকে দক্ষিণের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধা দেয়।

এদিকে এঙ্গেলস আগের থেকে আর্থিক স্বচ্ছলতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কসকে কিছু কিছু করে পাঠাতে লাগলেন। তাতে আগের থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হলেন মার্কস। আবার কাজে মন দিলেন। অর্থনীতির গবেষণার কাজ এখন অনেক এগিয়ে গেছে। এইবার প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমে মার্কস ঠিক করলেন তাঁর এই কাজ ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর রাষ্ট্রিক অর্থনীতির সমালোচনার কোন ধারাবাহিক অংশ হিসাবে প্রকাশিত হবে না; এ কাজকে স্বতন্ত্রভাবেই প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের পুরো খসড়া তখনও তৈরি হয়নি।

তখন ১৮৬২ সাল। মার্কস ঠিক করলেন তাঁর সারা জীবনের অর্থনৈতিক চিন্তা ও গবেষণার সমস্ত কাজ লিখতে হলে তিনটি খণ্ড ছাড়া সম্ভব হবে না।

প্রথম খণ্ডের পুরো খসড়া তৈরি হতে আরও দু'বছর কেটে গেল।

অনেক সময় নিজের লেখা পড়তে গিয়ে মনঃপুত হয় না। কাটাকাটি করেন, পরামর্শ চান এঙ্গেলসের কাছে।

১৮৬৪ সালে উইলহেম উল্‌ফ্‌ মারা যান। উল্‌ফের কোন আত্মীয় স্বজন না থাকায় তাঁর কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যান মার্কসকে। তাতে আরও নিশ্চিন্ত হয়ে ক্যাপিটাল রচনার কাজে নিজেকে সঁপে দিতে পারেন মার্কস।

১৮৬৫ সালে প্রথম খণ্ডের পুরো খসড়া রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়ে গেল। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় জার্মান ভাষায় জার্মানীর হামবুর্গ শহরে। কিন্তু ছাপতে দেবার আগে আরও কিছুদিন দেরি করলেন মার্কস। আরও একবার সংশোধন করলেন পাণ্ডুলিপিটিকে।

১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে মার্কস নিজে তাঁর পাণ্ডুলিপিটাকে নিয়ে গেলেন হামবুর্গ শহরে। ছাপার কাজ শুরু হলো, কিন্তু মার্কস প্রথম প্রুফ পেলেন তাঁর জন্মদিন ৫ই মে তারিখে, পরের বারের প্রুফ পেতে দেরি হলো। এই প্রুফ সংশোধন করে এঙ্গেলসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কোন কোন জায়গায় কিছু কিছু পরিবর্তন করলেন।

এইভাবে পাঁচ মাস চলার পর প্রথম খণ্ড ছাপার কাজ শেষ হয়। প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন মার্কস। সঙ্গে সঙ্গে এঙ্গেলসকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন,

অবশেষে প্রথম খণ্ডের কাজ শেষ হলো। তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। একাজ সম্ভব হলো একমাত্র শুধু তোমার জন্যেই। আমার জন্যে তোমার এতখানি আত্মত্যাগ ছাড়া তিন খণ্ডে সমাপ্ত এত বড় কাজটি আমি কখনই সম্পন্ন করে তুলতে পারতাম না। আমার অশেষ ভালবাসা ও আলিঙ্গন জানবে।

দাস ক্যাপিটাল বইখানি লেখার সময় ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের কার্যবিবরণী থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। এর ফলে অসংখ্য

ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে তাঁর অর্থনৈতিক গবেষণা হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ, তাঁর যুক্তি হয়ে উঠেছিল বলিষ্ঠ এবং অখণ্ডনীয়।

মার্কসের আগে সমাজে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ত অনেকে করেছিলেন। কিন্তু সে প্রতিবাদের পিছনে কোন বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল না। তাছাড়া মার্কসের আগে সমাজে যে কোন শোষণ পীড়ন ও অন্যায়ের কাজগুলিকে এক একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার বা ঘটনা বলে মনে করা হত।

একমাত্র মার্কসই প্রথম শোষণ ও অন্যায়কে কোন ব্যক্তি বিশেষের পাপকর্ম বা নিষ্ঠুরতা হিসাবে না দেখে সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিণাম হিসাবে দেখলেন। তাই তিনি ক্যাপিটালের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখলেন, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ নিজেকে যত বড় করেই তুলুক না কেন, সর্বদাই সে সামাজিক ব্যবস্থার অধীন। তাই আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন সামাজিক সম্পর্কের জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে কম দায়ী করি।

ক্যাপিটালের ইংরিজি সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস বলেছিলেন, ক্লাসিক্যাল যুগের অর্থনীতিবিদরা মুনাফা ও খাজনার উৎপত্তিকে ও প্রকৃতিকে ভাল করে তলিয়ে দেখেননি। মুনাফা ও খাজনা হচ্ছে উৎপাদনের সেই অংশ যা শ্রমিকরা তাদের মালিকদের হাতে তুলে দেয় এবং যার জন্য তারা কোন বেতন পায় না। মার্কস এইজন্য মুনাফা বা খাজনাকে বলেছিলেন উদ্বৃত্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত মূল্য।

তখনকার দিনে ইংলণ্ডে যে সব সামাজিক অবিচার ও শোষণের ঘটনাগুলি অবাধে চলছিল, মার্কস সেগুলির নিখুঁত চিত্র তথ্য প্রমাণসহ তুলে ধরেন। সেগুলি হলো কর্মক্ষেত্রে সময়ের দীর্ঘতা, শিশু শ্রমিকের শোষণ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা।

এই সব সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের কাজগুলির উচ্ছেদ বা প্রতিকারের জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন মার্কস। পরে অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি নানারকম শ্রমিক আন্দোলনের দ্বারা এই সব

অবিচার উচ্ছেদ করার জন্য আইন প্রণীত হয়। মার্কস আরও দেখিয়ে দিলেন, আমাদের সমাজের মধ্যে এমন একটা গলদ রয়েছে যার জন্য একদল লোক অন্য লোকের শ্রমের দ্বারা অর্জিত মুনাফা নিজেরা অন্যায়ভাবে ও অবাধে ভোগ করছে আর এই ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝে বেকারি ও যুদ্ধের সৃষ্টি করছে।

'দাস ক্যাপিটাল'এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে। বিভিন্ন সভা সমিতি, সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে বইখানি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনেকে বলতে থাকে, ক্যাপিটাল হচ্ছে মেহনতী মানুষের বাইবেল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন প্রভূত প্রেরণা ও তাদের প্রাণবস্তু খুঁজে পায় ক্যাপিটাল বইখানির মধ্যে। এইসব কারণেই বইখানির ইংরিজি সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস মন্তব্য করেন,

'Das Kapital' is often called on the continent, 'The Bible of the working class.' That the conclusions arrived at in this work are daily more and more becoming the fundamental principles of the great working-class movement not only in Germany and Switzerland, but in France, in Holland and Belgium, America and even in Itally and Spain that everywhere the working class more and more recognises, in those conclusions, the most adequate expressions of its condition and of its aspirations, nobody acquainted with that movement will deny.

এঙ্গেলস বললেন, ক্যাপিটাল বইখানির মধ্যে সমাজিক অর্থনীতির সম্বন্ধে মার্কস যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেই সব সিদ্ধান্তগুলিই বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-আন্দোলনের মূল নীতি ও চালিকাশক্তি রূপে কাজ করছে। মার্কসের অর্থনৈতিক তত্ত্ব ইংলণ্ডের সমাজতান্ত্রিক

আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে এবং এই আন্দোলন সর্বহারা শ্রেণী থেকে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। এমন একদিন শীগগির আসছে যেদিন ইংলণ্ডের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আনুপূর্বিক পরীক্ষা আর তার প্রতিকার অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াবে। উৎপাদনবৃদ্ধি ও পণ্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজারের সম্প্রসারণ না ঘটলে ইংলণ্ডের শিল্পব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়বে। বর্তমানে স্বাধীন ব্যবসাব্যবস্থার কার্যকারিতার দিনও এসেছে ফুরিয়ে। এমন কি ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অফ কমার্সের এক সভায় এই নিয়ে এক উত্তপ্ত আলোচনা হয়। বিভিন্ন দেশের শিল্পোন্নতির ফলে ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যের আর তেমন চাহিদা নেই। আসল কথা কোন দেশের উৎপাদন ক্ষমতা যদি জ্যামিতিক হারে বাড়ে তাহলে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটে গাণিতিক হারে।

অতিরিক্ত উৎপাদনের মাল কাটাবার জন্য যদি উপযুক্ত বাজার পাওয়া না যায় তাহলে শিল্পে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে একদিন। মন্দা চলবে শিল্পের বিভিন্ন শাখায়। তাছাড়া বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রতিবছর। এইভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকলে বেকাররা হয়ত ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলবে এবং নিজেদের ধৈর্যের প্রতিকার হয়ত নিজেরা করার চেষ্টা করবে। সেদিন অবশ্য এমন একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে যিনি অর্থনীতির সমগ্র ইতিহাস এবং ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করে এমন এক তত্ত্ব আবিষ্কার করে গেছেন যা সমাজের সকল শ্রেণীর সব মানুষের আর্থিক দূরবস্থার অবসান ঘটাবে।

মার্কস অবশ্য আর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সেটা হলো এই যে, সারা ইউরোপের মধ্যে ইংলণ্ডই হচ্ছে এমন এক দেশ যেখানে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবিপ্লব সম্ভব হতে পারে। তবে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি ভোলেননি যে শোষিত শ্রেণীর পক্ষ থেকে বড়

রকমের একটা আন্দোলন না হলে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী কিছুতেই মাথা নত করবে না সে বিপ্লবের কাছে।

ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের জার্মান ও ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস বলেন, ইংলণ্ডে সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এই ভাঙ্গনের প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। তবে সে সব দেশে প্রতিক্রিয়া কী ধরণের রূপ নেবে তা নির্ভর করবে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠন শক্তির উপর। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থই অন্যান্য শ্রেণীর স্বার্থকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং শ্রমিকশ্রেণী বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীকে বাধ্য করতে পারে তাদের স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত বিকাশের পথে বাধাগুলিকে আইন সম্মত উপায়ে দূর করবে। এই কারনেই আমি ইংলণ্ডের কারখানা আইনের ইতিহাস যাবতীয় খুঁটিনাটি ও তার ফলাফল সম্বন্ধে এই খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। এক জাতি অন্যান্য জাতি হতে অনেক কিছুই শিখতে পারে।

আমি এই বইখানিতে এমন সব অর্থনৈতিক নীতি ও তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করেছি যেগুলি আধুনিক সমাজব্যবস্থার গতি প্রকৃতির নিয়ামক। এই সমাজব্যবস্থার ক্রমাবনতির ক্রমপর্যায়ে যে সব অবাঞ্ছিত সমস্যা ও সঙ্কটের উদ্ভব ঘটেছে সেগুলি হঠাৎ কোন আইন পাশ করে দূর কথা সম্ভব নয়। তবে এই সব আইন পাশের দ্বারা ওই সব সমস্যাজনিত অনেক অসুবিধাকে দূর করা যেতে পারে।

এখানে আমি আর একটা জিনিষ দেখাতে চেয়েছি। আমি দেখাতে চেয়েছি ব্যক্তিবিশেষ সমাজজীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যক্তিজীবনের গতিপ্রকৃতি সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ব্যক্তি কোন এক বিশেষ শ্রেণীগত স্বার্থ ও শ্রেণীগত প্রতিক্রিয়ারই খণ্ড ও জীবন্ত প্রতীক। কোন মানুষ কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে যতই মাথা তুলে উঠুক না কেন, আসলে সে তার জাতির সামাজিক ও আংশিক প্রতিরূপ।

জার্মান বুর্জোয়াদের মুখপাত্ররা প্রথমে আমার 'দাস ক্যাপিটালের' কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছিল, যেমন তারা স্তব্ধ করেছিল আমার প্রথম দিকের রচনাগুলিকে। যখন তারা দেখল বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থায় এখন তা আর সম্ভব নয়, তারা শুরু করে দিল সমালোচনা। এই সমালোচনার দ্বারা বুর্জোয়াদের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল কিছুটা। কিন্তু 'ভোল্কসিয়াৎ' নামে শ্রমিকশ্রেণীর একটি মুখপত্রে এই সব সমালোচনার উত্তরে এমন এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ শোনা গেল যার প্রত্যুত্তর আজও পর্যন্ত দিতে পারেনি বুর্জোয়ারা।

আর একটা কথা। আমার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি হেগেলের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু পৃথক নয়, সম্পূর্ণ বিপরীত। হেগেল মনে করতেন মানব মনের চিন্তা ও ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ-রূপে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। বাইরের বস্তুজগতের উপর কোন ক্ষেত্রেই নির্ভর করতে হয় না তাদের। বরং এই বস্তুজগৎ মানুষের মানসক্রিয়ার বাস্তব প্রতিরূপ। কিন্তু আমি মনে করি সম্পূর্ণ অন্য কথা। আমার মত হলো, হেগেল মানুষের যে সব মানসক্রিয়াকে 'আইডিয়া' বা 'ভাবমূর্তি' নাম দিয়েছেন, সেই আইডিয়া মানবমনের উপর প্রতিফলিত বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

হেগেলের দুর্বোধ্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটির আমি সমালোচনা করেছিলাম আজ হতে তিরিশ বছর আগে। আসলে হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মাথার উপর ভর করে পা দুটো উপরে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই দুর্বোধ্য পদ্ধতির ভিতর থেকে যুক্তির শাঁসটাকে বার করে তাকে কাজে লাগাতে হবে। এই পদ্ধতিটাকে একেবারে উল্টিয়ে সোজা করে দিতে হবে। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার দোষ হচ্ছে এই যে তিনি বস্তুজগতের উপর মানুষের নির্বিশেষ ভাবচৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মানুষের ভাবচৈতন্যটাই মূল সত্য ; বাইরের বস্তুজগৎ বলে যেটা দেখছি সেটার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সেটা এই ভাবচৈতন্যেরই বাস্তব প্রতিফলন।

অবশ্য দার্শনিকদের মধ্যে হেগেলই প্রথম বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণের দ্বন্দ্ব ও প্রগতি দেখতে পান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস:করতেন, এই নির্বিশেষ ভাবসত্তার মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। মানুষ মাটির উপর পা দিয়েই হাঁটে। কিন্তু হেগেলের ভাবপ্রধান দ্বান্দ্বিকতা মাটিকে অস্বীকার করে মাথা দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করে।

হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক ভাবধারা ও পদ্ধতি জার্মানীতে একদিন বেশ প্রসার লাভ করেছিল। কারণ তিনি বর্তমান রাষ্ট্রকে পরিবর্তিত করে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি একই সঙ্গে বস্তুর বর্তমান বাস্তব অস্তিত্ব ও পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর ইতিহাসতত্ত্বের মূল কথাই ছিল এই পরিবর্তনশীলতা। তাঁর মতে কোন বস্তুর বর্তমান অস্তিত্ব চূড়ান্ত সত্য নয়, কারণ পরিবর্তন হবেই। কোন রাষ্ট্র বা সমাজব্যবস্থা যত ভালই হোক, তারও পরিবর্তন হবেই। এই ভাবে বস্তুজগৎ অজস্র বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিশ্বগত এক পরম ভাবসত্তার ইচ্ছানুসারে পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে।

হেগেলের চিন্তার মধ্যে কিছুটা বৈপ্লবিকতা ছিল বলেই তখন অনেক তরুণ চিন্তাশীল তার দিকে ঝুঁকেছিলেন। হেগেলের আগের যত সব ভাববাদী দার্শনিকরা বস্তুর মাঝে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব গতি বা পরিবর্তনশীলতাকে দেখতে পাননি। তাঁরা ভাবতেন আসলে গতি বলে কিছু থাকে ত আছে মানুষের মনে। সমাজ গড়ে মানুষের মন আবার সমাজ ভাঙ্গেও মানুষের মন। মানব মনের ভাব বা আদর্শই সব কিছুর মূলে, তার বাইরে কোন সত্য নেই, আছে শুধু তারই প্রতিভাস।

ষোল

মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল' তিন খণ্ডে সমাপ্ত হলেও প্রতিটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একটি খণ্ডের সঙ্গে অন্যটির কোন ধারাবাহিক সম্পর্ক নেই। প্রথম খণ্ডের ইংরিজি সংস্করণে তেত্রিশটি অধ্যায় ও নয়টি অংশে বিভক্ত ৭৭৪ পৃষ্ঠা (নির্ঘণ্ট বাদে) আছে।

প্রথম অংশের প্রথম অধ্যায়ে আছে পণ্যের কথা। আছে পণ্যের বিবিধ মূল্যের কথা। যে কোন পণ্যের দুটি মূল্য আছে—ব্যবহারিক মূল্য ও স্থায়ী বা অন্তর্নিহিত মূল্য। পণ্যের মত শ্রমেরও দ্বিবিধ মূল্য আছে। এর পর মূল্যের বিভিন্ন আকৃতি বা বিনিময়যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন মার্কস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মার্কস আলোচনা করেছেন বিনিময় সম্পর্কে। প্রতিটি পণ্যের মালিক তার পণ্যকে এমন এক পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করতে চায় যে পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য তার কোন না কোন অভাবকে পরিতৃপ্ত করবে। এইভাবে পণ্যের মালিক সমপরিমাণ মূল্যের বস্তুর সঙ্গে তার পণ্যের বিনিময় সাধন করে তার পণ্যের মূল্যটিকে উপভোগ করতে চায়। সুতরাং বিনিময় কাজটি একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক আদান প্রদান ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ কোন মালিক যখন তার ব্যক্তিগত বস্তুকে অন্যের কোন বস্তুর সঙ্গে বিনিময় করতে চায় তখনি এসে পড়ে সামাজিকতার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়ে আছে অর্থ ও পণ্যের প্রচলন গতির কথা। এই প্রসঙ্গে অর্থের প্রচলন, প্রচলনের মাধ্যম, পণ্যের রূপান্তর এবং মূল্যমানের ব্যবহারিক প্রতীক হিসাবে ভিন্ন মুদ্রার যোগ্যতার কথা আলোচনা করেছেন মার্কস। সোনা ও রূপোর মাধ্যমেই অর্থ বাড়ির গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বের বাজারে গিয়ে সর্বজনীনতা লাভ করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পণ্য কেনা বেচার সময় দাম দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

এই তিনটি অধ্যায়েই প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় অংশেও আছে তিনটি অধ্যায় অর্থাৎ চার থেকে ছয়। চতুর্থ অধ্যায়ে পুঁজির সংজ্ঞা আর কতকগুলি সাধারণ সূত্র। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে পুঁজির সাধারণ সূত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিরোধের কথা আর ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে শ্রমশক্তির কেনাবেচার কথা। এইভাবে এখানে অর্থ পুঁজিতে কিভাবে রূপান্তরিত হয় সেকথা বলেছেন মার্কস। তিনি বলেছেন পণ্যের প্রচলনই হলো পুঁজির প্রথম কথা। পণ্যের উৎপাদন, প্রচলন ও প্রচলনের উন্নত রূপই হলো যে কোন বাণিজ্যের ভিত্তিভূমি। পুঁজির আধুনিক ইতিহাস শুরু হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে। বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য প্রথমে রূপান্তরিত হয় অর্থে, এবং অর্থের দ্বারাই আবার প্রয়োজনমত পণ্য কেনা হয়। অর্থাৎ কোন লোক কোন একটি জিনিষ বিক্রি করে যে টাকা পায় সেই টাকা দিয়ে তার প্রয়োজনমত আর একটি জিনিষ কেনে। এইভাবে অর্থ প্রচলনের মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় পুঁজিতে।

তৃতীয় অংশে আছে পাঁচটি অধ্যায়—সপ্তম থেকে একাদশ। এই অংশের আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো নির্বিশেষ উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রম কিভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে তার কথা আছে। এর পরের অধ্যায়ে আছে স্থির বা স্থায়ী পুঁজি আর পরিবর্তনশীল পুঁজির কথা। নবম অধ্যায়ে আছে উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের কথা।

দশম অধ্যায়ে আছে শ্রমিকদের কাজের সময় সম্বন্ধে আলোচনা। যে কোন সমাজে যখন একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক উৎপাদন ব্যবস্থার সব উপকরণগুলি দখল করে রাখে, তখন শ্রমিকরা স্বাধীন বা ক্রীতদাস যাই হোক না কেন, নিজেদের ভরণপোষণের জন্য বেশী সময় কাজ করতে বাধ্য হয় অর্থাৎ পুঁজিপতিদের কাছে অল্প দামে তাদের বেশী শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর অন্যান্য ক্রেতার মত পুঁজিপতিরাও

শ্রম কেনার সময় শ্রমকে পণ্য হিসাবে দেখে এবং সবচেয়ে বেশী লাভ করতে চায়।

কিন্তু সেক্ষেত্রে শ্রমিকরা তার প্রতিবাদ করবেই। তারা পুঁজি-পতিকে বলবে, অন্যান্য পণ্য থেকে আমাদের শ্রমরূপ পণ্য আলাদা জিনিষ, মূল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা এর অনেক বেশী। আর এইজন্যই তুমি আমার শ্রম কিনেছিলে, আমার শ্রমের যেটা বাড়তি দাম, তার থেকেই তুমি পুঁজি বাড়াও। আমার দৈনন্দিন শ্রমশক্তির ফসলের মোটা অংশটা তুমিই ভোগ কর আর তার বিনিময়ে যে দাম আমায় দাও তাতে কোন রকমে খেয়ে পরে বেঁচে থাকি আমি। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমার লাভ মানেই আমার ক্ষতি।

মার্কস বলেছেন, শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত শ্রমের প্রতি লোভের সীমা পরিসীমা নেই পুঁজিপতিদের। পুঁজিপতিরা শ্রমের জন্য যে দাম দেয় তার জন্য দ্বিগুণ খাটিয়ে নেয় শ্রমিকদের। প্রয়োজনীয় কাজের সময় যদি প্রতিদিন ছঘণ্টা হয় তাহলে পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের খাটিয়ে নেয় বারো ঘণ্টা। শ্রমিকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিরা কিভাবে তাদের শোষণ করে চলে বেশী খাটিয়ে তার বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন মার্কস।

১৮৬০ সালের ২০শে জানুয়ারি ব্রোটন চার্লটন নামে একজন কাউন্টি ম্যাজিষ্ট্রেট নটিংহামে এক সভায় বলেছিলেন, এ অঞ্চলের ফিতা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এক শ্রেণীর শ্রমিক যে পরিমাণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করে চলেছে তার নজীর এ রাজ্যের অন্য কোন অঞ্চলে ত দূরের কথা, সভ্য জগতের কোথাও তা পাওয়া যাবে না।...এমন কি নয় দশ বছরের শিশুদের রাত্রি তিনটে চারটের সময় জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে শুধুমাত্র জীবিকার বিনিময়ে তাদের সারাদিন ও রাত্রি এগারোটা বারোটা পর্যন্ত খাটতে হয়। তাদের হাত পা ক্লান্ত ও অলস হয়ে পড়েছে, তাদের মুখ সাদা হয়ে পড়েছে এবং শরীর ভেঙ্গে পড়েছে এই বয়সেই। দেহ মন ও আত্মার দিক থেকে এ এক জঘন্য দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮৬৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের খবরের কাগজ-গুলিতে একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরটির শিরোনামা ছিল, অতিরিক্ত শ্রমজনিত মৃত্যু। খবরটি ছিল মেরি এ্যানি ওয়াকি নামে কুড়ি বছরের একটি মেয়ে সম্পর্কে। মেয়েটি একটি বড় পোষাক প্রতিষ্ঠানে কাজ করত। সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন মহিলা মেয়েটিকে রোজ সাড়ে ষোল ঘণ্টা করে খাটিয়ে নিত। কাজের মরশুমে মেয়েটিকে একটানা তিরিশ ঘণ্টা পর্যন্ত অনেক সময় কাজ করতে হয়েছে। কাজের সময় নিবিড় ক্লান্তিতে কোনরকম ঝিমুনি এলে কফি খাইয়ে তাকে আবার চাঙ্গা করে তোলা হত।

মেয়েটি এইভাবে আরও হতভাগ্য তিরিশটি মেয়ের সঙ্গে একটি আলো বাতাসহীন ছোট ঘরে কাজ করত এবং শুত। এইভাবে এত কষ্ট করে তারা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জৌলুশধারী পোষাক তৈরি করত। কোন এক শুক্রবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং রবিবার সে মারা যায়। মরার আগে সে একটু সেবা পর্যন্ত পায়নি। ডাক্তারও ডাকা হয়নি। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল একেবারে অন্তিম কালে। মেরি এ্যানির মৃত্যুর জন্য হৃদয়হীন মালিককে দায়ী করে এক মামলা দায়ের করা হয়। ডাক্তার কীজ জুরিদের সামনে সাক্ষী দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আলো হাওয়াহীন একটি ছোট ঘরে ভিড়ের মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে মেরি এ্যানি ওয়াকির মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন,

"Mary Anne walkey had died from long hours of work in an overcrowded workroom, and a too small and badly ventilated bedroom."

জুরিরা অবশ্য কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলেছিলেন. আসলে মৃত্যুটা ঘটেছে মূর্চ্ছা থেকে। তবে এ মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে অতিরিক্ত খাটুনির জন্য। জুরি রায় দেয়, "The decased had died of apoplexy, but there was reason to fear that her death had been accelerated by overwork in an overcrowded room.

মর্নিং স্টার নামে সংবাদপত্রটি ২৩শে জুন মন্তব্য করে, আমেরিকার ক্রীতদাসদের মালিকদের থেকে আমাদের দেশের শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের পার্থক্য কোথায়? আমেরিকায় ক্রীতদাসদের মারা হয় বেতের চাবুক আর এখানে নারী শিশু নির্বিচারে শ্রমিকদের মারা হয় অনাহার অনশন আর অপুষ্টির চাবুক। তবু ওখানে ক্রীতদাসদের এর থেকে ভাল খাওয়া পরা দেওয়া হয় আর এত বেশী খাটানোও হয় না।

শ্রমিকদের তাজা রক্তের জন্য মুনাফাখোর পুঁজিপতিদের পিপাসার অন্ত নেই। শ্রমিকদের বাড়তি শ্রমের জন্য লালসার শেষ নেই। কারণ বাড়তি শ্রম ছাড়া তাদের বেশী লাভ হবে কি করে? তাদের শ্রমের উপযুক্ত যদি দাম মাইনে হিসাবে দেয় অথবা যে পরিমাণ বেতন দেয় শুধু সেই পরিমাণ খাটিয়ে নেয় তাহলে তাদের লাভ হবে কি করে, তাহলে আদের পুঁজি বাড়বে কি করে?

যদি কোন পুঁজিপতিকে শুধনো হয়, কাজের সময় ঠিক কতটুকু হওয়া উচিত?

তাহলে পুঁজিপতি উত্তর করবে, কেন চব্বিশ ঘণ্টা। তার শ্রমশক্তির জন্য আমি দাম দিই। তবে চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ সারা দিনরাত ত কোন লোক কাজ করতে পারে না একটানা, তাই তার আহার বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় কয়েক ঘণ্টা।

এইভাবে তাদের বিক্রীত শ্রমশক্তির দ্বারা ক্রমাগত পুঁজি বাড়িয়ে যেতে হয় শ্রমিকদের। শিক্ষা বা আত্মোন্নতির কোন সুযোগ নেই, খেলাধুলো বা আমোদ-প্রমোদের সময় নেই, সামাজিক মেলামেশার কোন অবকাশ নেই, এমন কি রবিবারও বিশ্রাম নেই—শুধু কাজ আর কাজ। এমনি করে পুঁজিপতি মালিকরা শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তাদের জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়। এমনি করে তাদের দেহ মন ও আত্মার সমস্ত সুখ শান্তি সামান্য কিছু টাকা দিয়ে কেড়ে নেয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এ শোষণ স্বাভাবিক সাধারণ একটি ঘটনা। কারণ এ উৎপাদন ব্যবস্থার লক্ষ্যই হলো উদ্বৃত্ত শ্রমের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা। পুঁজিবাদী সমাজে এই শোষণ ক্রমশঃ এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে এর দ্বারা শ্রমিকদের দৈহিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতি ও স্বাভাবিক বিকাশের পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদের অকাল মৃত্যুকে ডেকে আনা হয়।

তারপর একাদশ অধ্যায়ে আছে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার ও পরিমাণ। একজন শ্রমিক তার মালিককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কী পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে দেয় তার উদ্বৃত্ত শ্রমের মাধ্যমে সেই কথা আলোচিত হয়েছে এ অধ্যায়ে। যদি কোন শ্রমিক রোজ ছয় ঘণ্টা কাজ করে তিন শিলিং বেতন পায় তাহলে তার দৈনন্দিন শ্রমশক্তির মূল্য হচ্ছে তিন শিলিং। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা ও যোগ্যতা বাড়াতে হলে তাদের কাজের সময় কমিয়ে দিতে হবে।

চতুর্থ অংশের তিনটি অধ্যায় জুড়ে আছে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের কথা। এই অংশের প্রথমে অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায়ে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের স্বরূপ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কাজের দিন ও সময় যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করা হয় মার্কস তার নাম দিয়েছেন নির্বিশেষ উদ্বৃত্ত মূল্য। অপর পক্ষে দিনে রাতে কাজের সময় কমিয়ে দিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করা হয় তাকে বলেছেন আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য। তিনি বলেছেন,

The surplus value produced by prolongation of the working day, I call absolute surplus value. On the otherhand, the surplus value arising from the curtailment of the necessary labour-time and from the corresponding alteration in the respective length of the two components of the working day, I call relative surplus value.

এর পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে সহযোগিতার কথা। কোন প্রতিষ্ঠানে বেশী সংখ্যক শ্রমিক যদি পাশাপাশি মিলে মিশে কাজ করে তাহলে উৎপাদন বাড়ে। তাতে পুঁজি বাড়ে। এখানে শ্রমিকরা পরস্পরকে একই পরিবারের সদস্যের মত দেখে।

চতুর্দশ অধ্যায়ে আছে শিল্পোৎপাদন ও শ্রমবিভাগ। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মধ্যে যে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ দাঁড়িয়ে আছে শ্রমবিভাগের উপর। এটা ষোড়শ শতাব্দী হতে চলে আসছে। পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃততর আন্তর্জাতিক বাজার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগ পদ্ধতি আরও উন্নত হয় এবং এই শ্রমবিভাগের জন্যই গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়।

প্রথম খণ্ডের ইংরিজি সংস্করণটিকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এই সংস্করণে পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় খণ্ড শুরু করা হয়। যাই হোক, এই খণ্ডের প্রথমে অর্থাৎ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যন্ত্র ও আধুনিক শিল্পব্যবস্থার কথা। যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবের ফলে উৎপাদনব্যবস্থায় যে সব সুবিধা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি আলোচনা করা হয়েছে। শ্রমিকদের উপর যন্ত্রশিল্পের প্রতিক্রিয়ার কথাও বলা হয়।

ষোড়শ অধ্যায় থেকে আবার নির্বিশেষ ও আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। ষোড়শ অধ্যায়ে আছে এই দুটি মূল্যের একটি তুলনামূলক আলোচনা।

সপ্তদশ অধ্যায়ে আছে শ্রমিকশক্তির দাম ও উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিবর্তনের আলোচনা।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রের বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস।

তারপর আছে বেতনের কথা। উনিশতম অধ্যায়ে শ্রমশক্তির মূল্যের বেতনে রূপান্তরের কথা বলা হয়েছে।

বিংশ অধ্যায়ে আছে সময়কেন্দ্রিক বেতনের কথা।

একুশতম অধ্যায়ে আছে মূল্যকেন্দ্রিক বেতনের কথা।

পরের অধ্যায়ে অর্থাৎ বাইশতম অধ্যায়ে আছে বেতন নির্ধারণে জাতিগত পার্থক্যের কথা।

এরপর মার্কস আলোচনা করেছেন পুঁজি সঞ্চয়ের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের কথা। তেইশতম অধ্যায়ে শুধু বলা হয়েছে সরল পুনরুৎপাদনের কথা।

চব্বিশতম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, উদ্বৃত্ত মূল্যের পুঁজিতে রূপান্তরের কথা।

পঁচিশতম অধ্যায়ে পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের কতকগুলি সাধারণ নীতির কথা আলোচনা করা হয়েছে। পুঁজিসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশক্তির চাহিদাও বেড়ে যায়। পুঁজিসঞ্চয় যত বাড়তে থাকে, পুঁজির পরিবর্তনশীল অংশটি ততই কমতে থাকে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় পুঁজি সঞ্চয়ের উন্নতির সঙ্গে উদ্বৃত্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে গেলে শিল্পে সংরক্ষিত শ্রমিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

তারপর প্রথম খণ্ডের ছাব্বিশতম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে তথাকথিত আদিম সঞ্চয়ের কথা। প্রথমেই আছে আদিম সঞ্চয়ের মূলমন্ত্র।

সাতাশতম অধ্যায়ে আছে কৃষিজীবীদের জমি থেকে উচ্ছেদের কথা।

পরের অধ্যায়ে আছে ছিন্নমূল কৃষকদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী আইন প্রণয়ণের কথা যা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামন্তরা জোর করে বহু কৃষককে তাদেব ঘরবাড়ি ও জমিজায়গা কেড়ে নিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত করে। গ্রাম থেকে হঠাৎ তারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে জীবিকার সন্ধানে কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কাজ পাওয়া সম্ভব হয় না সবার পক্ষে। উপরন্তু নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ

কিছু সময় লাগে তাদের। কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী দেশের বুর্জোয়া হৃদয়হীন শাসক সম্প্রদায় তাদের অলস অপরাধপ্রবণ ভবঘুরে হিসাবে দেখে এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ণ করে। ইংল্যাণ্ডে সপ্তম হেনরির রাজত্বকাল থেকেই এই ধরণের আইন প্রণয়ণ শুরু হয়। ষষ্ঠ এডওয়ার্ড আইন করেন যদি কেউ দেখতে পায় কোন ভবঘুরে কাজ না করে অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে যে দেখবে তার ক্রীতদাসে পরিণত হবে সেই ভবঘুরে। তখন ক্রীতদাসের মতই সেই লোককে ইচ্ছামত মারধোর করবে তার মালিক এবং যে কোন কাজ করতে বাধ্য করবে তাকে।

ঊণত্রিশতম অধ্যায় আছে পুঁজিবাদী কৃষকের কথা। জমি থেকে কৃষকদের বহুল পরিমাণে উচ্ছেদের ফলে সেই সব বিপুল পরিমাণ জমি সুবিধাবাদী ধনী লোকেরা দখল করে নেয়। তারপর জমিদার সেজে ক্ষেতমজুর নিযুক্ত করে সেই সব জমি চাষ আবাদ করে প্রচুর লাভ করতে থাকে। অনেকে আবার জমিদারের অধীনে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে এইভাবে চাষের কারবার করে পুঁজি সঞ্চয় করতে থাকে।

এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে একদল পুঁজিবাদী ক্ষেতমজুরদের ফাঁকি দিয়ে ধনী হয়ে উঠে।

ত্রিরিশতম অধ্যায়ে মার্কস দেখিয়েছেন শিল্পের উপর কৃষিবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া।

একত্রিশতম অধ্যায়ে লিখলেন শিল্পে পুঁজির ভূমিকা সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কথা। বর্তমান সমাজে দেশের বেশীরভাগ ধনসম্পদ চলে যাচ্ছে পুঁজিপতিদের কবলে। তারা ব্যবহৃত জমির জন্য খাজনা দিচ্ছে, কর দিচ্ছে, শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে, কিন্তু উৎপন্ন সম্পদের প্রায় সবটাই নিজেরা ভোগ করছে। ব্যবসা বাণিজ্য ও সুদে টাকা খাটিয়ে তারা পুঁজি বাড়াচ্ছে আর সেই পুঁজি শিল্পে নিয়োগ করছে।

সামন্তবাদী সমাজে একটা আইন পাশ করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল সুদে খাটিয়ে বা ব্যবসা বাণিজ্য করে সেই টাকা শিল্পে পুঁজি হিসাবে নিয়োগ করা চলবে না। সহরের গিল্ড সংস্থাগুলির জন্য এই ধরণের আইন পাশ করা হয়েছিল। কিন্তু সামন্তবাদেব অবসান ও গ্রাম্য কৃষিজীবীদের উচ্ছেদের ফলে এ আইন আর টিকল না। ফলে এখানে সেখানে অনেক ছোট বড় শিল্প গজিয়ে উঠল। অনেক ব্যবসায়ী পুঁজি ঢালতে লাগল শিল্পে।

এমন সময় সোনা ও রূপো আবিষ্কৃত হলো আমেরিকায়। আদিম অধিবাসীদের উচ্ছেদ শুরু হলো। আফ্রিকা ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠল। উপনিবেশ-গুলিকে শোষণ করে অনেক সম্পদ আনতে লাগল পূর্ব ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। ফলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার এক সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিল।

এই প্রসঙ্গে মার্কস উপনিবেশগুলির উপর যে জঘন্য অত্যাচার ও নির্মম শোষণ চালিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীরা, কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তার একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। ইউরোপের খৃষ্টধর্মাবলম্বী জাতিগুলি যে নির্মম নির্লজ্জ অত্যাচার চালায় বিজিতদের উপর, সভ্য জগতে কোথাও তার তুলনা মেলে না। সত্যিই তা বর্বরোচিত। সতের শতকের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পীঠস্থান ইংল্যাণ্ড ছিল অত্যাচার শঠতা ও নীচতার পরিপূর্ণ প্রতীক।

ভারতবর্ষে তখন চলেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকাল। রাজনৈতিক প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত ও চীনের চা ব্যবসায়ে লাভ করেছে একচেটিয়া প্রভুত্ব। ইউরোপে কাঁচা মাল পাঠাবার রপ্তানি ব্যবসাটাও হাত করেছে। তাছাড়া লবন, আফিম, পান, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কোম্পানির একচেটিয়া কর্তৃত্ব। এইভাবে কোম্পানির সুচতুর অফিসাররা দেশ-বাসীর সমস্ত ধন-সম্পদকে লুণ্ঠন করে পাঠাচ্ছে নিজেদের দেশে।

এইভাবে মার্কস দেখান উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদই হচ্ছে পুঁজিবাদের ভিত্তি। আমেরিকায় দাসপ্রথাকে ক্রমশঃ বাণিজ্যিক শোষণের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। ইউরোপের গরীব অল্প বেতনের শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মতই খাটানো হত। এইভাবে নগ্ন দাসপ্রথাকে এক পুঁজিবাদী শোষণের রক্তচোষা আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত।

এরপর বত্রিশতম অধ্যায়ে মার্কস পুঁজিসঞ্চয়ের ঐতিহাসিক প্রবৃত্তির কথা আলোচনা করেছেন। পুঁজি সঞ্চয়ের মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৃদ্ধি।

পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেন উপনিবেশবাদের আধুনিক তত্ত্ব। মার্কসের মতে রাষ্ট্রিক অর্থনীতিবিদরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাকে দুভাগে ভাগ করেছেন—ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা তৈরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর অপরের শ্রমের ফসলে তৈরি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু মার্কস বললেন, ব্যক্তিগত শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ব্যক্তিগত সম্পত্তির দিন আর নেই। সেদিন শেষ হয়েছে বলেই শুরু হয়েছে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণভিত্তিক সম্পত্তি সঞ্চয়ের যুগ।

তিনি আরও বলেছেন, আজ ইউরোপের পুঁজিপতিরা জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার গোটা ক্ষেত্রটাকেই দখল করে বসেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজিপতিদের এক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেখানে যে সব স্বাধীন শ্রমজীবী নিজের শ্রমের ফসল বা তা দিয়ে তৈরি সম্পত্তি ভোগ করে থাকে, বিদেশী পুঁজিপতিরা গিয়ে তাদের বেতনভোগী শ্রমিকে পরিণত করতে চাইল। তাদের পুরনো উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলোকেও জোর করে দখল করতে লাগল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতে নীল চাষের জন্য চাষীদের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অর্থগত পুঁজি ও উৎপাদনের কোন মূল্য থাকতে পারে না যদি না শ্রমিক পাওয়া যায়। শ্রমিক ছাড়া পুঁজির কোন দাম নেই। টাকার জন্য জীবিকার জন্য শ্রমিক তার সামাজিক উৎপাদনক্ষমতা বিক্রি না করলে

কোন কিছুই উৎপাদন করতে পারবে না পুঁজিপতিরা। আর পুঁজিও বাড়াতে পারবে না।

পুঁজি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তির মূল কথা হলো অর্থনৈতিক অসাম্য। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি সমান পরিমাণ পুঁজির মালিক হয় তাহলে কারো কোন পুঁজিসঞ্চয়ের প্রবৃত্তিই থাকবে না। বিভিন্ন দেশে কৃষি-জীবীদের ভূমি থেকে ব্যাপকভাবে উৎখাত করার পর থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার দিকে বেশী করে ঝুঁকছে পুঁজিপতিরা।

উপনিবেশগুলিতে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি ফেঁপে ওঠে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, শিল্পে যন্ত্রপ্রয়োগের দ্বারা বেকার বেতনভোগী শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এইভাবে শ্রমিকদের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, পুঁজিপতিদের উপর জীবিকার জন্য শ্রমিকদের অকুণ্ঠ নির্ভরতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেওয়া। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বেতনহার এমনভাবে নির্ধারিত হয় যাতে পুঁজিপতিরা ভালভাবেই শোষণ করতে পারে শ্রমিকদের।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই অশুভ জঘন্য বৈশিষ্ট্যটিকে মার্কস উপহাস করে বলেছেন, সৌন্দর্য। তিনি বলেছেন, "The great beauty of Capitalist production consists in this—that it not only constantly reproduces the wage worker as wage worker, but produces always, in proportion to the accumulation of Capital, a relative surplus population of wage workers. Thus the law of supply and demand of labour is kept in the right rute, the oscillation of wages is penned within limits satisfactory to Capitalist exploitation, and lastly, the social dependence of labourer on the Capitalist··"

সতেরো

দাস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচলেন মার্কস। দীর্ঘদিন অর্থনীতি নিয়ে নিরন্তর গবেষণার ফলে ক্লান্তি অনুভব করছিলেন মনে। শুধু মন নয় দেহটাও কম অবসন্ন হয়ে পড়েনি। অবসন্ন দেহ চাইছিল বিশ্রাম। ক্লান্ত মন চাইছিল বিক্ষিপ্তি অর্থাৎ একই প্রসঙ্গের সীমাবদ্ধ গভীরতা আর ভাল লাগছিল না। একঘেঁয়েমি হতে তাই নিস্তার পেতে চাইছিল বিক্ষুব্ধ মন, চলে যেতে চাইছিল প্রসঙ্গান্তরে।

তাছাড়া রাজনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতগুলিও কিছুদিন ধরে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল মার্কসের। কিন্তু কোন মনোযোগ দিতে পারেননি সেদিকে। এবার আর কোন বাধা নেই।

অর্থনৈতিক গবেষণার গভীর কূপ হতে মার্কস এবার চলে এলেন যেন নির্জন চিন্তার উদার আলোহাওয়াময় একটি দ্বীপের বেলাভূমিতে। সে দ্বীপের চারিদিকে এক বিরাট সমুদ্র। আন্তর্জাতিক রাজনীতির অজস্র ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে সে সমুদ্র সতত বিক্ষুব্ধ।

মার্কস প্রথমে ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন সেই নির্জন চিন্তার দ্বীপ থেকে। তারপর ভাল করে বুঝে মন্তব্য করতে লাগলেন সময় মত। ১৮৬৩ সালের পোল্যাণ্ডের অভ্যুত্থান এমনি একটি ঘটনা। ১৮৬৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এঙ্গেলসকে লিখলেন মার্কস, বিপ্লবের যুগ আবার শুরু হলো ইউরোপের ঘটনার গতি এখন ভালর দিকেই। তবে যে শিশুসুলভ উচ্ছাস আর আত্মপ্রতারণামূলক আনন্দের সঙ্গে আমরা ১৮৪৮ সালের পূর্বের বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলাম, এখন আর তা নেই। পুরনো কমারাও অনেকে মারা গেছেন। অনেককে লোভ দেখিয়ে হাত করেছে প্রতিবিপ্লবীরা। আজ আমরা বুঝতে পারছি, কোন কোন

বিপ্লবে মূঢ়তা কী বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। মূঢ়তা বা অকালপক্ক উদ্যম বা তৎপরতার জন্য কত বিপ্লব মাটি হয়ে যায়। এখন অবশ্য আশা হচ্ছে, বিপ্লবের লাভাস্রোত এবার পূব থেকে পশ্চিমদিকে বইবে, বিপরীত দিকে নয়।

পোল্যাণ্ডের বিদ্রোহ দমন করার জন্য প্রুশীয় সৈন্যবাহিনীকে নিযুক্ত করা হলে মার্কস বললেন, এবার আর আমাদের চুপ করে থাকা চলে না। এবার আমাদের এর প্রতিবাদ করা উচিত। শ্রমিকদের শিক্ষা সংস্থার পক্ষ থেকেও একটি ইস্তাহার জারি করা দরকার।

তারপর এঙ্গেলসকে বললেন, তুমি এই বিপ্লবের সামরিক দিকটি লেখ আর আমি লিখব এর রাজনৈতিক দিকটি।

পোল্যাণ্ডের বিপ্লব খুব একটা বেশীদূর এগোতে পারেনি। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে মার্কস যে বিপ্লবাদর্শের প্রচার তৎপরতা দেখান তার ফল হয়ে ওঠে সুদূরপ্রসারী। লণ্ডনের শ্রমিকশ্রেণী পোল্যাণ্ডের স্বপক্ষে এক ইস্তাহার লিখে এক প্রতিনিধিদলকে ফ্রান্সে পাঠায়। তখন ফরাসী শ্রমিকরা এক প্রতিনিধিদল পাঠায় লণ্ডনে এবং লণ্ডনের সেন্ট জেমস হলে পোল্যাণ্ডের সমর্থনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে সেন্ট মার্টিন হলে লণ্ডনের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংস্থার উদ্যোগে আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সময় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একজনকে মার্কসের কাছে পাঠানো হয়। জার্মান শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সভায় উপস্থিত থাকতে বলা হয় তাঁকে। মার্কস নিজে যান এবং ইকারিয়াস নামে একজন জার্মান শ্রমিককে বক্তা হিসাবে তুলে ধরেন সে সভায়। ফ্রান্স ইটালি ও ইংল্যাণ্ডের বহু শ্রমিক প্রতিনিধি যোগদান করেন সে সভায়। সভায় শ্রমিকদের ভিড়ও হয় প্রচুর। শ্রমিকদের মধ্যে নবজাগ্রত বৈপ্লবিক চেতনা দেখে খুশি হন মার্কস।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠিত হয় সে

সভায়। মার্কসও সে কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। কমিটির আদর্শ ও সংবিধান রচনার জন্য একটি সাব-কমিটিও গঠিত হয় মার্কসকে নিয়ে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য এই সাব-কমিটির কয়েকটি অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি তিনি।

মার্কস প্রচুর সম্ভাবনা দেখতে পেলেন এই কমিটির মধ্যে। তিনি দেখলেন এটি ক্রমশই এক বিরাট আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থায় পরিণত হচ্ছে। এই কমিটির সভাপতি হন লণ্ডনের ওডগার আর সহ সভাপতি নির্বাচিত হন জার্মান শ্রমিক ইকারিয়াস।

এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার জন্য সাংবিধানিক আইন কানুন সম্বলিত একটি আবেদনপত্র লেখার জন্য মার্কসের উপর ভার দেওয়া হয় এবং লণ্ডনে তাঁর বাসায় সাব কমিটির এক অধিবেশন হয়। পরে মার্কস যে আবেদনপত্রটি লেখেন তা বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। তাতে ১৮৪৫ সালের পর থেকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আন্দোলনে শ্রমিকদের ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনেক কথা সংক্ষেপে আলোচনা করেন মার্কস।

এইভাবে 'আন্তর্জাতিক' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়ে গেল আপনা থেকে। এভাবে এতবড় একটা কাজ সহজে সম্পন্ন হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি কেউ। যাই হোক, এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজে মার্কস দিলেন বুদ্ধিগত নেতৃত্ব, পোল্যাণ্ডের বিপ্লব যোগাল বাস্তব উপাদান আর শ্রমিকরা দিল আত্মিক প্রেরণা।

অনেকে বলেন, গুরুত্বের দিক থেকে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থার জন্য মার্কস যে আবেদনপত্রটি লেখেন তা সাম্যবাদী ইস্তাহারের পরেই তার স্থান। সাম্যবাদী ইস্তাহারের প্রত্যক্ষ ফল দেখা দেয় ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের মধ্যে। তারপর সতের বছর পার হয়ে গেছে। সারা বিশ্বে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আবেদনপত্রের প্রথমে মার্কস অভ্রান্ত প্রমাণ আর পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখালেন, এই সতের বছরের মধ্যে অতুলনীয় শিল্পোন্নতি ঘটেছে

বিভিন্ন দেশে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেহনতী মানুষের দুঃখকষ্ট এক বিন্দুও কমেনি। কারণ শিল্পোন্নতির ফলে যে জাতীয় সম্পদ বেড়েছে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হাতে।

বৃটিশ অর্থমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন এক বাজেট বক্তৃতায় বলেন, সম্পদ আর শক্তির আন্তর্জাতিক বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু সে বৃদ্ধি শুধু বিত্তবান শ্রেণীর হাতেই বদ্ধ আছে। এই বক্তৃতায় গ্ল্যাডস্টোন আরও বলেন, ইউরোপীয় ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে ইংল্যাণ্ড। কিন্তু শুধু ইংল্যাণ্ডেই নয়, ইউরোপের যেসব দেশে বৃহদায়তন শিল্পের প্রচুর উন্নতি ঘটেছে সেই সব দেশেও এ অবস্থা দেখা যাচ্ছে।

মার্কস বললেন, কোন কোন জায়গায় শ্রমিকদের মধ্যে একটি অতি ক্ষুদ্র অংশকে খুশি রাখার জন্য কিছু বেশী মাইনে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তেমনি জিনিষপত্রের দামও বেড়েছে। সর্বত্রই মেহনতী মানুষের এক বিরাট অংশ দুঃখ দারিদ্র্য আর অবমাননার এক গভীরতর স্তরে নেমে এসেছে আর ঠিক সেই সঙ্গে মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিত্তবান ধনিক শ্রেণীর লোকেরা উঠে গেছে সমাজের উপরতলায়। ইউরোপের সব দেশেই একথা অনস্বীকার্য যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু প্রয়োগ, কৃষি ও শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি, উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপনিবেশ স্থাপন, অবাধ বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাজারের বিস্তার—এর কোন কিছুই অথবা এইসব ঘটনাগুলি সমবেত হয়েও মেহনতী মানুষের দুঃখ ঘোচাতে পারছে না এবং পারবেও না। এমন কি শ্রমিকদের সৃষ্টিশীল শ্রমশক্তি যত বাড়ছে, সমাজে মালিক-শ্রমিকের উৎপাদনগত সম্পর্কও তত তিক্ত হয়ে উঠছে। এই অর্থনৈতিক উন্নতির যুগেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর মতো জায়গায় অনশন একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরপর মার্কস উনিশ শতকের পঞ্চ দশকের বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনগুলির ব্যর্থতার কথা বলেন। তিনি বলেন, একদিক দিয়ে

শ্রমিকরা ব্যর্থ হলেও অন্য দিক দিয়ে তারা লাভবান হয়েছে কিছুটা। তাদের আন্দোলনের ফলেই দশ ঘণ্টা বিল পাশ হয়েছে শ্রমিকদের কাজের সময়কালকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে। এর আগে মালিকরা ইচ্ছামত অনির্দিষ্ট কাল ধরে খাটাত শ্রমিকদের। এই আইন পাশ শুধু শ্রমিকদের জয় নয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রিক অর্থনীতির এক বিরাট পরাজয়ের পরিচায়ক হচ্ছে এ আইন।

আর একটা জিনিষ বোঝা গেছে, শ্রমিকরা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলি পেলে যে কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে। উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্র হতে পুঁজিবাদীদের একচেটিয়া প্রভুত্বের উচ্ছেদ করতে পারে।

শ্রমিকরা আর একটি প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ও ইটালির শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে একই সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তাদের পুনর্গঠিত করতে হবে।

শ্রমিকদের একটা বড় জিনিষ নিজেদের হাতে আছে। সেটা হচ্ছে সংখ্যাগত প্রাচুর্য। তারা সংখ্যায় অন্যান্য সব শ্রেণীর থেকে বেশী। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে যেতে পারছে ততক্ষণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার কোন দামই থাকবে না। এর আগে বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে, মেহনতী মানুষদের মধ্যে সহভ্রাতৃত্ববোধ না থাকার ফলে এবং তারা মিলে মিশে কাজ না করার ফলে বহু মুক্তি আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রতি-বিপ্লবীরা মাথা তুলে উঠেছে। সর্বহারা শ্রেণীর আশার কুসুম অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছে। আর এই কারণেই একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে সেদিন সেণ্ট মার্টিন হলের সভায়।

কিন্তু প্রতিকূল আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাঝে কেমন করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠবে বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা সেটাই হলো সমস্যা। বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর মধ্যে রয়েছে এক ঘৃণ্য চক্রান্ত। জারতন্ত্রী রুশ

সরকার যেভাবে পর্বতসুলভ এক সুকঠিন নির্মমতার সঙ্গে পোল্যাণ্ডের জনগণকে পশুর মত হত্যা করেছে তাতে বিশ্বের শ্রমিকদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। আর চুপ করে বসে না থেকে তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতির গভীরে প্রবেশ করা উচিত। তাদের আপন আপন দেশের সরকারের কূটনৈতিক ছলচাতুরিগুলি ভালভাবে লক্ষ্য করা উচিত। দরকার হলে বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে সরকারকে বাধা দেবে। সরকারের কাছে দাবী জানাবে কোন কারণে কোন দেশের মানুষের উপর কোন রকমের অন্যায় বা অবিচার করা চলবে না। যে ন্যায় ও নীতির সহজ নিয়মের দ্বারা সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয় সেই ন্যায় নীতির নিয়মের দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কও নিয়ন্ত্রিত হবে। এই ধরণের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতির জন্য শ্রমিকরা সংগ্রাম করবে। আর এই সংগ্রাম হবে তাদের মুক্তি আন্দোলনেরই এক অচ্ছেদ্য অংশ।

পরিশেষে সাম্যবাদী ইস্তাহারের মত এই আবেদনপত্রেরও শেষ কথা ছিল, "দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।"

এরপর বলা হয় নিয়ম কানুনের কথা। প্রথমেই বলা হয় মেহনতী মানুষের মুক্তিই হবে শ্রমিকদের একমাত্র লক্ষ্য। এই মুক্তির জন্য সংগ্রামই হবে তাদের একমাত্র কাজ। কিন্তু মুক্তি মানে এই নয় যে, সর্বহারা শ্রমিকরা শ্রেণীসংগ্রামে জয়ী হয়ে তারা নিজেরা কতকগুলি শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা পাবে। শ্রেণীগত শাসন বা সুযোগ সুবিধা নয়, সমস্ত শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনই হবে এ মুক্তির মূল কথা।

আসল কথা, সমস্ত শোষণ হতে অসাম্য হতে অর্থনৈতিক মুক্তিই হবে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামের মূল লক্ষ্য। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই পৌঁছতে হবে এই লক্ষ্যে। এই রাজনৈতিক আন্দোলনই ক্রমাগত সাফল্যের মধ্য দিয়ে একদিন পরিণত হবে চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রামে। এতদিন পর্যন্ত কোন দেশে এই ধরণের কোন আন্দোলন সফল হতে পারেনি কারণ শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।

শ্রমিকদের আজ মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার সব মেহনতী মানুষের জন্য সংগ্রাম একটি বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক বা জাতীয় কর্তব্য নয়, এটি একটি বিরাট সামাজিক কর্তব্য এবং এই কর্তব্য পালনের জন্য দরকার পৃথিবীর সব দেশের শ্রমিকদের অকুণ্ঠ ও পরিপূর্ণ সহযোগিতা।

এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রধান কার্যকরী ক্ষমতা ছিল জেনারেল কাউন্সিলের হাতে। এই কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল সব দেশেরই শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে। কাউন্সিলের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যাবলীর কথা পরস্পরকে জানানো। এক দেশের শ্রমিকদের অবস্থা অন্য দেশের শ্রমিকদের জানানোও অন্যতম কর্তব্য ছিল কাউন্সিলের। মাঝে মাঝে সাধারণ ভাবে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সাধারণ কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য সভা আহ্বান করতে হত কাউন্সিলকে এবং নিয়মিত ধারাবিবরণী প্রকাশ করতে হত।

এই জেনারেল কাউন্সিল প্রতি বছর একবার করে গঠিত হত সাধারণ সভা বা কংগ্রেসে। বছরে একবার করে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হত যে কোন দেশে এবং পরবর্তী অধিবেশনের স্থান ও সময় এই কংগ্রেসেই নির্ধারিত হত।

এইভাবে মার্কসের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার সাহায্যেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থাটি বড় হয়ে উঠল অল্প দিনের মধ্যেই। লেবনেখটের মতে সাম্যবাদী ইস্তাহারের মত এর প্রথম আবেদনপত্রটিতেও সাম্যবাদের অনেক মূল আদর্শ সংযোজিত করে দিয়েছিলেন মার্কস। সাম্যবাদী ইস্তাহারের সঙ্গে এর যা কিছু পার্থক্য তা শুধু আকারগত, গুণগত নয়।

মার্কস এঙ্গেলসকে বললেন, এখন সময় মত কাজ করতে হবে। এবং আমাদের অন্তরের দিক থেকে হতে হবে দুঃসাহসিক এবং দৃঢ়, কিন্তু আচরণের দিক থেকে হতে হবে নরম। আর আমাদের এই

আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য হবে, ইউরোপে ও আমেরিকার সংগ্রামী সর্বহারা শ্রেণীদের সংহত ও সংঘবদ্ধ করে এক বিশাল সেনা-বাহিনীতে পরিণত করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য এক সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করে যেতে হবে সব দেশের শ্রমিকদের।

মার্কস আরও বললেন, আমি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর জাগ্রত বুদ্ধি-বৃত্তি ও রাজনৈতিক চেতনাকে বিশ্বাস করি।

কিন্তু জার্মানীর লাসেলপন্থী শ্রমিকরা আন্তর্জাতিকের সভ্য ত হলোই না, উল্টো বরং বিরোধিতা করতে লাগল সাধ্যমত। অথচ কোন সংগত কারণ ছিল না এই বিরোধিতার। আন্তর্জাতিকের সংবিধানে স্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি আন্ত-র্জাতিকের সভ্য হলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে। শুধু তারা নিজেদের তৎপরতায় এক একটি সমবায় গড়ে তুলবে এবং এই সমবায়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের বিভিন্ন চাহিদা মেটাবে। এই সমবায়গুলি সরকারী সাহায্য নিয়ে জাতীয় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারে তারা। অনেকের মতে লাসেল নাকি আন্তর্জাতিকের জন্মের পর থেকেই তার ভক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বার্নহার্ড বেকার নামে এক ভদ্রলোকের অশুভ হস্তক্ষেপের ফলেই লাসেল পরিচালিত শ্রমিক প্রতিষ্ঠান ও সাময়িকী আন্তর্জাতিকের বিরোধিতা করতে থাকে।

যাই হোক, ধীরে ধীরে জার্মানী ও ফ্রান্সের বিরোধিতার অবসান ঘটল। তবে তারা জানিয়ে দিল আন্তর্জাতিকের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের সহানুভূতি থাকা সত্বেও সরকারের ভয়ে তারা সভ্য হতে পারবে না।

মার্কস ও এঙ্গেলস অবশ্য এ কথায় ক্ষুণ্ণ হলেন। তার উপর জার্মানীর শ্রমিকদের মুখপত্র সোজান ডেমোক্র্যাট পত্রিকার সম্পাদক স্কোয়েৎসার ও লেবনেখট অহেতুক বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ঘোরাল করে তুললেন ব্যাপারটাকে।

এই সময় দীর্ঘ ষোল বছর পর বাকুনিনের সঙ্গে দেখা হলো মার্কসের। ১৮৪৪ সালে ড্রেসডেন অভ্যুত্থানের সময় বাকুনিনের ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষ অষ্ট্রিয়ার কাছে তাঁকে সমর্পণ করে। পরে অষ্ট্রিয়া আবার রাশিয়ার কাছে সমর্পণ করে বাকুনিনকে। এর আগে দু তিনবার ফাঁসি হতে হতে হয়নি। রাশিয়া তাঁকে রেখেছিল সাইবেরিয়ার জেলে। সাইবেরিয়ার জেল থেকে পালিয়ে জাপান ও আমেরিকা হয়ে আবার ইউরোপে আসেন বাকুনিন। লণ্ডনে আসেন ১৮৬৩ সালে।

বাকুনিন একজন আপোষহীন বিপ্লবী হলেও তিনি প্রথমে ছিলেন মার্কসের কড়া সমালোচক। তাঁর ধারণা ছিল তাঁকে যাঁরা সহ্য করতে পারেন না অথবা তাঁর নিন্দা করে বেড়ান মার্কস তাঁদের অন্যতম। তাঁর আর একটা মিথ্যা ধারণা ছিল মার্কস সম্বন্ধে। নির্বাসনকালে তাঁর মনে হত, মার্কস লণ্ডনে খুব সুখে আছেন। বাকুনিন একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হলেও তাঁর মেজাজটা ছিল উগ্র, তিনি কোন কথা ভালভাবে বুঝিয়ে বলতে পারতেন না কাউকে। ফলে তাঁর নীতি ও কার্যসূচী সম্বন্ধে সংশয় জাগত অনেকের মনে। অনেকেই ভাবতেন, বাকুনিন হয়ত অবশেষে আপোষ করেছেন সরকারের সঙ্গে। তা না করলে ফাঁসির হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও কোন রহস্যময় কারণে তাঁকে ছেড়ে দেয় তারা? তাই অবশেষে অনেক দেশ ঘুরে লণ্ডনে যখন এসে উঠলেন বাকুনিন তখন অনেকেই বলাবলি করতে লাগল, বাকুনিন এসেছে রাশিয়ার চর হয়ে।

অবশ্য এই অহেতুক সংশয়ের মধ্যে কোন যুক্তি ছিল না এবং এতে বাকুনিন খুব রেগে যান। কথাটা মার্কসের কানে যেতেই ব্যাপারটাকে সহজ করে দিলেন তিনি। বাকুনিন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তিনি সুইডেনে গিয়ে রুশ বিপ্লবের জন্য কাজ করে যাবেন। বাকুনিন আরও বললেন, যারা আমায় রাশিয়ার চর বলে তাদের কথার জবাব আমি খবরের কাগজে লিখে জানাব, তাদের কথার জবাব দেব আমি শুধু হাতে করে; তারা যেন তাদের আসল নাম জানায়।

মার্কস বুঝতে পারলেন বাকুনিন একজন সত্যি সত্যিই ভাল কর্মী এবং বিপ্লবী। সুইডেন থেকে ফিরে এসে বাকুনিন ইটালি যাবার উদ্যোগ করতেই নিজে থেকে গিয়ে দেখা করলেন বাকুনিনের সঙ্গে। সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করে এক মুহূর্তে আপন করে নিলেন তাঁকে।

বাকুনিন মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন, আন্তর্জাতিকের সাফল্যের পিছনে আছে মার্কসের বিরাট কৃতিত্ব। আবেদনপত্রের নামে তাঁর লেখা ইস্তাহারটি আমি পড়েছি। এর সুচিন্তিত কথাগুলি সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থবোধক।

১৮৬৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে এঙ্গেলসের কাছে লেখা একটি চিঠিতে মার্কসও বাকুনিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তাতে তিনি বলেন, আজই ইটালি গেলেন বাকুনিন। গতকাল আমি দেখা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে। আগের থেকে তাঁকে এখন খুব ভাল লাগল। তিনি বললেন পোল্যাণ্ডের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাবেন সব সময়।

অবশ্য বাকুনিনের বিপ্লবাদর্শ মার্কসের বিপ্লবাদর্শ থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাকুনিন ছিলেন জাতিতে শ্লাভ। তাই তিনি চেয়েছিলেন জার্মানীর আধিপত্য থেকে শ্লাভজাতিগুলির মুক্তি। তিনি চেয়েছিলেন রাশিয়া, প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, তুর্কি প্রভৃতি দেশের সরকারগুলির পতন।

তিনি চেয়েছিলেন, সমাজের নিচেরতলার মানুষেরা স্বাধীনভাবে সংগ্রাম করে নিজেদের মুক্তি নিজেরাই রচনা করে নেবে। কোন প্রভুত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নয়, সে প্রতিষ্ঠান যতই বিপ্লবী হোক না কেন।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে বড় শ্রদ্ধা করতেন মার্কস। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় লিঙ্কনের সমর্থনে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে এক প্রবল আন্দোলন শুরু করেন তিনি। এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি এজন্য ঐক্যবদ্ধভাবে

লড়াই শুরু করে। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে লিঙ্কনের প্রতি সরকারী সমর্থনও আদায় করে।

তখনকার দিনের বৃটিশ সরকার ভাবত জনমত বলতে বোঝায় অভিজাত সম্প্রদায় আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত। কিন্তু মার্কস দেখিয়ে দিলেন নবজাগ্রত ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর এই মতকে একেবারে উল্টে দিতে পারে যে কোন মুহূর্তে।

মার্কস বললেন, লিঙ্কন হচ্ছেন দুনিয়ার শ্রমিকদের বন্ধু। সুতরাং তাঁর বিপদের দিনে পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রমিকদের সমর্থন করা উচিত তাঁকে। ১৮৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটি ভাষণে লিঙ্কন একবার বলেন, শ্রম আগে, মূলধন পরে। মূলধন হচ্ছে শ্রমেরই ফল। শ্রম মূলধনের উপর নির্ভরশীল নয়, শ্রম সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। শ্রম না হলে মূলধনের কোন অস্তিত্বই থাকত না। সুতরাং শ্রমের দিকেই বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।

Labour is prior to and independent of Capital. Capital is the only fruit of labour, or could never have esisted if labour had not first exsisted. Labour is superior of Capital and deserves much the higher consideration.

মূলধনকে শ্রমের ফল বলে এবং শ্রমের উপর নির্ভরশীল বলে নিম্নশর্তভাবে ঘোষণা করেন লিঙ্কন। মার্কস তাই লিঙ্কনকে বলতেন, এক মরনশীল শ্রমিকসন্তান। গরীব ঘরের ছেলে ছোট থেকে বড় হয়েছিলেন লিঙ্কন। নিজে হাতে কলমে শ্রমের মর্ম বুঝতেন বলেই হয়ত শ্রমিকদের প্রতি এতখানি দরদ ছিল। এইজন্যই হয়ত সাধারণ মানুষের এত বড় বন্ধু হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি।

১৯৬৪ সালেও ঠিক এমনি করে পোল্যাণ্ডের নিপীড়িত বিপ্লবী জনগণের সমর্থনে ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীকে উত্তেজিত ও সংহত করেন মার্কস।

ইণ্টারন্যাশানাল বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার কাজ তখন এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড লেখার কাজ তখনও শেষ হয়নি। তার উপর দৈনন্দিন সংসার খরচের জন্য পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হত। তবু তার মাঝেই ইণ্টারন্যাশনালের জন্য অনেক খাটতে হত মার্কসকে। অনেক কথা ভাবতে হত তাঁকে।

এই ইণ্টারন্যাশনালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে চাইছিলেন মার্কস। আর সেই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গগুলোকে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন সারা বিশ্বের দেশে দেশে। এই সংস্থার সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় সম্মানিত ও চিন্তাশীল সদস্য ছিলেন মার্কস।

ইণ্টারন্যাশনালের জেনারেল কাউন্সিলের প্রতিটি সভায় উপস্থিত থাকতেন মার্কস আর প্রতিটি সদস্যের বক্তৃতা শুনে যেতেন গভীর আগ্রহের সঙ্গে। ১৮৬৫ সালের এমনি এক সভায় অন্যতম সদস্য ওয়েস্টন শ্রমিক ধর্মঘট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। আর তা শুনে যাচ্ছিলেন মার্কস।

১৮৬৫ সালের প্রথম দিকে শ্রমিক ধর্মঘট মহামারী রোগের মত ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের সমগ্র দেশে। ওয়েস্টনের বক্তব্য ছিল এই যে, উৎপাদনের পরিমাণের দ্বারা নিধারিত হয় বেতনের হার। সুতরাং উৎপাদন হার বেশী না হলে বেতনের হার কখনও বাড়তে পারে না। তাই ওয়েস্টনের মতে এখন শ্রমিকদের বেতন বাড়ানোর জন্য ধর্মঘট করা নির্বুদ্ধিতার কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ উৎপাদনের পরিমান না বাড়লেও বেতন যদি বাড়ে অর্থাৎ বেতন বাড়ানোর আন্দোলন আপাততঃ জয়ী হয় তাহলে দুদিন পরেই দেখা দেবে তার চরম প্রতিক্রিয়া।

ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত ওয়েস্টনের সব কথা শুনে গেলেন মার্কস। ওয়েস্টনের যুক্তি অবান্তর এবং অসার হলেও তা শুনে গেলেন শেষ পর্যন্ত। পরে তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করলেন অকাট্য পাল্টা

যুক্তি দিয়ে। কিন্তু মার্কসের এই প্রতিবাদ বলিষ্ঠ ও অখণ্ডনীয় হলেও তা নির্মম হয়ে ওঠেনি কখনও। ওয়েস্টনের বক্তব্য অসার হলেও এক গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কথাগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখান মার্কস। সেই রাত্রিতেই বাড়ি ফিরে বেতন, মূল্য ও মুনাফা সম্বন্ধে তাঁর কথাগুলিকে গুছিয়ে ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন।

পরে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের আকারে সাজিয়ে এই রচনাটিকে জেনারেল কাউন্সিলের সভায় পাঠ করেন মার্কস। সদস্যরা শুনে খুশি হয়ে প্রবন্ধটিকে ইণ্টারন্যাশনালের সাধারণ কংগ্রেসে উপস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত করেন।

দিনেতে সময় কম। তাই রাত্রি থেকে সময় চুরি করতে হত। নিজেকেই আঘাত হানতে হত নিজেরই বিশ্রামের সময়কে। এই সময় ক্যাপিটালের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার জন্য প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে পরিশ্রম করতে হত তাঁকে। ফলে শরীর আবার ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

ডাক্তার বিশ্রাম নেবার পরামর্শ দিলেন। এই সময় মার্কস মার্গেট নামক একটি জায়গায় গিয়ে জল হাওয়ার পরিবর্তনের জন্য বাস করেন কিছুদিন। এখানে থাকার সময় নৌবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে মার্কসের। মত ও পথের শত পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি অসম স্তরের মানুষ আশ্চর্যভাবে কাছে এসে যায় দুজনে দুজনের। স্থানীয় পরিবেশ ও মানুষ, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অতীত জীবনের উপর কত প্রশ্ন চলে। চলে আলোচনার পর আলোচনা, গল্পের পর গল্প।

মার্কসের অনন্ত জ্ঞানপিপাসা আর কৌতূহল দেখে অবাক হয়ে যান সেই অফিসার ভদ্রলোক। মার্কস যখন তাঁকে নৌবাহিনী সম্পর্কে শিশুর মত কোন প্রশ্ন করতেন অথবা দুজনে বেড়াতে বেড়াতে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে জার্মান বা ইংরাজি ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে দিতেন অথবা সমুদ্রের বেলাভূমিতে শিশুদের

গড়াগড়ি দিতে দেখে নিজেই শিশুর মত হেসে উঠতেন তখন তাঁকে যে কেউ দেখত অবাক হয়ে যেত। বুঝে উঠতে পারত না কি করে এই মানুষটি ক্যাপিটালের মত অর্থনীতির বই লেখেন, রাষ্ট্রনীতি নিয়ে চিন্তা করেন, কেমন করে তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন।

১৮৬৬ সালের প্রথম থেকেই মার্কসের স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। কিন্তু মার্গেটে কিছুদিন থাকার পর এপ্রিলের মাঝামাঝি বাড়ি ফিরে অনেকখানি সুফল পান মার্কস। বেশ কিছুটা উন্নতি হয় তাঁর স্বাস্থ্যের।

স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো বটে, কিন্তু অসুস্থতা ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য খরচ হয়ে গেল অনেক। তাছাড়া কাজেরও অনেক কামাই হয়েছে। টাকার অভাব এত তীব্র হয়ে ওঠে যে মার্কস জার্মানীতে কুগেলম্যানের কাছে এক হাজার টাকা ধার চেয়ে একখানি চিঠি লেখেন।

এর আগেও কুগেলম্যানের কাছে একখানি চিঠি লেখেন মার্কস। কিন্তু চিঠিখানি পৌছতে দেরি হওয়ার জন্য মার্কস সন্দেহ করেন হয়ত বা সে চিঠি প্রুশীয় সরকারের হাতে পড়েছে। হয়ত বিসমার্ক তা পেয়ে তাঁর অভাবের সুযোগ নিয়ে তাঁকে নতুন করে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছেন। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে একটি চিঠিতে মার্কস লেখেন, আমার এই চিঠিখানির হারানোর ব্যাপারটি সত্যিই দুঃখজনক। কারণ আমি চাই না বিসমার্ক আমার ব্যক্তিগত কথা জানুক। যদি তিনি আমার রাজনৈতিক মতামত জানতে চান তাহলে তিনি আমাকে সরাসরি লিখতে পারেন তার জন্য, এবং আমি তা তাঁকে জানিয়ে দেব।

মার্কসের এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। কারণ এর আগের বছর লোথার বুচার নামে বিসমার্কের বিশ্বস্ত তাঁবেদার মার্কসকে বিসমার্কের সরকারী মুখপত্রে নিয়মিত লেখার জন্য অনুরোধ করেন।

বুচার লেখেন, শ্রদ্ধেয় ডক্টর। আগেই কাজের কথা হোক। আমাদের সরকারী কাগজ স্তাৎস আঞ্জেইজার আপনার কাছ থেকে নিয়মিত অর্থনৈতিক বিবরণ পেতে চায়, অর্থের বাজার এবং উৎপাদনের বাজার সম্বন্ধে আপনার লেখা পেলে খুব ভাল হয়। আমাকে এ বিষয়ে কোন একজনের নাম সুপারিশ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। আমার মতে আপনিই হচ্ছেন এবিষয়ে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। তাই আপনার কাছেই আবেদন জানাচ্ছি।

আঠারো

শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের বার্ন সম্মেলনে অদ্ভুত এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন বাকুনিন। প্রস্তাব করলেন লীগ মার্কসের ইণ্টার-ন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক। আরও বললেন, বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে লীগকে। আর ফাঁকি দিয়ে সময় কাটালে চলবে না। কাজের কাজ কিছু করতে হবে।

কিন্তু লীগ তখন বাকুনিনের কথামত না চলায় তার সদস্যপদ ত্যাগ করলেন বাকুনিন। বাকুনিন তারপর সমাজ বিপ্লবী সঙ্ঘ বা সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রের এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তুললেন। তিনি ভাবলেন আপাতত এই সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার অংশ হয়েই কাজ করবে। পরে দুটো মিলে মিশে এক হয়ে যাবে।

মার্কসকে কোনদিনই ঠিকমত বুঝতে পারেননি বাকুনিন। ঠিকমত বুঝতে পারেননি বলেই হয়ত মানতে পারেননি তাঁর মতবাদকে। অথবা এমনও হতে পারে বিপ্লবী হয়েও বাকুনিন আসলে ছিলেন ব্যক্তিত্ববাদী। তাই সাম্যবাদকে সহ্য করতে পারেননি কখনও। বার্ন সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন, তিনি সাম্যবাদকে ঘৃণা করেন। কারণ

সাম্যবাদে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান নেই। মানুষের সব ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে চলে যাবে এটাও চাইতেন না বাকুনিন। তিনি বলতেন স্বাধীন মেলামেশার মধ্য দিয়ে মানুষ এমন এক সমষ্টিগত জীবন যাপন করবে যাতে স্বার্থপরতার কোন স্থান থাকবে না, যাতে দরকারের সময় একে অন্যের সম্পত্তির স্বত্ব ভোগ করতে পারবে।

কিন্তু মার্কসীয় সাম্যবাদের মূল কথাটা ধরতে পারলে বাকুনিন বুঝতে পারতেন, কোন মানুষের আসল মুক্তি তার অবাধ অফুরন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতায় নেই। বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে নিঃশেষিত, একাত্মতাবোধের মাঝেই আছে প্রকৃত মুক্তি। সাম্য ও সমষ্টিগত জীবনের মহান আস্বাদ লাভের মধ্যেই আছে মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা।

অনেকে আবার বলেন বাকুনিনের স্থান হচ্ছে মার্কস ও প্রুধোঁর মাঝখানে। এ বিষয়ে ফ্রাঁৎস মেহরিং বলেছেন, প্রুধোঁকে ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছেন বাকুনিন। কিন্তু মার্কসের স্তরে পৌঁছতে পারেননি তিনি। সেদিনকার ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনেকখানি আত্মসাৎ করেছিলেন বাকুনিন। প্রুধোঁর থেকে তিনি মার্কসকেও কিছুটা বেশী বুঝতেন। কিন্তু মার্কসের মত অত গভীরভাবে তিনি জার্মান দর্শন বুঝতেন না। তাছাড়া মার্কসের মত তিনি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে যে সব শ্রেণীসংগ্রাম চলছিল সেগুলি বোঝারও কোন চেষ্টা করেননি। প্রুধোঁ যেমন প্রকৃতি বিজ্ঞান বুঝতেন না বাকুনিন তেমনি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বুঝতেন না।

কিন্তু সে যাই হোক, বাকুনিন ছিলেন মনে প্রাণে বিপ্লবী। কিন্তু মার্কসের সঙ্গে তাঁর বিপ্লব দর্শনের তফাৎ ছিল এই যে, মার্কস বলতেন, বৈপ্লবিক সংগ্রামের একমাত্র হাতিয়ার হবে মেহনতী মানুষ সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি উন্নত ধরণের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দেশগুলিতে এর প্রমাণ নিজের চোখে দেখেছিলেন

মার্কস। মার্কসীয় বিপ্লবের আদর্শ তাই বেশ তখন প্রভাব বিস্তারও করে সেই সব দেশে।

কিন্তু বাকুনিনের মনটা যেন ঠিক প্রাক পুঁজিবাদের যুগেই রয়ে গিয়েছিল। তিনি শ্রমিক শ্রেণীর কোন গুরুত্বকে স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন বিপ্লব আনবে দেশের যুবক আর চাষী সম্প্রদায়। স্পেন, ইটালি ও রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বাকুনিনের প্রভাব।

তাছাড়া আর একটা পার্থক্য ছিল দুজনের মতবাদে। বাকুনিন বলতেন, মানুষই ইতিহাসের নায়ক। তার ক্রমাগত এগিয়ে চলার পথে পুরনো সমাজব্যবস্থা যখন শৃংখলের মত তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তখন সে শৃংখলকে ভেঙ্গে ফেলতে হয়। তখন পুরনো সমাজকে ভেঙ্গে ফেলে মানুষই নতুন সমাজ গড়ে তোলে। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

কিন্তু বাকুনিনের মত অতখানি আদর্শবাদী ছিলেন না মার্কস। মার্কস বলতেন, মানুষ ইতিহাসের নিয়ামক নয়; মানুষ ইতিহাসের উপাদানমাত্র। ইতিহাসের বাস্তব অবস্থার দাস হচ্ছে মানুষ। কিন্তু সেই বাস্তব অবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি স্ববিরোধিতা আছে, এমন কতকগুলি অপরিপূর্ণতা আছে যা মানুষকে প্রথমে বিতৃষ্ণ ও পরে বিদ্রোহী করে তোলে। কিন্তু সেই পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল বাস্তব অবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য যে সমাজবিপ্লবের দরকার তার জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয় মানুষকে।

বাকুনিনের সমাজবিপ্লবী সঙ্ঘের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন মার্কস। মার্কসের নির্দেশমত ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিকের প্রধান পরিষদ জানিয়ে দিল, আন্তর্জাতিকের মধ্যে স্থান হবে না সঙ্ঘের।

তবে সঙ্ঘের জেনেভা শাখাকে আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হলো। তবু বাকুনিনকে বিশ্বাস করতে পারলেন না মার্কস ও

এঙ্গেলস। তাঁরা জানতেন বাকুনিন শুধু ভাঙ্গতে জানেন, বড় রকমের একটা কিছু গড়তে হলে যে শৃংখলাবোধ মেনে চলতে হয় তা কখনই সইবে না বাকুনিনের ধাতে। তাঁরা ভাবলেন, এই জেনেভা শাখার মাধ্যমেই বাকুনিন হয়ত তাঁর নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবেন আন্তর্জাতিকের মধ্যে। তারপর ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

তাছাড়া তাঁদের কর্মসূচী কখনই মেনে চলতে পারবেন না ভাবুক 'বাকুনিন।

মার্কস তাঁদের আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী বিশ্লেষণ করে বললেন, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা হতেই শ্রমিকদের মনোভাব গড়ে ওঠে। সুতরাং এমন এক অর্থনীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে যা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার অনুকূল হয়, যা তাদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেবে অনেক পরিমাণে। প্রথমতঃ শ্রমিকরা যাতে তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারে তার জন্য শ্রেণী সচেতন করে তুলতে হবে তাদের।

কিন্তু বাকুনিন তাঁর বিপ্লবী সঙ্ঘ বা সমাজতান্ত্রিক জোটের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তাতে একেবারে তিনি প্রথমকে বাদ দিয়ে শেষ থেকেই শুরু করেছেন। শিক্ষাগত প্রস্তুতি বা যোগ্যতার কথা না ভেবেই এই মুহূর্তেই বিপ্লব শুরু করতে চান বাকুনিন।

অবশেষে হলোও ঠিক তাই। অর্থাৎ বাকুনিন সম্বন্ধে যা ভেবেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস, অক্ষরে অক্ষরে তা ফলে গেল। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে কিছু শ্রমিককে নিয়ে বিপ্লবের কাজ সুরু করে দিলেন বাকুনিন। সেখানে 'ইগ্যালিতে' বা সাম্য নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করলেন।

শুধু তাই নয়, বাকুনিনের বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা সুদূর ইংল্যাণ্ডেও গিয়ে পৌঁছল। আবার শুধু পৌঁছল না, প্রভাবও বিস্তার করল কিছুটা। তখন ১৮৬৯ সালের মাঝামাঝি। তখন অনেকেরই মনে হলো, আন্তর্জাতিকের মধ্যে বাকুনিনের দলকে স্থান না দিয়ে ভুল

করা হয়েছে। আন্তর্জাতিকের মধ্যে স্থান না পেয়ে বাকুনিন একাই স্বতন্ত্রভাবে শুরু করে দিয়েছেন বৈপ্লবিক আন্দোলনের কাজ। তাঁরা ভাবলেন, বাকুনিনের বৈপ্লবিক উদ্যমের গুরুত্বটাকে ঠিকমত হয়ত বুঝতে পারেননি মার্কস ও এঙ্গেলস।

ফলে ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকের কিছু সদস্য সমর্থন করলেন বাকুনিনকে।

এই কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে লেবনেখটের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধে বাকুনিনের। এক বছর আগে লেবনেখট জার্মানীর লিপজিগ হতে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত একটি পত্রিকায় বাকুনিনকে জারের বেতনভোগী রাশিয়ার চর বলে অভিহিত করেছিলেন। আজ দুজনে মুখোমুখি হওয়ায় সেই ব্যাপারটার চূড়ান্ত বোঝাপড়া করতে চাইলেন বাকুনিন।

কেউ কেউ বললেন, ১৮৫১ সালে বাকুনিন যখন রাশিয়ার সেণ্ট পীটার ও সেণ্ট পল দুর্গে অবরুদ্ধ ছিলেন তখন নাকি মুক্তির আশায় এক স্বীকারোক্তি পত্রে সই করে জার নিকোলাসের কাছে তা পাঠিয়ে দেন। কিন্তু জার তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁর বন্দীর আদেশই বহাল রাখেন। জারের মৃত্যুর পর বাকুনিনকে সাইবেরিয়া পাঠানো হয় আংশিক মুক্তি দিয়ে।

কিন্তু মুক্তিলাভের পরেও অত্যন্ত লজ্জা ও ভয় অনুভব করতে থাকেন বাকুনিন। তাঁর কেবলি চিন্তা হতে থাকে তাঁর স্বীকারোক্তির কথাটা ফাঁস হয়ে যাবে। তাঁর মত বিপ্লবী জারের কাছে নতি স্বীকার করেছেন মুক্তির লোভে, এটা সত্যই নিন্দার কথা।

বাকুনিনের প্রতিপক্ষরা যাঁরা তাঁর মতবাদকে পছন্দ করতেন না তাঁরা সত্যিসত্যিই কিন্তু সে স্বীকারোক্তির কথার কিছুই জানতেন না। তবু সব সময় ভয় করতেন বাকুনিন। ভাবতেন, এই বুঝি বা ফাঁস হয়ে গেল কথাটা। তাই একটুতেই রেগে যেতেন, চটে যেতেন। সবাইকে অবিশ্বাস করতেন। জারের গুপ্তচরেরা অবশ্য ভয় দেখাত

তাঁকে মাঝে মাঝে, রাশিয়ায় গিয়ে কোনরকম আন্দোলন শুরু করলেই তাঁর স্বীকারোক্তি পত্রটি প্রকাশ করে দেওয়া হবে। অবশেষে ইটালি ও স্টকহলমে সত্যিসত্যিই একদিন তা ফাঁস করে দেওয়া হয়।

বারবার মতভেদ সত্ত্বেও বাকুনিন বিশ্বাস করতেন না মার্কসের মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের খুব একটা পার্থক্য আছে। তিনি একখানি চিঠিতে দুজনের মতপার্থক্যটিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মার্কস একজন কেন্দ্রীয় শক্তি বা কর্তৃত্ববাদী কমিউনিষ্ট। তিনি চান পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য। তিনি এ সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চান রাষ্ট্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা স্বৈরতন্ত্রী এক অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে। কিন্তু তাহলে তাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কোন জিনিষ থাকবে না। তাঁর অর্থনৈতিক আদর্শ হলো, রাষ্ট্রের হাতে দেশের সব পুঁজি ও সম্পত্তির মালিকানা। রাষ্ট্রই বেতনভোগী চাষীদের দিয়ে সব জমি দখল করবে। রাষ্ট্রই সরকারী এঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে সব কলকারখানা চালাবে। রাষ্ট্রের হাতেই সব পুঁজি থাকবে।

আমরাও চাই এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য। কিন্তু তার আগে আমরা চাই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও দেশের প্রচলিত আইন কানুনের বিলোপ সাধন। কারণ আমরা মনে করি কোন রাষ্ট্র যে প্রভুত্বমূলক আইনকানুনের প্রণয়ণ করে তা মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। আমরা চাই সমাজের পুনর্গঠন আর মানব-জাতির ঐক্য। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে সমাজের এই পুণর্গঠন কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রের জোয়াল থেকে মুক্ত বিভিন্ন শ্রমিকসংস্থা অবাধ মেলামেশার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলবে নিজেদের মনোমত সমাজ।

কিন্তু তাঁর সমাজবিপ্লবের এই আদর্শ কিভাবে পূরণ করা হবে, সে বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা দেখাননি বাকুনিন।

১৮৭০ সালের গোটা প্রথমার্ধটা কেটে গেল মার্কসের বাকুনিনের

সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে। বাকুনিনের, এ্যালায়েন্স আর তাঁর ইণ্টার-ন্যাশনালের মধ্যে বোঝাপড়ার কোন সূত্র খুঁজে বার করা যায় কি না তা দেখতেও অনেক সময় কেটে গেল।

কিন্তু তবু কোন সুফল ফলেনি। ভাঙ্গন ধরল দুটোর মধ্যে। এপ্রিল মাসে সদস্যদের মধ্যে গুরুতর মতভেদের জন্য বাকুনিনের এ্যালায়েন্স বা সমাজবিপ্লবী সঙ্ঘ ভেঙ্গে যায়।

ওদিকে ১৮৭০ সালের আন্তর্জাতিকের বার্ষিক সম্মেলন ডাকার কথা ছিল প্যারিসে। কিন্তু বোনাপার্টের পুলিস সদস্যদের ধরপাকড় করে পীড়ন করতে থাকায় অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। পরে ঠিক হয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সেপ্টেম্বর মাসে মেইৎসে।

কিন্তু তার আগেই অর্থাৎ ১৮৭০ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে। ২৩শে জুলাই তারিখে আন্তর্জাতিকের সাধারণ সংসদের মাধ্যমে এক বিবৃতি প্রচার করে মার্কস এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন। এই যুদ্ধে আন্তর্জাতিকের কর্তব্য কি হবে সে কথাও বলে দিলেন। এই যুদ্ধের জন্য প্রুশিয়াকেই দায়ী করলেন মার্কস।

মার্কস বললেন, এ যুদ্ধ হচ্ছে ১৮৬৬ সালের যুদ্ধেরই পরিণাম। ১৮৫১ সালের সামরিক শাসনেরই পরিশোধিত এক সংস্করণ। এ যুদ্ধ জার্মানীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ যুদ্ধে তাদের ভূমিকা হচ্ছে প্রতিরক্ষার ভূমিকা। লুই বোনাপার্টি হচ্ছেন আক্রমণকারী। কিন্তু প্রুশিয়াই লুই বোনার্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এ যুদ্ধে নামিয়েছে তাঁকে। এ যুদ্ধ হচ্ছে লুই বোনাপার্টের সঙ্গে বিসমার্কের জঘন্য ষড়যন্ত্রেরই ফল। কিন্তু প্রুশিয়া কি ভেবে দেখেছে, জার্মানী জয়ী হলে কিভাবে সে স্বাধীন জার্মানীকে রুখবে।

যে কোন যুদ্ধেই দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। কিন্তু মার্কসের আগে আর কোন 'চিন্তাশীল এ ভূমিকার কথা স্বীকার করেননি। সাধারণতঃ মনে হয় যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায়। যুদ্ধ হয়

রাষ্ট্রশাসকদের মধ্যে। মনে হবে, সে যুদ্ধে শ্রমিকদের কোন ভূমিকা নেই। রাজা বা রাষ্ট্রনায়করা হুকুম দেবে, পরিকল্পনা করবে, সৈন্যরা যুদ্ধ করবে আর শ্রমিকরা কাঠের পুতুলের মত তা দূর থেকে দেখবে অথবা যন্ত্রের মত শুধু সাহায্য করে যাবে সৈন্যদের।

কিন্তু মার্কস বললেন, যে কোন যুদ্ধেই শ্রমিক শ্রেণীর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। যে কোন যুদ্ধের মধ্যে একটি সাম্রাজ্যবাদী দিক আছে আর সামাজতন্ত্রবাদী শ্রমিকশ্রেণী যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্য-বাদীদের আগ্রাসী মনোভাবকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করবে। যখনি কোন দেশ অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করবে তখন আক্রমণ-কারী দেশের প্রতি তাদের সব সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে শ্রমিকশ্রেণী। তারা শুধু আক্রান্ত বা নিপীড়িত দেশকে নীতিগত ও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। আক্রান্ত দেশের শ্রমিকরা শুধু প্রতিরক্ষার খাতিরেই যুদ্ধ করবে।

১৮৭০ সালের ফরাসী-জার্মান যুদ্ধের সময়েও মার্কস এই কথাই বললেন। তিনি বললেন, জার্মান শ্রমিকরা যেন ভুলে না যায় এ যুদ্ধ ফরাসী জনগণের বিরুদ্ধে নয়। তারা শুধু প্রতিরক্ষার খাতিরেই যুদ্ধ করছে। সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করবার জন্যই লড়াই করে যাচ্ছে, একথা যদি তারা ভুলে যায়, যদি তারা ফরাসী রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী জনগণের প্রতিও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে তাহলে জয় বা পরাজয় যাই হোক না কেন তার ফল হবে ভয়ঙ্কর।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আর একটি আবেদন প্রচার করলেন মার্কস। এ আবেদন প্রচারিত হয় ফ্রান্স ও জার্মানীর মাঝখানে সীমারেখা নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যাপারে। মার্কস বললেন, আনসাফ-লোরেনের উপর জার্মানীর কোন ঐতিহাসিক দা বিনেই। যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষাগত দিক থেকে জায়গাটা তাদের সুবিধাজনক ; সুতরাং যে জায়গার উপর তাদের ষোল আনা দাবি, সেটা কখনও যুক্তির কথা নয়। সামরিক

স্বার্থের দ্বারা কখনও কোন দেশের সীমারেখা নির্ধারিত হতে পারে না। কারণ সামরিক স্বার্থের কখনও কোন শেষ নেই। সামরিক স্বার্থের দিক থেকে উত্থাপিত দাবির কখনও শেষ থাকতে পারে না। এ দাবি সাধারণতঃ বিজেতারা চাপিয়ে দেয় বিজিতদের উপর। একটি ভূখণ্ড পেয়ে গেলেই তারা দাবি করে বসে আর একটি ভূখণ্ড।

যুদ্ধের সময় জার্মান সরকারকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন মার্কস। তিনি সরকারকে জানিয়ে দিলেন, জার্মান শ্রমিকদের ত্যাগ ও দুঃখবরণ যেন বৃথা না হয়। যুদ্ধের পর তাদের কথা যেন ভেবে দেখা হয়। আজ জার্মান শ্রমিকরা গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে সর্বপ্রকারে তাদের সরকারকে সাহায্য করছে, তারা এ যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে মুক্তি-যুদ্ধরূপে। তারা ভেবে দেখেছে জার্মানী, ফ্রান্স ও ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশকে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য এ যুদ্ধের প্রয়োজন আছে।

ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ফরাসী মেহনতী জনগণের হাতে কোন ক্ষমতা এনে নিতে পারেনি। উল্টো সে সাধারণতন্ত্র বুর্জোয়াদের স্বার্থ ও সুবিধাকেই বেশী করে দেখতে শুরু করেছে। যুদ্ধের জন্য প্রুশিয়া ফ্রান্সের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত টাকা দাবি করেছে সে টাকা ফরাসী বুর্জোয়ারা কোনমতেই দেবে না। সে টাকা সর্বহারা শ্রমিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই আদায় করতে চায় তারা। এই উদ্দেশ্যে ফরাসী বুর্জোয়ারা জার্মান বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক বোঝাপড়ায় এসেছে।

প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭১ সালের ১৮ই তারিখে। কমিউনের বেশীর ভাগ সদস্য ছিল একেবারে মেহনতী মানুষ। অথবা মেহনতী মানুষের প্রতিনিধি। অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলারদের ভিতর থেকে নেওয়া। পুলিশ ও সব সরকারী কর্মচারীদের ভার কমিউনের হাতে তুলে দেওয়া হলো। ঠিক হলো কোন সরকারী কর্মচারির বেতন শ্রমিকদের

গড়পড়তা বেতনের হার থেকে বেশী হবে না। সরকারী প্রশাসন বিভাগকে আর কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে রাখা চলবে না। শুধু শহরের পৌর শাসন নয়, রাষ্ট্রশাসনের সব দায়দায়িত্বই চলে এল কমিউনের হাতে।

আসলে কমিউন হলো মেহনতী মানুষের সরকার। প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে সর্বহারা মেহনতী মানুষ পৃথিবীতে প্রথম তাদের মনোমত সরকার গঠন করল এই কমিউনের মাধ্যমে। তাদের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের জন্য স্থাপন করল এক ব্যাপকতর রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি।

শ্রমিক সাধারণতন্ত্রের প্রতীক লাল পতাকা দেখে বুর্জোয়ারা ভয়ে কাঁপতে লাগল। বুর্জোয়া নীতিবাগীশরা কমিউনের নিন্দেয় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

১৯শে মার্চ তারিখে কমিউনের একটি সরকারী মুখপত্র প্রকাশিত হয় প্যারিসে। পরের দিন তাতে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়, শাসকশ্রেণীর বারবার ব্যর্থতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পর আজ প্যারিসের সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী বুঝতে পেরেছে, এবার জনসেবার মত কাজকর্মগুলি তাদের হাতে নিতে হবে:

তারা আরও বুঝতে পেরেছে, প্রশাসন ক্ষমতা দখল করে তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎকে নতুন করে গড়ে তোলা তাদের শুধু কর্তব্য নয়, তাতে তাদের অবাধ এবং সার্বিক অধিকার।

মার্কস ত খুশিতে ফেটে পড়লেন। চেপে রাখতে পারলেন না সে খুশির আবেগ। ১২ই এপ্রিল তারখে কুগেলম্যানের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস লেখেন, ভিতরে বাইরে শত্রু। প্রুশীয় পুলিশ আর সৈন্যরা বেয়নেট উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। দেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করছে। তার উপর আছে ছয়মাসের অনশন আর অপুষ্টি। এ সব সত্ত্বেও ফরাসী শ্রমিকরা জয়ী হয়েছে। কী বিরাট আত্মত্যাগ। কী ঐতিহাসিক

তাদের কর্মপ্রচেষ্টা। History offers no parallel to this greatness.

২৬শে মার্চ প্যারিসে এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কমিউনের অধীনে। এই নির্বাচনে সদস্য পদের প্রার্থীসংখ্যা ছিল মোট বিরানব্বই। তার মধ্যে বাহাত্তর জন সমাজতন্ত্রবাদী নির্বাচিত হন এবং এঁদের মধ্যে সতের জন ছিলেন আন্তর্জাতিকের সদস্য। এর পরের নির্বাচনে আরও বেশী সংখ্যক আন্তর্জাতিক সদস্যরা নিযুক্ত হন এবং নিষ্ঠা ও যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে যান। কমিউনের সব সদস্যরাই অজস্র বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে অনেক কষ্ট সহ্য করে কাজ করে যেতে লাগল। কাজ করে যেতে লাগল অক্লান্ত আর অপ্রতিহতভাবে।

কারণ কমিউনের প্রতিটি সদস্যই জানত এখনও অনেক কাজ বাকি আছে তাদের। এটা তাদের প্রাথমিক জয় মাত্র। কমিউনের জন্ম হয়েছে সবেমাত্র প্যারিসের মাটিতে। এখনও তার সম্যক বিকাশ ঘটেনি। এখনও সে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। তার জন্য এখনও অনেক সংগ্রাম করতে হবে তাকে। অনেক ঐতিহাসিক পদ্ধতি নিয়ে করতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

তবে এই কমিউন প্রতিষ্ঠা করে একটা বড় কাজ করেছে শ্রমিক-শ্রেণী। ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে নতুন সমাজের যে সব প্রগতিশীল উপাদান ঘুমিয়ে ছিল এতদিন, সেগুলোকে মুক্তি দিয়েছে তারা। যার ফলে তারা তাদের মহান ঐতিহাসিক লক্ষ্য পূরণের পথে অটল সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে আজ। বুর্জোয়া ভদ্র-লোকদের যত সব বিরুদ্ধ মতবাদগুলিকে পথের ধুলোর মতই স্বচ্ছন্দে উড়িয়ে দিতে পারছে উপহাসের হাওয়া দিয়ে।

ভালভাবেই কাজ করে যাচ্ছিল ঐতিহাসিক প্যারিস কমিউন। কিন্তু হঠাৎ তার ভিতর থেকেই দেখা দিল ভাঙ্গনের সূত্রপাত। কমিউনের কিছু সদস্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল মেহনতী মানুষের

স্বার্থের। এটা এমন নতুন কিছু নয়। সব বিপ্লবের শেষেই দেখা যায়, প্রতিবিপ্লবীরা এমন করে বিপ্লবীদের মধ্যে ঢুকে পড়ে অথবা বাইরে থেকে বিভিন্ন উপায়ে বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করে।

প্রতিবিপ্লবী ও বুর্জোয়াদের চক্রান্তে কমিউনও তেমনি ব্যর্থ হয়ে গেল মাসকতকের মধ্যেই। মে মাসের শেষ সপ্তাহে সৈন্য দিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হলো কমিউন।

মার্কস বললেন, এরকম ঘটবে আমি আগেই জানতাম। আমি আগেই তাই সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা শোনেনি আমার কথা। আমি বলেছিলাম, উত্তর দিকে অর্থাৎ যেদিকে আছে প্রুশিয়া সেদিকটায় লক্ষ্য রাখো। তা না হলে তারা ফাঁদে পড়বে। তখন সময় ছিল। ইচ্ছে করলেই সাবধান হতে পারত। আমি পিয়েৎ, গ্রেসেৎ ও বেসিমিয়েরের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলাম। কমিউন ভেঙ্গে গেলে শত্রুরা যাতে সদস্যদের উপর চরম ও বর্বরোচিত প্রতিশোধ নিতে না পারে :তার জন্য অনেক আগেই দরকারী কাগজপত্রগুলি লণ্ডনে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলাম। তাতে শত্রুদের রোষের ভীষণতাটাকে অনেকখানি ঠেকিয়ে রাখা যেত।

কমিউন ভেঙ্গে গেলে আন্তর্জাতিকের নামে ফ্রান্সের অন্তর্বিপ্লব সম্বন্ধে একটি আবেদনপত্র প্রচার করলেন মার্কস। তাতে লিখলেন, বুর্জোয়াদের সভ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা কী জিনিষ তার পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন ক্রীতদাস বা শ্রমিকরা তাদের মালিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তখন সেই সভ্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা পরিণত হয় নগ্ন বর্বরতায়, পরিণত হয় নিষ্ঠুরতম প্রতিহিংসায়। শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই দেখা দেয় এই সংকট। তবে এবার যেন সে সংকট একটু বেশী পরিমাণেই দেখা দিল। ১৮৪৮ সালের জুনবিপ্লব কাহিনী ও বুর্জোয়াদের নিষ্ঠুতার দৃষ্টান্ত ম্লান হয়ে গেল ১৮৭১ সালের অত্যাচারের কাছে।

এ অত্যাচারের একমাত্র তুলনা মেলে সুল্লা শাসন আর রোমের ত্রয়ী সরকারের মাঝে। ঠিক তেমনি অগণিত নরহত্যা। ছোট বড় নারী শিশু নির্বিশেষে সকলের প্রতি হত্যা বা নারকীয় নিপীড়নের ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া। নেতাদের খুঁজে খুঁজে ধরা ও পশুর মত হত্যা করা, এমন কি নির্দোষ ও নিরপেক্ষদেরও বাদ না দেওয়া।

তবে প্যারিস কমিউন ভেঙ্গে গেলেও তার থেকে কয়েকটি প্রধান শিক্ষা পেল ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী। প্রথম কথা, তারা বুঝতে পারল, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তাদের শ্রেণীসংগ্রামকে শুধু শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে দিতে হবে সে সংগ্রামকে।

দ্বিতীয় কথা, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলিতে বুর্জোয়া রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ পার্লামেন্টের ভিতরে গিয়েই লড়াই করতে হবে আর নির্বাচনের মাধ্যমে সেখানে যেতে হবে।

আর একটি শিক্ষা হলো, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামের উপযুক্ত ক্ষেত্র এখন ফরাসী দেশ নয় জার্মান। কারণ জার্মান শ্রমিকরা আগেই অনেক কিছু রাজনৈতিক সুবিধা সুযোগ আদায় করে নিয়েছে।

আপাতব্যর্থ প্যারিস কমিউনের এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য দৃষ্টি এড়াল না মার্কসের। তিনি কুগেলম্যানকে আরও বললেন, প্যারিসে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারা মেহনতী মানুষের সংগ্রাম এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। এ সংগ্রাম যেমন করেই শেষ হোক না, এ সংগ্রাম যে সারা জগৎব্যাপী এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য রেখে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাকুনিনের দল ভেঙ্গে গেছে অনেক আগেই। তবু মার্কস দেখলেন, আন্তর্জাতিকের মধ্যে বাকুনিনের কিছু প্রভাব রয়ে গেছে। বাকুনিন-পন্থীরা অর্থাৎ যারা হটকারী বিপ্লবী, যারা উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ঠিক

না করেই এলোমেলো ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বিপ্লবে, কোন শিক্ষা পেতে চায় না ইতিহাস থেকে, তাদের আন্তর্জাতিক থেকে বার করে দিতে হবে। তারা কোনদিনই বুঝবার চেষ্টা করবে না মার্কসের কর্মপন্থাকে।

এজন্য মার্কস সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি আন্তর্জাতিকের এক কর্মীপরিষদের এক সম্মেলন ডাকলেন। কর্মীপরিষদের তের জন সদস্য ছাড়া আরও দশজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনে। জেনেভা শাখা বাধা দিয়েছিল। কিন্তু সে কথায় কান দেননি মার্কস।

কারণ মার্কস দেখলেন আর দেরি করা চলে না। বাকুনিনপন্থীদের ও আন্তর্জাতিকের সক্রিয় সদস্যদের আজ এটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, তিনি শ্রমিকশ্রেণীর চূড়ান্ত বিপ্লবকে নানা কারণে বিলম্বিত করছেন বলেই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না বিপ্লবের প্রতি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে শিক্ষা পেতে চাইছেন তিনি শুধু আর সেই শিক্ষা দিয়ে তিনি পরিশোধিত করে নিতে চাইছেন তাঁর কর্মপন্থাকে।

সম্মেলন চলল ১৭ই থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। অবশেষে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, কর্মীপরিষদকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হলো। আন্তর্জাতিকের সংবিধানের প্রস্তাবনায় একটি বড় রকমের নীতিগত পরিবর্তন করা হলো।

আগে প্রস্তাবনার এই অংশে যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের ঊর্ধ্বে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বেশী। কিন্তু এখন এ কথাটি একটু পাল্টে গিয়ে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল বা কার্যাবলীকে একটি বিশেষ গুরুত্ব দান করা হলো। আগে ছিল, that the economical emancipation of the working classes is therefore the great end to which every

political movement ought to be subordinate as a means. "

সে জায়গায় এখন বলা হলো, Considering that, against this collective power of the propertied classes, the working class can not act as a class except by constituting itself into distinct political party, distinct from and opposed to all old parties formed by the propertied classes, that this constitution of the working class into a political party is indispensable in order to ensure the triumph of the social revolution and its ultimate end, the abolition of classes ; that the combination of forces which the working class has already effected by its economical struggles against the political power of the landlords and Capitalists—the conference recalls to the members of the International that, in the militant state of the working class, its economical movement and its political action are indissolubly united.

যে সব দেশে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী বিত্তবানশ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্জন করেছে সেই সব দেশে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শ্রমিকদেরও একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংহত করে তুলতে হবে নিজেদের। সেখানে রাজনীতিকে এড়িয়ে গেলে হবে না।

মার্কস্ একবার যখন দারুণ অর্থাভাবে পড়েন অর্থাৎ তাঁর রুগ্না স্ত্রী জেনি মার্কসকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাইরের গ্রামাঞ্চলে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠাতে হয় এবং বাড়িভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালা খুব চাপ দিতে থাকে তখন তিনি একবার এঙ্গেলসকে দুঃখ করে লেখেন,

সারা জীবনের মধ্যে প্রায় অর্ধেক কাল টাকার জন্য আমায় পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হলো—এর থেকে মর্মন্তুদ ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। তবে এই দুঃখের মাঝেও একটা কথা ভেবে আমি সান্ত্বনা পাই। সেকথা এই যে আমি যেন আর পাঁচজন অর্থাৎ আমার পার্টি সহকর্মীদের সঙ্গে এক যৌথ কারবার চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সে কারবারে দেবার মত আমার ত টাকা নেই। আমি শুধু আমার সময় আর উদ্যম দিয়ে আমাদের পার্টির তত্ত্বগত দিকটাকে জোরদার করে চলেছি।

মার্কসের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা সত্যিই তখনও ভাল কাজ করে যেতে থাকে। মার্কস একবার খুশী হয়ে বলেন, লণ্ডনে শ্রমিক ইউনিয়নগুলিতে প্রায় রোজই লোক ভর্তি হচ্ছে। ইউনিয়নগুলি ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এঙ্গেলসও এই সময় খুশি হয়ে জানান, আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা সত্যিই খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং খুব একটা হৈ চৈ না করে বিরাট জয় আর বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। তার প্রভাব অনেক দূর দুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। যাই হোক, এতে তুমি এতদিন যে সময় ব্যয় করেছ তা সত্যি সত্যিই ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে এতদিনে।

অবশ্য সংস্থাকে যদিও টাকার জন্য বুর্জোয়াদের চাঁদার উপর নির্ভর করতে হত অনেকখানি তবু মার্কস আশা করেন এই নির্ভরশীলতা হতে অবিলম্বে মুক্ত হয়ে উঠবে শ্রমিকরা। তবে ইংল্যাণ্ডে ঠিক আশানুরূপ এগোচ্ছিল না সংস্থার কাজ। সেখানে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আশা করা বৃথা। কারণ ইংরেজরা বরাবরই সংস্কারবাদী। তাদের চরিত্রে অনেক ভাল গুণ আছে, কিন্তু বিপ্লবের গুণ নেই। তাই মার্কস বললেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সংস্থার কাজ যেভাবে এগোচ্ছে ইংল্যাণ্ডে সেভাবে এগোচ্ছে না।

আন্তর্জাতিকের লণ্ডন সম্মেলনের পর সুইজারল্যাণ্ডের বাকুনিন-

পন্থীরা নিজেদের সংগঠিত করে লণ্ডন প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে লাগল। ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে মার্কসের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করতে থাকে। লণ্ডনেও ওডগার নিউক্র্যাফ্‌ট প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আন্তর্জাতিক থেকে পদত্যাগ করেন। ইক্যারিয়াসও সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেলের পদ ত্যাগ করেন। নতুন সেক্রেটারি-জেনারেল হেলসও স্পেনের বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন জেনারেল কাউন্সিলের মত না নিয়েই। এইভাবে বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠতে থাকে আন্তর্জাতিক সংস্থার ভিতরে। ভাঙ্গনের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।

এই ভাঙ্গনের সম্ভাবনার মাঝেই ১৮৭২ সালের ২রা অক্টোবর হল্যাণ্ডের রাজধানী দি হেগে আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এক জীবনমরণ সংগ্রামে আন্তর্জাতিকের ভাগ্য নির্নীত হবে এই সম্মেলনে। মার্কস এবিষয়ে তার বন্ধু কুগেলম্যানকে লেখেন, আমি জেনারেল কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করার আগে আন্তর্জাতিককে কয়েকজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত করে যেতে চাই। জার্মান প্রতিনিধিদের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভাল। হেপনারকে বল সে যদি তোমায় প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে খুবই ভাল হয়।

সবশুদ্ধ সাতষট্টি জন প্রতিনিধি যোগদান করেন এই সম্মেলনে। ইটালির বাকুনিনপন্থীরা কোন প্রতিনিধি পাঠাননি। সুইজারল্যাণ্ডের বিরোধীপক্ষের তরফ থেকে এসেছিলেন জেমস গিলম। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পেতে কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না মার্কসের। এই সম্মেলনে এক দীর্ঘ বক্তৃতায় তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করেন মার্কস। বাকুনিনপন্থীদের নীতিগত ত্রুটিগুলিও বিশ্লেষণ করেন।

এই সম্মেলনে সর্বহারা শ্রমিকদের সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিক দল হিসাবে মর্যাদা দেবার সিদ্ধান্ত করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরে জেনারেল কাউন্সিলের অফিস লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে

যাবার ঠিক হয়। আন্তর্জাতিকের সঙ্গে বাকুনিন প্রবর্তিত এ্যালায়েন্সের সম্পর্ক সম্বন্ধে বোঝাপড়া করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি পরে বাকুনিন ও গিলমকে আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে বিতাড়িত করার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ জানায়। এই সুপারিশ অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কংগ্রেস বাকুনিন ও গিলমকে দল থেকে বিতাড়িত করে। বাকুনিন আন্তর্জাতিকের মধ্যে থেকেই গোপনে একটি দল করে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। আন্তর্জাতিক বহু শ্রমিক সংস্থার মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য এই কারণে তাঁর সদস্যপদ খারিজ করা হয়।

অনেক চেষ্টা করলেন মার্কস। তবু অপরিণামদর্শী বাকুনিন-পন্থীদের অশুভ প্রভাব হতে টিকিয়ে রাখতে পারলেন না আন্তর্জাতিককে। ভিতরে ভিতরে ভাঙ্গন ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। অবশেষে পরের বছরের জেনেভা কংগ্রেসে সে ভাঙ্গন হয়ে উঠল চরম।

কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা কার্যতঃ ভেঙ্গে গেলেও তার একটি সূক্ষ্ম প্রভাব ছড়িয়ে রইল ইউরোপের দেশে দেশে। তার শিক্ষা শিকড় গেড়ে রইল সর্বহারা শ্রেণীর মনে মনে। আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কখনই ছোট করে দেখলে চলবে না। মার্কসই সর্বপ্রথম এই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার মাধ্যমে ইউরোপের সর্বহারা শ্রমিক-শ্রেণীকে সংহত করে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত করেন।

যে বুর্জোয়া ভাবধারা সে যুগের শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে রাজনীতিতে এক উদ্ধত অপ্রতিহত স্পর্ধায় দিনে দিনে মাথা তুলে উঠতে থাকে, একা মার্কস তাঁর বুদ্ধিগত সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ান তাঁর বিরুদ্ধে। পুঞ্জীভূত অহমিকা আর স্বার্থপরতার পাহাড় ভাঙ্গার জন্য প্রথম প্রয়োগ করেন তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি।

জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে ছিলেন ব্যক্তিত্ববাদের গুরুমশাই। ব্যক্তিত্ববাদের মূল কথা হলো অহমিকা বা আমিত্ববোধ। আসলে

ব্যক্তিত্ববাদ হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদেরই এক রূপ। ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে প্রথম প্রবর্তন করেন এই আত্মকেন্দ্রিক আদর্শবাদের। ব্যক্তিমানুষের আত্মা বা চিন্তনশীল ব্যক্তিসত্তা যে একমাত্র সত্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাইরের জগৎ সত্য কি মিথ্যা তা ঠিক করবে এই চিন্তনশীল ব্যক্তিসত্তা। ফিক্‌টে আবার আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এই ব্যক্তিত্ববাদকে। শোনা যায় ফিক্‌টের শিশুসন্তান যখন প্রথম 'আমি' কথাটি উচ্চারণ করতে শেখে তখন তিনি নাকি আনন্দে মদ্যপান করেন।

ব্যক্তিত্ববাদ সমাজবাদ বা সাম্যবাদের পরম শত্রু। পুঁজিবাদ ব্যক্তিত্ববাদেরই অর্থনৈতিক দিক। ব্যক্তিত্ববাদের সবচেয়ে বড় দোষ তা মানুষের সমাজসত্তাকে অস্বীকার করে ব্যক্তিমানুষের সব সার্থকতাকে আত্মোন্নতির মধ্যে ছোট করে কেন্দ্রীভূত করে রাখতে চায়।

দর্শনের ইতিহাসে মার্কস প্রথম কুঠারাঘাত করলেন ব্যক্তিত্ববাদের মূলে। গভীর পাণ্ডিত্য, ক্ষুরধার বুদ্ধি ও যুক্তি আর অপরিসীম দূরদর্শিতার দ্বারা তিনি খণ্ডিতমস্তক ব্যক্তিত্ববাদের কবরের উপর প্রতিষ্ঠা করলেন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সৌধ। মার্কস অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে দিলেন, মানুষের সমগ্র মানসচেতনা বা আত্মা তার সমাজসত্তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার তার এই সমাজসত্তা নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রীয়-অর্থনীতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দ্বারা।

অনেকের মতে মার্কসের ইংল্যাণ্ডে নির্বাসন জীবনযাপন অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপনিবেশপুষ্ট ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক জীবন তখন সবেমাত্র উন্নত পুঁজিবাদের রূপ ধারণ করেছে। পুঁজিবাদের রাজনৈতিক সংস্করণ হিসাবে উদারনীতিবাদ তখন মাথা তুলে উঠেছে। সুখবাদ ও বেন্থামত্ত মিলের হিতবাদ পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদীদের স্বার্থেরই পোষকতা করতে শুরু করেছে। তার উপর আবার ফ্রান্স ও জার্মানী হতে অলীক কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদের স্বপ্ন

এসে ধর্মসুলভ এক বিশ্বাসে ঘন হয়ে উঠতে শুরু করেছে চিন্তাশীল ও শ্রমিকদের মনে।

এই সবকিছুর বুদ্ধিগত বিরোধিতা তীব্রতর করে তুলল মার্কসের চিন্তাকে। সংহত করে তুলল তাঁর আত্মশক্তিকে। অঙ্ক, ইতিহাস আর যুক্তিবাদের সাহায্যে শূন্যে ভাসমান হৃদয়গত কল্পনাভিত্তিক সমাজবাদকে মার্কস দান করলেন এক দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

মার্কসের এই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সাফল্য প্রথম প্রতিফলিত হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার সৃষ্টির মধ্যে। মার্কস সর্বপ্রথম দেখিয়ে দিলেন সারা বিশ্বের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খণ্ডবিচ্ছিন্ন শ্রমিক শক্তি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনের সামিল হতে পারে। যারা শোষিত সর্বহারা তাদের জাতীয়তা বলতে কিছু নেই, থাকা উচিত নয়; তারা সারা দুনিয়ার শ্রমিক সঙ্ঘের সভ্য মাত্র। মার্কসের কাছ থেকেই মন্ত্রশিক্ষা লাভ করে দুনিয়ার মেহনতী মানুষ প্রথম জেগে উঠল, উপলব্ধি করল শ্রেণী হিসাবে তাদের গুরুত্ব। সচেতন হয়ে উঠল তাদের বৃহত্তর সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে।

হেগ কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা মারাত্মক রকমের দুর্বল হয়ে পড়ল। প্রুধোঁপন্থী ও বাকুনিনপন্থীরা জেহাদ ঘোষণা করলেন একযোগে। ব্লাঙ্কিপন্থীরা প্রথমে মার্কসের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্র দখলের জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জিগির তুললেন। ব্লাঙ্কিপন্থীরা স্পষ্ট বললেন, রাষ্ট্র চাই, রাষ্ট্রের গুরুত্বকে কোনক্রমেই অস্বীকার করলে চলবে না। মোট কথা, শ্রমিকরা জোর করে রাষ্ট্রযন্ত্র ছিনিয়ে নেবে। এজন্য আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রধান কাজ হবে অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করা।

এই অবিপ্লবী ও অতিবিপ্লবীদের অর্থহীন তৎপরতা ও অশুভ প্রভাব হতে মুক্ত রাখার জন্যই আন্তর্জাতিকের জেনারেল কাউন্সিলকে লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরিত করলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। হেগ

কংগ্রেসে এঙ্গেলসও যোগদান করেন। তিনিও সব কিছু দেখে শুনে এ ছাড়া অন্য কোন পথ খুঁজে পাননি। এ প্রস্তাব এঙ্গেলসই উত্থাপন করেন নিজে।

অনেকে ভাবল আন্তর্জাতিকের প্রধান কার্যালয় লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধান মার্কসও সেখানে চলে যাবেন। ফাঙ্ক ব্রেন্তানো নামে একজন অধ্যাপক ত প্যারিসে প্রকাশ্যে বলে বেড়াতে লাগলেন মার্কস হেগ কংগ্রেসের পরই নিউ ইয়র্কে চলে গেছেন এবং এখন সেখানেই বসবাস করছেন।

আসলে মার্কস কিন্তু লণ্ডনেই রয়ে গেলেন। আমেরিকা যাওয়া ত দূরের কথা, মুখে একবার যাওয়ার নামও উচ্চারণ করেননি। তবু গুজব রটে গেল সারা ইউরোপে। কারণ আন্তর্জাতিকের সঙ্গে মার্কসের নাম এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে তার থেকে কেউ কখনও তাঁকে আলাদা ভাবতে পারত না।

নিউ ইয়র্কে স্থানান্তরিত আন্তর্জাতিকের নতুন হেড কোয়ার্টারের ভার দিলেন মার্কস বিশ্বস্ত বন্ধু সোর্জের উপর। সোর্জ প্রায়ই আমেরিকা হতে লণ্ডনে এসে কথাবার্তা বলত মার্কসের সঙ্গে। মার্কসও একেবারে নিশ্চিন্তে ছিলেন না। দাস ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে আন্তর্জাতিকের কথা ভাবতেন।

তবে মার্কস এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, মৃতপ্রায় আন্তর্জাতিককে আর বাঁচানো যাবে না। শিক্ষিত আত্মাভিমানী পেটি বুর্জোয়াদের অবাস্তব অযৌক্তিক চিন্তাধারা সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের প্রকৃত আদর্শের প্রতি এমনি করে বিশ্বাসঘাতকতা করে যাবেই। তা যাক, সর্বহারারা আরও ভালভাবে জাগলে তারা নিজেরাই পথ করে নেবে নিজেদের। আর সে জাগরণ আন্তর্জাতিকের জন্মের পর থেকেই একরকম শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া দাস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। দেশে দেশে ক্যাপিটালের প্রচার শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মন থেকে

কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদের আদর্শের শেষ চিহ্নগুলিকেও মুছে দেবে, এ বিষয়ে একরকম নিশ্চিত হয়ে উঠলেন মার্কস। এর পরও ক্যাপিটালের দুটি খণ্ড প্রকাশিত হবে। আর মাত্র একটি খণ্ডে তাঁর সব কথা বলা শেষ হবে না।

তাই আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে গেলেও নিরাশ হলেন না মার্কস। ক্যাপিটালের জন্য পুরো উদ্যমে কাজ করতে লাগলেন। সোর্জকে শুধু বললেন, আপাততঃ আন্তর্জাতিকের মূল সংগঠন নষ্ট হয়ে যায় ত যাক। তবে নিউ ইয়র্কের হেড কোয়ার্টারকে তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে দিও না। তাহলে কতকগুলি হঠকারী ও বাজে লোক এসে তা দখল করে বসবে।

তিনি আরও বললেন, আন্তর্জাতিকের প্রয়োজন ইউরোপের মেহনতী মানুষের কাছে প্রায় ফুরিয়ে গেছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলি নতুন পথে চলতে শুরু করেছে। ইটালি স্পেন ও বেলজিয়ামের শ্রমিকরা অবশ্য কিছুটা পিছিয়ে আছে। তেমনি জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সবচেয়ে উন্নত রূপ ধারণ করেছে।

এরা সবাই আপন আপন পথে চলতে চায়। আন্তর্জাতিক ছাড়া যদি তারা চলতে পারে, ত চলুক না। আন্তর্জাতিক তাদের যুগ যুগান্তব্যাপী ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে, পুঁজিবাদী শোষণ আর অর্থনৈতিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাদের চেতনাকে সংগ্রামমুখী করে তুলেছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষের ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তার কথাটিকে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে—আন্তর্জাতিকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এইখানেই। এরপর আন্তর্জাতিক থাক বা না থাক তাতে কোন ক্ষতি নেই।

দাস ক্যাপিটালের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের মধ্যে। একবারে নয়, কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে কতকগুলি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় এই সংস্করণ। মার্কস বললেন, এতে ভালই হলো। এতে করে শ্রমিকদের পক্ষে বোঝা আরও সহজ হয়ে উঠবে।

ক্যাপিটালের দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ মার্কস খণ্ড খণ্ড ভাবে করেন। পরে এঙ্গেলস সেই খণ্ড খণ্ড কাজগুলিকে গুছিয়ে একত্রিত করে এক বিশাল গ্রন্থের আকার দান করেন। সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু হলো, পুঁজি বা মূলধনের প্রচলনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা।

প্রথম খণ্ডের মত দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রধান তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে পুঁজির রূপান্তর আর তার প্রচলনের পরিধি। দ্বিতীয় অংশে আছে পুঁজির বিভিন্ন দিক। তৃতীয় অংশে আছে উদ্বৃত্ত সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও প্রচলন।

প্রতিটি অংশ আবার কয়েকটি করে পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অংশে আছে ছয়টি পরিচ্ছেদ; দ্বিতীয় অংশে এগারটি এবং তৃতীয় অংশে চারটি।

প্রথম অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে পুঁজির প্রচলনের তিনটি স্তর দেখানো হয়েছে। প্রথম স্তরে দেখানো হয়েছে, পুঁজিপতিরা ক্রেতা হিসাবে শ্রম ও পণ্যের বাজারে আসেন। তাদের টাকা রূপান্তরিত হয় পণ্যদ্রব্যে।

দ্বিতীয় স্তরে দেখানো হয়েছে, এই পণ্যদ্রব্য কাঁচামাল হিসাবে উৎপাদনের জন্য সংগ্রহ করে পুঁজিপতিরা। এইভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য হয়ে ওঠে শিল্পজাত দ্রব্যে। পুঁজিপতিরা চায় কম দামে কাঁচামাল কিনে বেশী দামের জিনিষ তৈরি করতে। এই ভাবে পুঁজিপতিদের পুঁজি উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে যায়।

তৃতীয় স্তরে দেখানো হয়েছে, পুঁজিপতিরা তাদের দ্বারা উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনে বাজারে। আনে সেগুলিকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে। সেই টাকা আবার উৎপাদনের ব্যাপারে খাটিয়ে আবার পুঁজিতে পরিণত করে। এইভাবে পুঁজি থেকে পণ্য ও পণ্য থেকে পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে গিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে থাকে পুঁজিপতিদের অর্থ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে উৎপাদন পুঁজির পরিধি। এই পরিচ্ছেদে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন মার্কস। তিনি বলেছেন, কোন পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় মালিকের অর্থপুঁজি শিল্পপুঁজি বা উৎপাদনমূলক পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে গিয়ে যে উদ্বৃত্ত মূল্য বা মুনাফা সৃষ্টি করে তার সবটাই যায় পুঁজিপতির ব্যক্তিগত খপ্পরে। মার্কস এক জায়গায় বলেছেন, Let us then Consider first the simple reproduction of productive Capital, assuming that as in the first chapter, conditions remains constant and commodities are bought and sold at their values. One this assumption the entire surplus value enters into the individual consumption of the Capitalist.

এ ছাড়াও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে বৃহৎ আকারে পুঁজির সময় ও পুনরুৎপাদন, অর্থের সঞ্চয় ও সংরক্ষণ। টাকা খাটিয়ে পণ্য ও শ্রম কিনে শিল্প উৎপাদন করে এবং তা বাজারে বিক্রি করে পুঁজিপতিরা যে উদ্বৃত্ত মূল্য পায়, সেটা তারা টাকার আকারে জমিয়ে রাখতে পারে অথবা সেটা পুঁজি হিসাবে খাটাতেও পারে।

পুঁজির বিভিন্ন রূপ আছে যেমন, অর্থপুঁজি, পণ্যপুঁজি, শিল্পপুঁজি বা উৎপাদনমূলক পুঁজি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পণ্যপুঁজির পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আছে এই পরিধির কয়েকটি সূত্র। অর্থ থেকে যে পুঁজি সৃষ্টি হয় সে পুঁজির একটি উৎপাদনক্ষমতা ও প্রচলনগতি আছে। কিন্তু এই উৎপাদনক্ষমতা ও প্রচলনগতি এক নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কাজ করে। আর এই উৎপাদন ও প্রচলনের একমাত্র লক্ষ্য হলো, অর্থের দাম বাড়ানো, টাকা দিয়ে টাকা সৃষ্টি করা, উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা।

এর পরের পরিচ্ছেদে আছে প্রচলনের সময় সম্বন্ধে আলোচনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে প্রচলনের ব্যয়ের কথা। এই ব্যয়ের মধ্যে আছে

অর্থ, কাগজ কালি ও অফিস খরচ, শ্রম, পণ্য সরবরাহ ও সাধারণ সরবরাহ। এই প্রচলনের ব্যাপারে যে খরচ খরচ হয় তা শিল্পপতিরা উদ্বৃত্ত উৎপাদনের আয় থেকে বহন করে। প্রচলন ও উৎপাদনের জন্য যে খরচ সেই খরচ বাদ দিয়ে যে লাভ হয় সেইটাই উদ্বৃত্ত-মূল্য। আর উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিক্রি করে পুঁজিপতিরা যে টাকা পায় সেটাকেই বলা হয় উদ্বৃত্ত মূল্য।

দ্বিতীয় অংশে আছে মোট এগারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে আছে পুঁজির উল্টো দিক। এখানে দেখানো হয়েছে কি ভাবে এবং কতবার পুঁজির রূপান্তর ঘটে। আর যতবারই পুঁজির রূপান্তর ঘটে ততবারই কিছু না কিছু বাড়তি মূল্য সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের নিযুক্ত শ্রম পুঁজির এই সম্প্রসারণে সাহায্য করে। আর একটা কথা বলা হয়েছে, মূল উৎপাদন ব্যবস্থা যদি পুঁজিবাদী হয় তাহলে সেই উৎপাদিত কাঁচামাল থেকে যে শিল্প উৎপাদন হয় তাও পুঁজিবাদী হতে বাধ্য। মূল উৎপাদনের মত শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নিযুক্ত শ্রম পুঁজির সম্প্রসারণে সাহায্য করে চলে। প্রথম খণ্ডের ইংরিজি সংস্করণেও মার্কস এই কথাই বলেন,

If production be Capitalistic in form, so too, will be reproduction. Just as in the former the labour-process figures as a means towards the self-expansion of Capital, so in the latter it figures as a means of reproducing as Capital—i. e., as self-expending value—the value advanced.

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন স্থিতিশীল পুঁজি ও প্রচলনগতিশীল পুঁজির কথা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুঁজির একটা অংশ স্থির হয়ে থাকে। তার আর একটা অংশ বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে চলে ক্রমাগত। উৎপাদিত বস্তুর দামও এই মূল্যের অন্তর্গত। পুঁজির এই অংশকেই বলে গতিশীল পুঁজি। শ্রমের ব্যাপারে যে

টাকা খরচ হয় তা প্রচলনশীল পুঁজির অন্তর্গত আর ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতিতে যে টাকা খরচ হয় তা স্থির পুঁজির অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন, পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শ্রমের জন্য যে টাকা দেয় তাতে তাদের জীবিকা অর্জনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো ছাড়া আর কিছুই হয় না। তিনি বলেছেন, "The money which the capitalist pays to the labourer for the use of his labour-power is nothing more or less than the form of general equivalent for the means of subsistence required by the labourer.

এর পরের পরিচ্ছেদে মার্কস বলেছেন স্থির পুঁজির প্রধান উপাদান স্থানান্তরকরণ ও সঞ্চয়ের কথা। কোন উৎপাদনে যে স্থির পুঁজি খাটানো হয় তার বিভিন্ন উপাদানের সময়সীমা আছে। যেমন যে বাড়ি ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তা চিরদিন থাকে না। এই সময়সীমা পার হয়ে গেলেই পুঁজিকে স্থানান্তরিত করতে হয়।

এরপর আছে স্থির পুঁজির রূপান্তরচক্রের বর্ণনা।

এর পরের পরিচ্ছেদে স্থির পুঁজি ও প্রচলনশীল পুঁজি সম্পর্কে প্রাচীন অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথের মতামতের কথা উল্লেখ করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁদের দুজনের মতপার্থক্যটিও পরিস্কার ভাবে তুলে ধরেন। মার্কস এক জায়গায় বলেন, এ্যাডাম স্মিথ যেভাবে এই দুটি পুঁজির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাতে কোন পার্থক্যই চোখে পড়ে না।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন অর্থনীতিবিদ রিকার্ডের মত। কিন্তু এ্যাডাম স্মিথের ভুলটাই আরও প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে রিকার্ডোর মতের মধ্যে। রিকার্ডো শুধু পুঁজির সেই দিকটার কথা নিয়েই বেশী আলোচনা করেছেন যে দিকটা শ্রমিকদের বেতনের ওঠা নামায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্নয়ে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল হলো তিনি প্রচলনশীল পুঁজির সঙ্গে পরিবর্তনযোগ্য পুজিকে এক করে দেখেছেন।

এর পর আলোচিত হয়েছে শ্রমিকদের কাজের সময়ের কথা। মার্কস বলেছেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা যেখানে উন্নতি লাভ করেনি সেখানে বেশী পুঁজি নিয়োগ করতে হয় এবং শ্রমিকদের খাটুনির সময়কেও দীর্ঘায়ত করা হয়।

এর পর আছে উৎপাদনের সময়ের কথা। সাধারণতঃ যে কোন জিনিষ উৎপাদনের সময় উৎপাদনের সময় শ্রমের কাল থেকে দীর্ঘতর হয়। যেমন আঙুর থেকে মদ তৈরির সময় আঙুরগুলোকে চাপ দেবার পরও কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখা হয়। বেশীর ভাগ শিল্পেই শ্রমিকদের শ্রমই সবচেয়ে দরকারী ; তাদের শ্রমই একটি কাঁচা মাল বা অপরিণত উৎপাদনকে পরিণত শিল্পরূপ দান করে। কিন্তু শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের একটা নিজস্ব দিক আছে, যেমন কোন জিনিষকে ভিজিয়ে রাখা, ফেলে রাখা, শুকোন প্রভৃতি ব্যাপারে কোন শ্রম দরকার করে না।

উৎপাদনের সময়কাল ও শ্রমের কালের পার্থক্য সবচেয়ে বেশী করে বোঝা যায় কৃষিকাজের ব্যাপারে। ধান বা কোন ফসলের বীজ বোনার জন্য চাষীদের দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। আর কোন উৎপাদনে শ্রম নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থির পুঁজিও নড়তে চড়তে পায় না। প্রচলনগতি হারিয়ে তার গোটাটাই স্থির হয়ে থাকে তখন।

এরপর আছে পুঁজি প্রচলনের সময়-কথা। মার্কস প্রচলনের সময় বলতে সেই সময়ের কথা বলেছেন যখন পুঁজির একটা বড় অংশ পণ্য বস্তুতে পরিণত হয় আর সেই পণ্যবস্তুকে বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ের স্বল্পতা বা দীর্ঘতা নির্ভর করছে বিক্রয়কালীন সময়ের উপর। কোন শিল্পবস্তু উৎপাদনের জায়গা থেকে বিক্রির জন্য বাজারে যেতে ও বিক্রি হতে যে সময় লাগে তার উপর শুধু পুঁজির প্রচলনই নির্ভর করছে না, পণ্যদ্রব্য থেকে পুঁজির রূপান্তরও তার উপর নির্ভর করে। কারণ পুঁজিপতি তার পণ্যবস্তু বাজারে বিক্রি করে যে টাকা পাবে সেই টাকাই সে আবার নতুন

পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করবে। ভারতে কোন একটি কারখানায় কোন এক পুঁজিপতি কিছু পুঁজি খাটিয়ে খরচ করে কিছু শিল্পবস্ত্র উৎপন্ন করল। সেই মাল সে জাহাজে করে ইংল্যাণ্ডে পাঠাল। ইংল্যাণ্ডে জাহাজটির যেতে চার মাস সময় লাগল। জাহাজ থেকে মাল খালাস করে সেখানকার বাজারে বিক্রি করে টাকা পেতেও চার মাস সময় লাগল। সুতরাং পণ্য থেকে পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে সময় লাগল মোট আট মাস।

এর পরের পরিচ্ছেদে আছে খাটানো পুঁজির উপর পুঁজির প্রচলন সময়ের প্রভাবের কথা। এই প্রসঙ্গে শ্রমের সময়কালের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন মার্কস। অনেক সময় শ্রমের কাল ও প্রচলনের কাল সমান হয়। অনেক সময় শ্রমের কাল বেশী হয়। আবার অনেক সময় শ্রমের কাল প্রচলনের কাল থেকে কম হয়। এর ফলে উৎপন্ন জিনিষের দামও কিছু ওঠানামা করে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আছে পরিবর্তনযোগ্য পুঁজির রূপান্তর ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বার্ষিক হারের কথা। মার্কস উদাহরণ সহযোগে দেখিয়েছেন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন পুঁজিপতি যদি আড়াই হাজার পাউণ্ড বিনিয়োগ করে, তাহলে তার মধ্যে দু হাজার পাউণ্ড রেখে দেয় স্থির পুঁজি হিসাবে, পাঁচশো পাউণ্ড খরচ করে শ্রমিকদের বেতনের জন্যে। বাকিটা খাটে প্রচলনশীল পুঁজি হিসাবে। এইভাবে এক বছর পরে দেখা যাবে, এই আড়াই হাজার পাউণ্ডের পুঁজি দশগুণ ফেঁপে পঁচিশ হাজারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে যে উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি হয় তা নির্ভর করবে খাটানো পুঁজি আর শ্রমিকদের উপর শোষণের পরিমাণের উপর।

The conversion, sooner or later, of the value substitute into money, and into the form in which the variable Capital is advanced, is obviously as

immaterial circumstance, so far as production of surplus value is concerned. This production depends on the magnitude of the variable Capital employed and the degree of exploitation of labour.

অর্থাৎ পুঁজিপতি শুধু বেশী টাকা পুঁজি হিসাবে খাটালেই বেশী উদ্বৃত্ত উৎপাদন বা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পারবে না যদি সে শ্রমিকদের বেশী করে শোষণ করতে না পারে।

এর পরের পরিচ্ছেদে আছে উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রচলনের কথা। সাধারণতঃ উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় তা আবার শিল্পপতিরা উৎপাদক পুঁজি হিসাবে শিল্পে বিনিয়োগ করে। পুঁজি হিসাবে কিন্তু এই উদ্বৃত্ত মূল্য কিছু পরিমাণ সঞ্চিত হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা পুঁজিপতিরা উৎপাদক পুঁজি হিসাবে খাটায় না। প্রথমে তারা বেশ কিছুটা সঞ্চয় করে। পরে তারা ইচ্ছামত সক্রিয় উৎপাদক পুঁজিতে পরিণত করে।

এই প্রসঙ্গে এই পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন সরল পুনরুৎপাদন ও ব্যাপক হারে, পুনরুৎপাদন ও সঞ্চয়ের কথা।

এর পর শুরু হয়েছে তৃতীয় অংশ। এই অংশের প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে বাড়তি সামাজিক পুঁজির পুনরুৎপাদন ও প্রচলন। সব উৎপাদন ব্যবস্থার মূল কথাই হলো শ্রম আর আত্ম সম্প্রসারণ। এই উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথম ফল হলো পণ্য উৎপাদন আর এর মূল লক্ষ্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি। পুঁজির পুনরুৎপাদনের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এই গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা আর তার সঙ্গে পুঁজির প্রচলনের কথা।

সামাজিক পুঁজি বলতে মার্কস বলেছেন কোন সমাজে ব্যক্তিমানুষ যে সব পুঁজি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিনিয়োগ করে তার সমষ্টি। ব্যক্তিগতভাবে যে কোন পুঁজিপতি যেমন শ্রেণীরই অংশবিশেষ

তেমনি যে কোন ব্যক্তিগত পুঁজিও সাধারণভাবে কোন দেশের মোট সামাজিক পুঁজি বা জাতীয় পুঁজিরই অংশ।

এই প্রসঙ্গে অর্থপুঁজির ভূমিকার কথাও আলোচনা করেছেন মার্কস।

পরের পরিচ্ছেদে মার্কস আবার প্রাচীন অর্থনিতিবিদ এ্যাডাম স্মিথের পণ্য মূল্য সম্পর্কিত মতামতগুলি আলোচনা করেছেন। এ্যাডাম স্মিথ পণ্যমূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে কেবলমাত্র বেতন, লাভ ও খাজনার গুরুত্বের কথাই বলেছেন। কিন্তু মার্কস বললেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পুঁজি। এই পুঁজির কথা না বললে সব কথা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক যখন জীবিকার বিনিময়ে কাজ করতে থাকে কোন পুঁজিপতির কাছে তখন সে নিজেকে সক্রিয় উৎপাদক পুঁজির একটি অংশরূপেই নিজেকে সঁপে দেয়।

এর পরের তুটি পরিচ্ছেদেই মার্কস সামাজিক পুঁজির সরল পুনরুৎপাদন ও ব্যাপক সঞ্চয় ও পুনরুৎপাদনের কথা আলোচনা করেন। এইভাবে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শেষ করেন। কিন্তু বিপুল পরিশ্রমের সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের কাজ শেষ করে গেলেও এই তুটি খণ্ডের প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি তিনি। তাঁর জীবিত কালে এই তুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধু এঙ্গেলস মার্কসের খণ্ড খণ্ড ভাবে লেখা রচনাগুলি সম্পাদনা করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

উনিশ

হেগ কংগ্রেসে ইণ্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা ভেঙ্গে গেলেও এই কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ঘোষণা করেন মার্কস। এটি শুধু কথার ঝোঁকে কথা বলা নয়; এটি তাঁর অবশিষ্ট জীবনের ব্রত।

তিনি বলেন, আমার দিক থেকে আমি অক্লান্তভাবে কাজ করে যাব। কাজ করে যাব শ্রমিক সমাজের ঐক্য ও সংহতির জন্য। এই ঐক্য ও সংহতির মূল্য কতখানি তা বোঝা যাবে ভবিষ্যতে। না, আমি কিছুতেই আন্তর্জাতিক ছাড়ব না। আমি আমার জীবনের বাকি দিনগুলি ঠিক আগেকার মতই কাজ করে যাব। কাজ করে যাব সমাজবাদী চিন্তাধারাগুলিকে কাজে রূপদান করার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ অথবা কাল সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হবেই। সমাজবাদ সংগ্রামে জয়লাভ করবেই। সমাজবাদ সারা জগৎ জুড়ে সর্বহারাদের শাসন প্রাতিষ্ঠিত করবেই।

এই কথা অনুসারেই কাজ করে যান মার্কস। অর্থনীতির গবেষণা তখনও শেষ হয়নি। দাস ক্যাপিটালের সব কাজ শেষ হয়নি তখনও। অর্থনীতির গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির কাজও করে যেতে লাগলেন।

তবে খুব সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলেন মার্কস। আন্তর্জাতিক অবস্থা ভালভাবে পর্যালোচনা করে এক সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করলেন। তখনকার আন্তর্জাতিক রাজনীতির অবস্থা মোটেই সমাজবিপ্লবের অনুকূল ছিল না। কারণ তখন বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট পুঁজিপতিরা অনেক শ্রমিকনেতাকে ঘুষ দিয়ে সুযোগ সুবিধা দিয়ে হাত করেছে; শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতাকে ভোঁতা

করে দিয়েছে। ফরাসী দেশে প্যারিস কমিউন ব্যর্থ হয়েছে। জার্মানীতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলন জয়ী হয়েছে।

মার্কস দেখলেন, ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে কোন উগ্র পথ অবলম্বন করলে চলবে না। আগেকার মত প্যারিস কমিউন বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার মত পুরনো ধরণের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আর শ্রমিক সমস্যার কোন সমাধান করতে পারবে না।

মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনে মিলে যুক্তি করে একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তখনও ক্ষীয়মান আন্তর্জাতিকের প্রধান নেতা ছিলেন মার্কস। এই আন্তর্জাতিকের দেহটি প্রুধোঁ, ল্যাসেল ও বাকুনিন-পন্থীদের আঘাতে অশক্ত হয়ে পড়লেও তার আত্মা তখনও একেবারে মরেনি। মার্কসের কালজয়ী আদর্শগত প্রভাব তখনও সজীব করে রেখেছিল সে আত্মাকে।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিদের ডেকে মার্কস বললেন, তোমরা এক কাজ করো। সব দেশের সমস্যা সমান নয়। তাই আজ কোন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সব দেশের শ্রমিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই তোমরা নিজের নিজের দেশে জনগণকে সংঘবদ্ধ করে আঞ্চলিক ভিত্তিতে এক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল। খুব বেশী করে গণসংযোগ রেখে তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করো। এতে সময় বেশী লাগলেও সমাজবিপ্লবের কাজ ভাল হবে :

মার্কসের এই উপদেশে কাজ হলো। দেশে দেশে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী একটি করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শ্রমিকনেতারা আপন আপন দেশে মার্কসীয় আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে কাজ করে যেতে লাগলেন।

মার্কসের কাজ তাতে আরও বেড়ে গেল। আগের থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল তাঁর ভূমিকা। প্রতিটি দেশেই শ্রমিকদের নিজস্ব সমাজবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় শ্রমিকরা শ্রেণীসচেতন হয়ে উঠল আগের থেকে বেশী। ফলে শ্রমিক আন্দোলন হয়ে উঠল

ব্যাপকতর ও তীব্রতর। কারণ আগে যখন আন্তর্জাতিক ছিল তখন বিভিন্ন দেশের শ্রমিক নেতা ও প্রতিনিধিরা শুধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতেন ও আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতেন। ফলে নিজের নিজের দেশে শ্রমিক জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। ফলে তখন তারা নিজের নিজের দেশে শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী চেতনা ও আন্দোলনের কোন স্থায়ী বা শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেননি।

মার্কস আরও বললেন, কোন দেশে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। সে দেশের ভাবধারা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক জীবন, শ্রেণী-সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর বোধশক্তি ও শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্বগত স্তর এবং শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রত্যক্ষ বাধাসমূহ— এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে তোমাদের কাজ করতে হবে।

স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালির মত অর্থনীতির দিক থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রধান বাধা ছিল বাকুনিনের অতিবিপ্লবী তৎপরতা।

এই পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করে মার্কস ও এঙ্গেলস বাকুনিনের এই বিভেদ সৃষ্টিকারী মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা দেখিয়ে দেন বাকুনিনের উদ্দেশ্য যাই থাক কার্যত তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আন্দোলনকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছেন। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতির মাঝে ফাটল ধরাচ্ছেন।

জার্মানীতে তখন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে প্রধান বাধা ছিল ল্যাসেলের দল। তখন জার্মানীতে আইসেনাক দল নামে শ্রমিকদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ল্যাসেলপন্থীরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে হাত করার জন্য চেষ্টা করে। মার্কস এ বিষয়ে আইসেনাকদের সতর্ক করে দেন। কিন্তু মার্কসের নিষেধ লঙ্ঘন করে গোটা কংগ্রেসে আইসেনাক দল ল্যাসেলপন্থীদের সঙ্গে এক অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

১৮৭৫ সালে গোথা কংগ্রেসের কর্মসূচীর সমালোচনা করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তার নাম, ক্রিটিক অফ দি গোথা প্রোগ্রাম (১৮৭৫), এই রচনায় মার্কস ল্যাসেলপন্থীদের অবৈজ্ঞানিক সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাদর্শের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্বগত সমস্যাগুলির সমাধানের কথাও আলোচনা করেন মার্কস। আলোচনা করেন ঐতিহাসিক অগ্রগতির নিয়মগুলির কথা। এই সঙ্গে শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেন মার্কস। গভীরভাবে চিন্তা করেন। তারপর আদর্শ সাম্যবাদী সমাজের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেন।

এই সাম্যবাদী সমাজের ছবি মার্কসের আর একটি উজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এ বিষয়ে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন মার্কস। তিনি প্রথমে দেখান কোন পদ্ধতিতে পুঁজিবাদী সমাজ সমাজবাদী সমাজে রূপান্তরিত হবে। তারপর তিনি আলোচনা করেন সাম্যবাদী সমাজের দুটি স্তরের কথা। ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সমাজবাদী সমাজেই ঘটবে।

মার্কস দেখান সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তর হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিণতি লাভের স্তর। এই স্তরে বণ্টনব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। এই বণ্টন ব্যবস্থায় সাধ্য অনুসারে নেওয়া শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুসারে বেতন দেবার নীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ to 'each according to his ability and each according to his capacity-র নীতি।

কিন্তু সাম্যবাদী সমাজের উচ্চতম স্তরে দেশের উৎপাদন বেড়ে যাবে প্রভূত পরিমাণে। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় শোষণের অবসান ঘটায় সমাজের সকল মানুষেরই সুখশান্তি যাবে বেড়ে। তখন আর শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকবে না; তখন সব শ্রমই জীবনের একটি আদিমতম ও অপরিহার্য্য প্রয়োজন হিসাবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করবে সমাজের সর্বত্র। দিকে দিকে

গড়ে উঠবে মানুষে মানুষে উন্নত সামাজিক সম্পর্ক আর উন্নত ধরণের সমবায় পদ্ধতির ফলে তখন বণ্টনব্যবস্থা হবে আরও উন্নত আরও উদার। তখন প্রতিটি শ্রমিককে বেতন দিতে হবে তার যোগ্যতা অনুসারে নয়, দিতে হবে তার প্রয়োজন অনুসারে। তখন শ্রমিকরা সাধ্য অনুসারে সমাজকে শ্রম দান করে থাকে আর তার বিনিময়ে প্রয়োজন অনুসারে বেতন নেবে। অর্থাৎ শ্রমিকদের তখন যেন জীবনে কোন অর্থনৈতিক সমস্যা বা অভাবের কবলে পড়তে না হয়।

পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যবর্তী সময় হচ্ছে এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের কাল। এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থারও রূপান্তর ঘটে। এই সময় রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক একনায়কতন্ত্র।

গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনা মার্কসীয় তত্ত্বের দিক হতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস গোথা কংগ্রেসের যে কুফলের কথা ভেবেছিলেন ঠিক তাই হলো। আপোষ করতে গিয়ে পেটি বুর্জোয়াদের প্রভাব বেড়ে গেল। জার্মানীর সমাজবাদী গণতান্ত্রিক নেতারা ইউগেন ডারিং-এর সমাজবাদী আদর্শের প্রশংসা করলেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডারিংএর সমাজবাদ সমাজবাদী আদর্শ এমন কিছু নতুন নয়; পুরনো পচা পেটি বুর্জোয়া সমাজবাদেরই আর এক রূপ।

১৮৭৫ সালের ৫ই মে তারিখে গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনার সঙ্গে একটি চিঠি জার্মানীতে ব্রেককে পাঠান মার্কস। সে চিঠিতে ব্রেককে অনুরোধ করেন, তাঁর সমালোচনা যেন তিনি ল্যাসেলপন্থী নেতাদের দেখান।

এদিকে বাকুনিনপন্থীরা তখন গোথা কংগ্রেসের নরমপন্থী ঐক্য প্রস্তাবের জন্য মার্কসকে দায়ী করছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে

পারছিলেন না এ কংগ্রেসের সঙ্গে মার্কসের কোন সম্পর্ক নেই এবং কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে মার্কসের অমতেই।

মার্কস তাই ব্রেককে চিঠিতে জানালেন, খুব শীঘ্রই এঙ্গেলস ও আমি এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়ে দেব যে গোথা কংগ্রেসে যে সব নীতি ও কার্যসূচী নির্ধারিত হয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

এটা করতেই হবে কারণ বিভিন্ন দেশে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সম্বন্ধে। জার্মানীতে আইসেনাকের দলকে আমরাই নাকি চালিত করছি। সম্প্রতি একটি রুশীয় গ্রন্থে বাকুনিন শুধু গোথা কংগ্রেসের প্রোগ্রামের জন্যই আমাকে দায়ী করেননি, লেবনেখট পিপলস পার্টির সঙ্গে আঁতাত করার পরদিন থেকেই যা কিছু করেছেন তার জন্যও আমাকেই দায়ী করেছেন।

এরপর আর আমার চুপ করে থাকা চলে না, কারণ কোন বিষয়ে কূটনৈতিক নীরবতা মানেই এক ধরণের স্বীকৃতি। যে কার্যসূচী শ্রমিকদলকে নীতিভ্রষ্ট করে দেবে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই কিছু বলা উচিত। তাছাড়া ডজনখানেক কার্যসূচীভিত্তিক বড় বড় প্রস্তাব পাশ করার থেকে একটা কাজের কাজ অনেক ভাল। আইসেনা-কদের সঙ্গে ল্যাসেলপন্থীদের মিলন শ্রমিকদের পক্ষে কিছুটা তৃপ্তিজনক হতে পারে, কিন্তু একথা মনে করা সত্যিই ভুল হবে যে তার জন্য বেশী রকমের একটা কিছু দাম দিতে হবে না।

মার্কস শুধু গোথা প্রোগ্রামের তত্ত্বগত দিকটাকে নিয়েই সমা-লোচনা:করেননি, সে প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন সুক্ষ্মভাবে চিরে চিরে সমালোচনা করেন। আইসেনাকপন্থী ও ল্যাসেলপন্থীদের সমাজবাদী আদর্শের মধ্যে গলদ কোথায়, সে আদর্শ কতখানি পেটি বুর্জোয়া ভাবালুতায় ভরা, তা দেখিয়ে দেন অকাট্য যুক্তির সঙ্গে।

প্রোগ্রামের প্রতিটি কথাই শুনতে ভাল। কিন্তু কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদীদের কথার মত এ কথাগুলি এক উদার অথচ অর্থহীন

ভাবালুতায় ভরা। কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা বাস্তব তথ্যভিত্তিক কোন সত্য নেই সে কথায়। অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করলে প্রকট হয়ে পড়ে কথাগুলির অসারতা।

প্রোগ্রামে আছে,

যেহেতু শ্রমই হচ্ছে সকল সম্পদ ও সংস্কৃতির উৎস এবং ব্যবহারিক শ্রম একমাত্র সমাজে এবং সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব, সেইহেতু শ্রমের সব ফসল সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভাগ করে দিতে হবে।

বর্তমান সমাজে শ্রমের হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতিগুলি পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকারে, সুতরাং পুঁজিপতিদের উপর শ্রমিকদের এই নির্ভরশীলতাই তাদের সব রকমের দুঃখ ও দাসত্বের কারণ।

শ্রমিকদের মুক্তির জন্য শ্রমের উপাদন বা যন্ত্রপাতিগুলিকে সমাজের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এবং সমবায়ের মাধ্যমে সমাজের সব শ্রম পরিচালনা করে শ্রমের সব ফসল ভালভাবে বণ্টন করে দিতে হবে।

শ্রমিকদের মুক্তি শ্রমিকদেরই রচনা করে নিতে হবে আর এই শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় অন্যান্য সব শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল।

বর্তমানে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর মাঝে থেকেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করে যাবে। তবে তারা সব সময় মনে রাখবে তাদের এই চেষ্টার ফল জগতের সকল সভ্য দেশের শ্রমিকরাই ভোগ করবে। তারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা ভুলবে না।

এই সব নীতির বশবর্তী হয়েই জার্মান শ্রমিকদল এক স্বাধীন রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে সমাজে বেতন ব্যবস্থা, বেতন ব্যবস্থার লৌহকঠিন আইন কানুন, কোন রকমের শোষণ ও রাজনৈতিক বা সামাজিক অসাম্য থাকবে না।

সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য জার্মান শ্রমিকদল সমবায়-

ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য দাবী জানাচ্ছে। এই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে সরকারী সাহায্যে এবং এ ব্যবস্থা পরিচালিত হবে শ্রমিক-শ্রেণীর দ্বারা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই উৎপাদক সমবায় সংস্থাগুলি এমনভাবে কাজ করবে যে দেশের সব কাজ কারবার শ্রমিক সংগঠনগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে।

জার্মান শ্রমিকদল দাবী করছে রাষ্ট্রে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। এই সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থাই হবে রাষ্ট্রের বুদ্ধিগত ও নীতিগত ভিত্তি।

মার্কস সমালোচনা করে বললেন, ল্যাসেলের এই সব কথাগুলি শুনতে ভাল। কথাগুলি উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে ভরা। কিন্তু ভিতরে সারবস্তু কিছু নেই। দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে বলা হয়েছে, বর্তমানে শ্রমের বা যন্ত্রপাতিগুলি পুঁজিপতিদের একচেটিয়া অধিকারে। কিন্তু মার্কস একবার সমালোচনা করে বললেন বর্তমানে অর্থাৎ গোটা কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় শ্রমের উপাদানের বেশীর ভাগ জমিদারদের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। ভূমিগত সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকারই হচ্ছে পুঁজির একচেটিয়া অধিকারের ভিত্তি। সুতরাং শ্রমের উপাদান বর্তমানে জমিদার ও পুঁজিপতি উভয়ের একচেটিয়া অধিকারে।

মার্কস আরও বললেন, এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে এই সব প্রস্তাবের রচয়িতা ল্যাসেল জমিদারদের বাদ দিয়ে কেবল পুঁজিপতিদের আক্রমণ করেছেন। কিন্তু তিনি জানেন না, ইংল্যাণ্ডে এমন অনেক পুঁজিপতি আছেন যাদের কলকারখানা স্থাপন করার মত নিজস্ব কোন জমি নেই। অর্থাৎ কোন জমিদারের কাছ থেকে জমি ভাড়া নিয়ে অথবা খাজনা ব্যবস্থা করে তার উপর কারখানা তৈরি করেন।

গোথা প্রোগ্রামের তৃতীয় প্যারাগ্রাফে প্রথম প্যারাগ্রাফের জের টেনে বলা হয়েছে, শ্রমের সব ফল সমাজের সকল মানুষকে সমান অধিকারের ভিত্তিতে ভাগ করে দিতে হবে। মার্কস একথার সমালোচনা করে বললেন, শ্রমের ফল বলতে শ্রমের উৎপাদন না মূল্য কী বোঝায়

তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। তাছাড়া শ্রমের ফল সমাজের সকল মানুষকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে—এই কথাটিও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা কোন পরিশ্রম করে না; তারা কখনই শ্রমিকদের শ্রমের ফলের সমান অংশ পেতে পারে না। সমাজে বিতরণের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের ভিত্তি হবে শ্রম।

চতুর্থ অনুচ্ছেদে শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণে ভুল করেছেন ল্যাসেল। মার্কস এই ভুল ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ যে সব শ্রেণী আজকের দিনে বুর্জোয়াদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে তাদের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণীই সবচেয়ে বিপ্লবী। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পব্যবস্থার প্রচণ্ড ধাক্কায় অন্যান্য শ্রেণীগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে একেবারে। কিন্তু প্রোলেতারিয়েত বা সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব এই শিল্পব্যবস্থারই প্রথম ফল বলে এই সর্বহারা শ্রেণী তার ধাক্কা সহ্য করতে পারে। আর তাই তারা অন্যান্য শ্রেণীর থেকে বিপ্লবী।

তবে বুর্জোয়ারাও সামন্তবাদী জমিদার জোতদার ও মধ্যবিত্তদের তুলনায় একদিক থেকে বিপ্লবী। কারণ তারা সামন্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যখন যন্ত্রনির্ভর বৃহদায়তন শিল্পব্যবস্থাকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিয়েছে, বুর্জোয়ারা তখন সেই শিল্পব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে বরণ করে নিয়েছে অতি মুনাফার লোভে। শুধু তাই নয়, আজ বুর্জোয়ারাই এই ভারী শিল্পের ধারক ও বাহক। অন্যদিকে সামন্তরা পুরনো উৎপাদন ব্যবস্থাকে মরিয়া হয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে কারণ তারা দেখছে পুরনো উৎপাদনব্যবস্থা থাকলে তাদের সামাজিক প্রভুত্ব ঠিক বজায় থাকবে।

আবার সর্বহারা শ্রেণী আধুনিক যন্ত্রনির্ভর শিল্পব্যবস্থার সৃষ্টি বলেই তারা সবচেয়ে বেশী বিপ্লবী। অন্যান্য শ্রেণীর থেকে তারা সবচেয়ে বেশী বিপ্লবী কারণ আধুনিক শিল্প বা উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের প্রভুত্ব একেবারে মুছে ফেলতে চায়। আর এই

প্রভুত্বকেই চিরদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে চায় বুর্জোয়ারা। সাম্যবাদী ইস্তাহারে আছে নিম্নমধ্যবিত্তরা ক্রমশই সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়ে উঠছে বলে তারাও বিপ্লবী হয়ে উঠছে।

মার্কস আরও বলেছেন, ল্যাসেল সাম্যবাদী ইস্তাহারের কথা ভালভাবেই জানেন। ইস্তাহারের সব কথাই তাঁর একরকম মুখস্থ কিন্তু তিনি নিজের সুবিধামত কথাগুলোকে ওলট পালট করে দিয়েছেন। দেখে শুনে মনে হয় রাজা ও সামন্তদের প্রতি তাঁর একটা গোপন দরদের উপর রং চড়াতে গিয়েই শুধু বুর্জোয়াদের উপরেই বিষোদগার করে ফেলেছেন। সামন্তদের বাদ দিয়ে শুধু বুর্জোয়া পুঁজি-বাদিদেরই একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল বলে অভিহিত করেছেন।

পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদে আর একটা ভুল করেছেন ল্যাসেল। সাম্যবাদী ইস্তাহারের শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করে তিনি সমস্ত শ্রমিক আন্দোলনকে সংকীর্ণ জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। অবশ্য সব শ্রমিকশ্রেণীকেই প্রথমে তাদের নিজেদের দেশের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম শুরু করতে হয়। তাকে আপাতত একটা জাতীয় পটভূমি বেছে নিতে হয়। কিন্তু এই জাতীয় পটভূমিটা শ্রমিকদের শ্রেণী সংগ্রামের একটা আকারগত ভিত্তিভূমিমাত্র। কোন শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় পটভূমির কোন বস্তুগত সম্পর্ক নেই। সব শ্রমিক আন্দোলনই আসলে অর্থাৎ স্বরূপের দিক থেকে আন্তর্জাতিক। সাম্যবাদী ইস্তাহারে একথা স্পষ্ট লেখা আছে।

তবে আজকাল কোন কোন দেশে ঠিক খাঁটি জাতীয় পটভূমি খুঁজে পাওয়া কঠিন। জার্মানীর মত উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রও আজ অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে, কারণ অর্থনীতির দিক থেকে জার্মানী আজ বিশ্ব বাণিজ্যের অন্তর্গত আর রাজনীতির দিক থেকে জার্মানী আজ পৃথিবীর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহের একটি। এমন কি হের বিসমার্কও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আজ এক আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করছেন।

আপন আপন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী এক আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে ল্যাসেল বলেছেন বিশ্বের জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের কথা। এ কথাটি তিনি আগেকার ইন্টারন্যাশনাল লীগ অফ পীস এ্যাণ্ড ফ্রীডমের কাছ থেকে ধার করেছেন।

এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি ১৮৬৭ সালে জেনেভায় বুর্জোয়া ডেমোক্র্যাট ও শান্তিবাদীরা স্থাপন করেন। এরা শান্তি ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে গালভরা বড় বড় কথা বলে সর্বহারা শ্রেণীর লোকদের শ্রেণীসচেতনতা ও শ্রেণীসংগ্রাম হতে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। মার্কস তার আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (ফার্ষ্ট ইন্টারন্যাশানাল বা প্রথম আন্তর্জাতিক) সদস্যদের এই লীগের বিরুদ্ধে সাবধান করে দেন।

মার্কস বললেন, ল্যাসেল বিশ্বের জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন, কিন্তু জার্মান শ্রমিকদলের আন্তর্জাতিক দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই বলেননি।

ল্যাসেল বলেছেন জার্মান শ্রমিক দল এমন এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সংগ্রাম করবে যে রাষ্ট্র বেতন ব্যবস্থা ও তার লৌহকঠিন নিয়মকানুন এবং যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের উচ্ছেদ সাধন করবে।

একথার সমালোচনা করে মার্কস বলেন, বেতন ব্যবস্থা সম্পর্কে ল্যাসেলের কোন অর্থ নৈতিক জ্ঞান নেই। বেতনভোগী শ্রমিক নিয়োগ ব্যবস্থার উচ্ছেদ হলেই তার আইন কানুনও উঠে যাবে। এটা খুবই সহজ কথা; কিন্তু বেতন ব্যবস্থার প্রকৃত গলদটা কোথায় ল্যাসেল তা ধরতেই পারেননি। আসল কথা হচ্ছে এই যে কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকরা যে পরিমাণ উৎপাদন মালিকদের হাতে তুলে দেয় সে অনুপাতে তাদের শ্রমের দাম হিসাবে খুব কম বেতন তারা পায়। এই বেতন তাদের কোন রকমে জীবন ধারণের

উপযোগী। এই জীবিকার জন্য শ্রমিকদের শিল্পমালিক ও পুঁজি-পতিদের দাসত্ব করতে হয়। সব পুঁজিপতি ও শিল্পমালিকের লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের বেশী খাটিয়ে কি করে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা যায়, কি করে বেশী লাভ করা যায়। সুতরাং উৎপাদন ব্যবস্থা যতই উন্নত হোক, শ্রমিকদের সামাজিক উৎপাদন শক্তি যতই বাড়ুক, তারা বেতন কম বা বেশী যাই পাক, বেতনভোগী শ্রমিক এক ধরণের ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মনে হয় বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের প্রভাবে পড়ে ল্যাসেল বেতনের উপর দিকটাকেই শুধু দেখেছেন, তার আসল স্বরূপটাকে দেখতে পাননি।

মোট কথা দাসত্বের অবসান চাই। ক্রীতদাসের মালিকরা যেমন তাঁদের দাসদের কোনরকমে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন, শিল্প-পতিরাও তেমনি তাঁদের বেতনভোগী শ্রমিকদের সবচেয়ে কম বেতন দিয়ে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ল্যাসেলপন্থীরা গোথা প্রোগ্রাম রচনার সময় একটুও দৃঢ়তা বা বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেননি। এ প্রোগ্রামে তাঁদের আপোষমূলক মনোভাব এবং একটা সংগ্রামবিমুখ দুর্বলতা প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে সর্বত্র।

আর একটা ভুল করেছেন ল্যাসেল। তিনি বলেছেন সব রকমের সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্যের উচ্ছেদসাধন করতে চান। কিন্তু কথাটা ঠিক বলা হয়নি। কারণ যে শ্রেণীবৈষম্য হতে যত সব সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য জন্ম নেয়, উচ্ছেদ করতে হবে সেই বৈষম্যের।

মার্কস ঠাট্টা করে বললেন, বলিহারি ল্যাসেলের কল্পনাশক্তি। তিনি সরকারী বা রাষ্ট্রীয় সাহায্যে বা ঋণের মাধ্যমে শ্রমিকদের সমবায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এইভাবে তিনি সরকারী সাহায্যে অর্থাৎ প্রচলিত রাষ্ট্রের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন সমাজে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর

একনায়কত্ব বা অবিসংবাদী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় একমাত্র সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের মাধ্যমে, কারো কাছ থেকে ভিক্ষে করা দয়া দাক্ষিণ্যের মাধ্যমে নয়। প্রথমে সামাজিক স্তরে ও পরে জাতীয় স্তরে সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলে শ্রমিকরা যদি উৎপাদন ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে চায় তাহলে তা কখনই রাষ্ট্রীয় ঋণের মাধ্যমে সম্ভব হবে না।

তারপর আসে ল্যাসেলের স্বপ্নে দেখা স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা। ল্যাসেল বলেছেন, জার্মান শ্রমিক দল স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রটা কি? বর্তমান সমাজের কথা আগে না বলেই রাষ্ট্রের কথা বলেছেন ল্যাসেল। আজকের সব রাষ্ট্রই সমাজের বুক চেপে দাঁড়িয়ে আছে। সমাজের উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্বকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু "Freedom consists in converting the state from an organ superimposed upon society into one completly subordinate to it." অর্থাৎ রাষ্ট্রকে সমাজের উপর চাপিয়ে না দিয়ে রাষ্ট্রকে সমাজের সম্পূর্ণ অধীনস্থ করে তোলার মধ্যেই আছে প্রকৃত স্বাধীনতা।

আজকের সব সমাজই অল্পবিস্তর পুঁজিবাদী। বর্তমানে পৃথিবীর সব সভ্য দেশের সমাজই মূলতঃ পুঁজিবাদী রয়ে গেছে। আর বর্তমানে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই তাদের আকারগত পার্থক্য সত্বেও এই পুঁজিবাদী সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পুঁজিবাদী ধাচে গড়ে ওঠা বুর্জোয়া সমাজের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে স্বাধীন করতে হলে আগে সমাজ থেকে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া প্রভুত্ব দূর করতে হবে।

এখন কথা হচ্ছে সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অবস্থা কি হবে? তখন রাষ্ট্রের সামাজিক কর্তব্যই বা কি দাঁড়াবে? এ বিষয়ে ল্যাসেলপন্থী প্রোগ্রামে কোন কথাই বলেননি। আগেই বলা হয়েছে, পুঁজিবাদী আর সাম্যবাদী সমাজের মাঝখানে বিরাজ করে এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের যুগ। এ যুগ বড় রকমের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

পরিবর্তনের যুগ। এ যুগে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রে।

প্রোগ্রামে এসব কথা কিছু বলা হয়নি। রাজনৈতিক দাবীর দিক থেকে বলা হয়েছে শুধু গণতন্ত্রের কথা, যে গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রের মধ্যেই স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখে। তবে অবশ্য গণতান্ত্রিক সাধারণ-তন্ত্রই বুর্জোয়া সমাজের শেষ স্তর। কারণ এই স্তরেই শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র ও চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

এর পর মার্কস সর্বহারাদের একনায়কত্ব বলতে কি বোঝেন তা ব্যাখ্যা করেন।

সাম্যবাদী সমাজ কখনও পুঁজিবাদের পেট থেকে একবারে হঠাৎ বেরিয়ে আসে না। পুঁজিবাদ আর সাম্যবাদের মাঝখানে আছে সমাজতন্ত্রবাদ যেটা হচ্ছে সাম্যবাদের নিম্নতন স্তর। এই সমাজতন্ত্রবাদের স্তরেই সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজে। এ যুগ হচ্ছে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের যুগ। বৈপ্লবিক রূপান্তরের যুগ।

সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব খুব সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সামাজবিপ্লব সফল হলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ হয় আর তার ফলে সমাজের যাবতীয় উৎপাদনব্যবস্থার উপর বিপ্লবী সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের ফলে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা আগেকার রাষ্ট্র হতে একেবারে আলাদা। আগেকার সব রাষ্ট্রই ছিল শ্রমিকশোষণের যন্ত্র। এই সব রাষ্ট্র শ্রমিকদের শোষণ করতে সমাজে শোষক শোষিতের বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে এসেছে প্রতিক্রিয়াশীলদের। কিন্তু সর্বহারাশ্রেণী ক্ষমতা হাতে পেয়েই সব মেহনতী মানুষের সাহায্যে পুঁজিবাদকে একেবারে ধ্বংস করে প্রতিক্রিয়াশীলদের সব চক্রান্তকে ব্যর্থ করে শ্রেণীহীন শোষণহীন এক নতুন সমাজ গড়ে তোলে।

পরবর্তীকালে লেনিন সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে শহরাঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, শহরের কল কারখানার শ্রমিকরাই পুঁজিবাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য শ্রেণীসংগ্রামে দেশের সব শোষিত মেহনতী মানুষদের নেতৃত্ব দান করবে।

শ্রেণীসংগ্রামে জয়ী হয়ে শ্রমিকশ্রেণী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করলেই কিন্তু শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়ে যায় না, শ্রেণীসংগ্রামের সম্পূর্ণ অবসান হয় না। কারণ শ্রেণীসংগ্রামে পরাজিত বুর্জোয়ারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব হারিয়ে ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। যে কোনভাবে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেবার তারা সুযোগ খুঁজতে থাকে। শ্রমিকদের উপর আঘাত হানবার চেষ্টা করতে থাকে মরিয়া হয়ে। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের এই হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয় শ্রমিকশ্রেণীকে। তবে বুর্জোয়াদের সঙ্গে অনর্থক সংগ্রামে মেতে ওঠা তাদের মোটেই লক্ষ্য নয়, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো সমাজবাদী অর্থনীতির পাকা কাঠামো দিয়ে তৈরি এক নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা। এর জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী তারা লড়াই করে না।

লড়াই করাটাই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের একমাত্র লক্ষ্য নয়। কারণ এই একনায়কত্বের গঠনমূলক দিকটাই হলো সবচেয়ে বড় কথা পরবর্তীকালে লেনিন এই গঠনমূলক দিকটির উপর জোর দিয়ে বলেন, The dictatorship of the proletariat is not the only use of force against the exploiters, and not even mainly the use of force. The proletariat represents and creates a higher type of social organisation of the labour compared with Capitalism. This is the essence. This is the source of the strength and guarantee of the inevitable complete triumph of Communism.

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব মানেই এক জোড়ালো শ্রমিক সংগঠন যা পুঁজিবাদী সমাজে সম্ভব নয়। এই সংগঠনই সাম্যবাদের চূড়ান্ত জয়ের পথে চালিয়ে নিয়ে যায় মেহনতী মানুষকে, তাদের অবিরাম প্রেরণা যোগায় সফল না হওয়া পর্যন্ত।

সর্বহারাদের একনায়কত্ব মানে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অন্যান্য মেহনতী মানুষ বিশেষ করে কৃষক শ্রেণীর কোন স্থান থাকবে না তার মধ্যে। বরং সংগ্রামের আগে ও পরে সব সময়ের জন্যই শ্রমিকশ্রেণী কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করে চলে। তাদের সহযোগিতা ছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয় একা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে। তবে অবশ্য এজন্য কৃষকদের লেখাপড়া শিখিয়ে মেজে ঘষে তৈরী করে নিতে হয়।

শহরের শ্রমিকশ্রেণী সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত আর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে তারা বেশী মাত্রায় সচেতন বলে তারা তাড়াতাড়ি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তাদের তুলনায় গ্রাম অঞ্চলের কৃষকশ্রেণী অনগ্রসর আর অল্পশিক্ষিত। গ্রাম অঞ্চলে এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা কৃষকদের মত ছোট ছোট কল কারখানার শ্রমিকরাও অনগ্রসর এবং অপেক্ষাকৃত কম রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য পেটি বুর্জোয়াদের সহযোগিতারও দরকার হয়। তাদের দলে টানতে হয়, কারণ মানসিক শ্রম বিক্রি করে তাদের জীবিকা অর্জন করতে হয় বলে তারাও আসলে শ্রমজীবী।

অনগ্রসর কৃষকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলা আর দেশের সব মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা সত্যিই এক কঠিন কাজ। এ কাজ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিক থেকে কম কঠিন নয়। একাজ কতদূর কঠিন লেনিন নিজে হাতে কলমে করে তা বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন, এ কাজ কঠিন বলেই একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। তাই তিনি বলেন,

What is needed to enable the proletariat to lead the peasants and the petty bourgeois groups in general is the dictatorship of the proletariat, the rule of one class. Its strength of organisation and discipline, its centralised power based on all the achievements of the culture, science and technology of Capitalism, its proletarian affinity of every working person, its prestige with scattered, less developed working people in the County side, or in petty industy who are less firm in politics (Lenin, Selected Works)

একটি মাত্র শ্রেণীর কেন্দ্রীভূত শাসনকর্তৃত্ব, শৃংখলাবিধান ও সংগঠন-শক্তি ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। নতুন সমাজবাদী সমাজ শুধু গড়লেই হবে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে। তার জন্যও দরকার হয় কঠোর সংগ্রামের, যেমন দরকার হয়েছিল ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনের সময়, জার্মান বিপ্লবের সময়।

বুর্জোয়া আদর্শবাদীরা গণতন্ত্রের বড়াই করে। তারা বলে, একমাত্র গণতন্ত্রই সমাজের সকলের স্বাধীনতার সংরক্ষক। সকলের জন্য সকলের দ্বারা গঠিত সকল মানুষের শাসনতন্ত্রই নাকি গণতন্ত্র। তারা বলে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব অগণতান্ত্রিক।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু এর ঠিক উল্টো। বুর্জোয়াদের তথাকথিত গণতন্ত্রে দেখা যায় পুঁজিবাদীদেরই একচ্ছত্র প্রভুত্ব। সেখানে স্বল্পসংখ্যক মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও ধনিকশ্রেণী অগণিত মেহনতী মানুষকে শোষণ করে চলে অবাধে। কার্যতঃ দেখা যায় বুর্জোয়া গণতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার অজুহাতে পুঁজিপতিদের কোন অন্যায় কাজে হস্তক্ষেপ করে না। অন্য দিকে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতী মানুষের স্বার্থকে সব সময় রক্ষা করে চলা হয়। যত সব শোষক, মুনাফাখোর ও

অত্যাচারীর হাত থেকে তাদের বাঁচানো হয়। সুতরাং সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রই সবচেয়ে উন্নত ধরণের গণতন্ত্র।

সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র আবার দুই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পর সেখানকার শ্রমিকশ্রেণী তাদের যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তার নাম দিয়েছিল, 'সোভিয়েত অফ ওয়ার্কারস, পেজেন্টস্ এ্যাণ্ড সোলজারস ডেপুটিজ।' কিন্তু, ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশে আর এক ধরণের সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র আছে তার নাম পিপলস ডেমোক্র্যাসি। এই ধরণের শাসন ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও অন্যান্য সমাজ-বাদী পার্টির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। চীন, বুলগেরিয়া, জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে 'পিপলস ডেমোক্র্যাসি' স্থাপিত হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন পার্টিকে স্থান দেওয়া হয় না। কারণ অক্টোবর বিপ্লবে দেখা যায় অন্যান্য পেটি বুর্জোয়া প্রভাবিত পার্টিগুলি কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা না করে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

মার্কস বললেন, প্রোগ্রামে নারী শ্রমিক নিয়োগের উচ্ছেদ ও স্বাভাবিক কাজের দিনের জন্য দাবী করেও ভুল করা হয়েছে। কারণ এ ধরণের অনির্দিষ্ট দাবী জানানোর কোন অর্থ হয় না। তা না করে কাজের সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে বেঁধে দিতে হত। তাহলে মেয়েরাও কাজ করতে পারে।

এই বছরের মার্চ মাসে এঙ্গেলসও বেবেলকে একখানি চিঠি লিখে গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ ল্যাসেলের বড় বড় গালভরা বুলিগুলোর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আর সব শ্রেণী যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে জার্মানীতে গণতন্ত্রবাদী পেটি বুর্জোয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কেন জার্মান শ্রমিক দল?

দ্বিতীয়ত: বর্তমানে দমনমূলক পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে বেশী মাথা ঘামানো উচিত নয়। এখন শ্রমিকরা আপন আপন দেশে কাজ করে যাবে পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুসারে।

তৃতীয়ত: ল্যাসেল বেতন ব্যবস্থার যে সব লৌহ আইন কানুনের কথা বলেছেন, সেগুলো যে ভিত্তিহীন মার্কস তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। মার্কস তাঁর ক্যাপিটালে দেখিয়েছেন বেতন ব্যবস্থার আইন কানুন অবস্থা অনুসারে পাল্টে যায় ও এক এক সময়ে এক একরকম আইন প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং সে বেতন ব্যবস্থার নিয়মকানুন খুবই স্থিতিস্থাপক। ল্যাসেলের কথা শুনে বুঝতে পারছি, তিনি ম্যালথাস ও রিকার্ডো আবিস্কৃত বেতনের আইনের কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু মার্কস তাঁর ক্যাপিটালের পুঁজি সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনার সময় এ মতকে খণ্ডন করেছেন।

চতুর্থত: সরকারী বা রাষ্ট্রীয় সাহায্যের দাবীও অত্যন্ত অযৌক্তিক। প্রচলিত রাষ্ট্র বা সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায় না।

পঞ্চমত: প্রোগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয়নি। সর্বহারাদের শ্রেণী সংগঠন না হলে তারা পুঁজিবাদীদের সঙ্গে কিভাবে লড়াই চালিয়ে যাবে?

মোট কথা প্রোগ্রামটি তৈরি হয়েছে শুধু ল্যাসেলপন্থীদের খুশি করার জন্য। এতে শুধু কতকগুলি গণতান্ত্রিক দাবী জানানো হয়েছে।

আর একটা কথা। স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবীও একেবারে ভিত্তিহীন। স্বাধীন রাষ্ট্র না বলে বলা উচিত ছিল জনগণের রাষ্ট্র। স্বাধীন রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এমন এক স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র যা খেয়াল খুশি মত কাজ করে চলে, যার সঙ্গে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। এই জনগণের রাষ্ট্র প্যারিস কমিউনের মাধ্যমেই গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তা প্রতিবিপ্লবীরা ব্যর্থ করে দিয়েছে, এখন রাষ্ট্রের কথা বলে

কোন লাভ নেই। তাছাড়া সাম্যবাদী ইস্তাহারে বলে দেওয়া হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে নতুন সমাজ গড়ে উঠলেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন যাবে ফুরিয়ে, যে কথাটাকে মার্কস জার্মান ভাষায় বলেছেন, Sich von selbst auflost শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজবিপ্লবের সময় রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় প্রতিবিপ্লবীদের দমন করার জন্য।

জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্র বলে কোন কথা থাকতে পারে না। কারণ যখন কোন রাষ্ট্রে জনগণের মধ্যে সত্যিকারের স্বাধীনতার পরিবেশ গড়ে উঠবে, যখন কোন প্রতিবিপ্লবের কোন আশঙ্কা থাকবে না, কোন দমনমূলক নীতির কোন দরকার হবে না, তখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন আপনা থেকেই ফুরিয়ে যাবে। তখন রাষ্ট্র পরিণত হবে সমাজে। রাষ্ট্র কর্তৃত্বহীন, শ্রেণীহীন শোষণহীন এই সমাজকে ইংরিজি ভাষায় বলা হয় Comunity জার্মান ভাষায় তাকে মার্কস বলতেন Gemeinwesen আর ফরাসী ভাষায় বলা হয় commune।

এঙ্গেলস চিঠিখানি শেষ করার আগে বললেন, একথা মার্কস আগেই বলেছেন এবং আমিও আবার বলছি, সমস্ত রকমের সামাজিক ও রাজনৈতিক অসাম্য উচ্ছেদের পরিবর্তে সব শ্রেণী বৈষম্যের উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। কারণ সব রকমের সামাজিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়। এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সামাজিক বাধা থাকবেই। আল্পসের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা আর সমতলের অধিবাসীরা কখনই এক হতে পারে না। তবে সে বৈষম্য অনেকখানি কমিয়ে আনতে পারা যায়। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কে ফরাসী ভাবধারা ঠিক নয়। এর মধ্যে ভাবের উচ্ছাসই বেশী। এর উপর সমাজবাদী সমাজ গড়তে চেষ্টা করলে তাতে উল্টো বিপত্তি দেখা দেবে।

বেবেলের কাছে লেখা চিঠিখানিতে এঙ্গেলস শেষকালে আর একটি কথা বলেন। তিনি শেষ কথা জানিয়ে দেন, এই সব

প্রোগ্রাম বা কার্যসূচিগুলি যদি গৃহীত হয় তাহলে মার্কস ও আমার সঙ্গে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির কোন সম্পর্ক থাকবে না। তোমরা হয়ত জান না। বাইরে বাকুনিন লেবনেখট প্রমুখ নেতারা যা কিছু করছেন ও বলছেন তার জন্য অনেকেই আমাদের দায়ী করছেন। সুতরাং প্রকাশ্যে এ বিষয়ে আমাদের অস্বীকৃতির কথাকে জানিয়ে দিতে হবে।

আজ জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণী যদি এই প্রোগ্রাম মেনে নেয় তাহলে বুঝব তারা ল্যাসেলের কাছে নতি স্বীকার করেছে। অবশ্য জার্মান শ্রমিকরা শুধু মানলেই ত হবে না। অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা কি করে বা কি বলে, সেটাও দেখতে হবে। এ প্রোগ্রামে যে সব সমাজবাদের দাবী জানানো হয়েছে, আসলে তা পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দাবী। আমাদের কাছে সম্প্রতি ব্রেকের একখানি চিঠি এসেছে এবং এই গোথা প্রোগ্রামের দাবীগুলি সম্বন্ধে তার মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যদি পার ত গ্রীষ্মের সময় এখানে আসবে। আমার কাছেই থাকবে। তোমাকে নিয়ে তাহলে দু'চারদিনের জন্য সমুদ্রের ধার দিয়ে বেড়াতে যেতে পারি। দীর্ঘদিন জেলভোগের পর তোমার ভাল লাগবে। তোমার শরীর সারবে। ইতি—তোমার ফ্রেডারিক এঙ্গেলস।

১৮৭১ সালে বোল্টকে লেখা একখানি চিঠিতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে মার্কস কয়েকটি মূল্যবান কথা বলেন। তিনি বলেন, যে কোন আন্দোলনে যেখানে শ্রমিকশ্রেণী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে লড়াই করে কিছু না কিছু দাবী দাওয়া আদায় করে সেটাই একদিক দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন। তবে সাধারণতঃ রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য যে আন্দোলন তাকেই বলা হয় আসল রাজনৈতিক আন্দোলন। তা ছাড়া যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি বৃহত্তর সামাজিক তাৎপর্য আছে। এইখানেই অর্থনৈতিক আন্দোলনের

থেকে তার তফাৎ। অর্থনৈতিক আন্দোলন স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে কোন একটি বিশেষ কারখানার শ্রমিকরা যদি কাজের সময় কমাবার জন্য ধর্মঘট করে তখন তা হবে সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু যখন বহু কারখানার শ্রমিক আটঘন্টা কাজের সময় নির্ধারিত করে আইন পাশের জন্য আন্দোলন করে তখন তা হয়ে ওঠে রাজনৈতিক আন্দোলন। এমনি করে অবশ্য যে কোন অর্থনৈতিক আন্দোলনই রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হতে পারে। তবে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনকে জোরালো করে তুলতে হয়।

তবে যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন তেমন জোরালো বা উন্নত নয়, যেখানে শাসকশ্রেণীর সংগঠিত বৃহত্তর শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়, সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে এবং তার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে তুলতে হবে। সব সময় শাসকগোষ্ঠীকে বাধা দিয়ে যেতে হবে। তা না হলে শ্রমিকরা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।

কুড়ি

দাস ক্যাপিটালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি মার্কস। তাঁর মৃত্যুর পরে রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপিগুলি সম্পাদনা করে এই খণ্ড দুটি প্রকাশ করেন এঙ্গেলস। তবু শেষ দিন পর্যন্ত দাস ক্যাপিটালের জন্য অর্থনীতির গবেষণার কাজ চালিয়ে যান মার্কস। চালিয়ে যান ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্ত রকমের ক্লান্তি আর কষ্টকে উপেক্ষা করে।

মার্কস বলতেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ এমনি কষ্ট করেই করতে হয়। ধূপের মত নিজেকে তিলে তিলে ধীরে ধীরে জ্বালানো ও পোড়ানো ছাড়া নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভার সুবাসকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার বিলিয়ে দেবার অন্য কোন পথ নেই।

দাস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের ফরাসী সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস লাসাত্রেঁকে লেখা একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে কোন সোজা বা সহজ পথ নেই। একমাত্র যারা ক্লান্তিকর কষ্টকর চড়াইগুলো একের পর এক করে উঠে যেতে পারে, তারাই একদিন অবশেষে পৌঁছতে পারে আলোকোজ্জ্বল উন্নতির চূড়ায়।

শুধু মুখের কথা নয়, কথার কথা নয়, নিজের জীবনে তাই করে দেখিয়ে দিলেন মার্কস :

দাস ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে ষষ্ঠ অংশে জমির খাজনা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে রাশিয়ায় ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করতে হয়েছে মার্কসকে। যেমন প্রথম খণ্ডে শিল্পের ক্ষেত্রে বেতনভোগী শ্রমিকদের ভূমিকার কথা লিখতে গিয়ে ইংলণ্ডের সেকালের শিল্পব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করতে হয়।

১৮৬১ সালে রাশিয়ার ভূমিপ্রথার সংস্কার হয়। ১৮৭০ সালের পর এ বিষয়ে পড়াশুনো শুরু করেন মার্কস। তাঁর কয়েকজন রুশ বন্ধু কাগজপত্র দিয়ে সাহায্য করেন। তার থেকে তিনি জানতে পারেন, রাশিয়ার জমির মালিকানা প্রথা কি রকমের এবং চাষীদের উপর কিভাবে শোষণ চলে।

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় এঙ্গেলস এক জায়গায় বলেন,

In the seventies Marx engaged in entirely new special studies for this on ground rent. For years he had studied the Russian originals of statistical reports inevitable after the reform of 1861 in Russian and other publications on landownership, had taken

extracts from these originals placed at his disposal in admirably complete form by his Russian friends, and had intended to use them for a new version of this part. Owing to the variety of forms both of landownership and of exploitation of agricultural producers in Russia, this Country was to play the same role in the part dealing with ground-rent that England played in Book 1 in connection with industrial wage labour.

রাশিয়ায় তখন জমির মালিকানা আর কৃষির ক্ষেত্রে শোষণের প্রকৃতি ছিল বিচিত্র ধরণের। জমির খাজনার কথা লিখতে গিয়ে তাই রাশিয়াকেই বেছে নিয়েছেন মার্কস।

দাস ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডটি মোট সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশে আছে কতকগুলি করে পরিচ্ছেদ। সমস্ত খণ্ডটি জুড়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার গতি প্রকৃতির সমগ্র রূপটির কথা আলোচনা করা হয়।

প্রথম অংশে মার্কস দেখিয়েছেন, উৎপাদনব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য কিভাবে মুনাফায় পরিণত হয় এবং এই উদ্বৃত্ত মূল্যের হার পরিণত হয় মুনাফার হারে।

প্রথম অংশে আছে মোট সাতটি পরিচ্ছেদ। অর্থাৎ প্রথম অংশের মূল বিষয়বস্তুটিকে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে মার্কস দেখিয়েছেন কোন উৎপাদনব্যবস্থায় উৎপাদনব্যয় লাভের সঙ্গে সম্বন্ধ কি। শিল্পে উৎপন্ন কোন বস্তুর যেটা বাজার দাম সেইটাই তার উৎপাদনব্যয় নয়। উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্য যোগ করে যা হয় তাই হচ্ছে তার বাজার দাম। ধরা যাক কোন বস্তু উৎপন্ন করতে পাঁচশো পাউণ্ড

পুঁজির দরকার হলো। এর মধ্যে কুড়ি পাউণ্ড লাগল উৎপাদনের উপকরণ বা যন্ত্রপাতির জন্য আর তিনশো আশী পাউণ্ড লাগল কাঁচা মাল কেনার জন্য। বাকি একশো পাউণ্ড লাগল শ্রমিকদের বেতনের জন্য। এরপর বস্তুটি উৎপন্ন হবার পর দেখা গেল উদ্বৃত্ত মূল্যের হার শতকরা একশো পাউণ্ড। সুতরাং এই একশো পাউণ্ড মোট উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে যোগ করে বস্তুটির বাজার দাম ধরা হবে ছশো পাউণ্ড।

এইজন্যই মার্কস বলেছেন কোন বস্তুর Commodity value = Cost price + surplus value. অর্থাৎ শ্রমিকরা উৎপাদনের সময় যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে সেটাই মালিকদের কাছে মুনাফা হয়ে দাঁড়ায়। মার্কস লাভ সম্বন্ধে আরও বলেছেন,

The profit, such as it is represented here, is thus the same as surplus value, only in mystified form that is nonetheless a necessary outgrowth of the capitalist made of production.

আসলে তাহলে দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকের লাভ হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্যেরই এক রহস্যাবৃত ছদ্মরূপ। এই রূপেই তা শ্রমিকদের শোষণ করে চলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মার্কস দেখিয়েছেন, লাভের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়। কোন কারবারে মোট পুঁজির ভিতর উদ্বৃত্ত মূল্যের যে হার, লাভেরও সেই হার। উদ্বৃত্ত মূল্যের হারটাই লাভের হারে পরিণত হয়। মার্কস পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, The rate of surplus value measured against the total Capital is called the rate of profit····The transformation of surplus-value into profit must be deduced from the transformation of the rate of surplus-value in to the rate of profit, not vice versa.

লাভের হারটা কখনও উদ্বৃত্ত মূল্যের হারে পরিণত হয় না, উদ্বৃত্ত মূল্যের হারটাই রূপান্তরিত হয় লাভের হারে। ব্যক্তিগতভাবে সব পুঁজিপতিই তার উৎপন্ন পণ্যকে সবচেয়ে বেশী দামে বাড়তি দামে বাজারে বিক্রি করতে চাইবে, যাতে তার মোট পুঁজিটা ঠিক অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উৎপাদনের খরচা বাদেও বেশ কিছু তার লাভ হয়। কিন্তু সে কাউকে জানতে দেয় না, নিজেও অনেক সময় জানে না যে, তার জিনিষের যে বাড়তি দাম সেটা শ্রমিকের সৃষ্টি উদ্বৃত্ত মূল্য, সেটা শ্রমিকেরই পাওনা এবং শ্রমিককে ফাঁকি দিয়ে সে নিজে লাভ হিসাবে সেটাকে ভোগ করতে চাইছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মার্কস লাভের হারের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের সম্পর্কটাকে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইতিহাসে এইটাই সবচেয়ে ধোঁয়াটে জিনিষ। কারণ উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের লাভের হারের সম্পর্কের উপর একটা আশ্চর্য যবনিকা টেনে পুঁজিপতিরা প্রথম থেকেই ব্যাপারটাকে রহস্যময় করে রেখেছে, আর শ্রমিকদের ঠকিয়ে এসেছে। বিভিন্ন সমীকরণের সাহায্যে মার্কস লাভের হারের সঙ্গে উদ্বৃত্ত মূল্যের সম্পর্কটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই সব অঙ্কের মূল বিষয়বস্তু হলো স্থির পুঁজির সঙ্গে পরিবর্তনশীল পুঁজিকে যোগ করে মোট উদ্বৃত্ত মূল্য দিয়ে ভাগ করলেই লাভের হার পাওয়া যাবে।

$$P' = \frac{S}{c} = \frac{S}{c+v}$$

এখানে p হচ্ছে লাভ, s হচ্ছে উদ্বৃত্ত মূল্য, c হচ্ছে স্থির পুঁজি আর v হচ্ছে পরিবর্তনশীল পুঁজি। আবার এই সমীকরণটি আনুপাতিক নিয়মেও বোঝানো যেতে পারে। যেমন $p' : s = v' : c$

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে পুঁজির বিভিন্ন রকমের রূপান্তর বা পরিবর্তন কিভাবে লাভের হারের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে মার্কস দেখিয়েছেন, স্থির পুঁজিটাকে খাটিয়ে স্থির

রেখে মালিকরা যত বেশী পারে লাভ করতে চায়। এই চাওয়াটা অবশ্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এটা সাধরণভাবেও হতে পারে অর্থাৎ যে বাড়ি বা যন্ত্রপাতিতে স্থির পুঁজি লগ্নী হয় সেগুলোকে যতদিন বেশী খাটিয়ে নিতে চায় পুঁজিপতিরা।

তাছাড়া তারা চায় সব দিক দিয়ে খরচ বাঁচাতে। যেমন তারা কারখানার বাড়ি মেরামত করতে চায় না, যন্ত্রপাতি পুরনো হলেও পাল্টাতে চায় না। শ্রমিকদের কম মাইনে দিয়ে বেশী খাটিয়ে নিতে চায়। তার উপর শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা ও স্বাস্থ্যের দিকে কোন নজর দেয় না। বিশেষ করে কলিয়ারি অঞ্চলে কয়লা খনিগুলির অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। সেখানে খনির মালিকরা খনিশ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তার কথা একবারও ভেবে দেখে না।

১৮২৯ সালে ইংল্যাণ্ডে কয়লা ও অন্যান্য খনি ও খনিশ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে এক সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে স্পষ্ট বলা হয়, খনির মালিকদের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা চলেছে। এমত অবস্থায় মালিকরা কোনরকমে কাজ চালানোর জন্য যেটুকু দরকার তার বেশী একটা পয়সাও খরচ করে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষেত-মজুরদের থেকে বেতন সামান্য কিছু বেশী পায় বলে বহু গরীব লোক কাজের জন্য ভিড় করে কয়লাখনিতে।

১৮৬০ সালে খনিশ্রমিকদের মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন কলিয়ারিতে তখন সপ্তায় গড়ে পনের জন শ্রমিকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। ১৮৬২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কয়লা খনির দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত দশ বছরের মধ্যে মোট ৮৪৬৬ জন কয়লাখনি শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা যায়। তাছাড়া অনেক দুর্ঘটনার কথা চেপে রাখা হত।

বিভিন্ন কল কারখানাতেও শ্রমিকদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে ফ্যাক্টরী ইন্‌সপেক্টর লিওনার্ট হর্ণার এক রিপোর্টে বলেন, কল কারখানায় শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এমন

কিছু ব্যয়বহুল নয়। তা সত্ত্বেও মালিকরা কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন না। মালিকদের অবহেলা ও ঔদাসিন্যের ফলে কল কারখানায় দুর্ঘটনা বেড়েই যাচ্ছে।

এজন্য ফ্যাক্টরী ইনসপেক্টরদের তৎপরতায় মালিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য এক কারখানা আইন পাশ করে কারখানার মধ্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে তাদের বাধ্য করা হয়। কিন্তু তখন কারখানার মালিকরা এক ইউনিয়ন করে নিজেদের মধ্যে চাঁদা আদায় করে এই আইনের বিরোধিতা করে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা, আইনের কথা মানতে যত না খরচ হত, তার বিরোধিতা করতে আরও বেশী খরচ হলো।

অবশেষে প্রতিক্রিয়াশীল মালিকচক্রেরই জয় হয়। ক্রমাগত দশ বছর ধরে আন্দোলন করে ১৮৫৪ সালে তারা সফল হয়। এই বছর পার্লামেণ্টে এমন এক আইন পাশ হয় যে আইনে কারখানার মালিকদের স্বার্থ পুরোপুরিভাবে রক্ষিত হয়। নিরাপত্তার ব্যবস্থা থেকে শ্রমিকরা বঞ্চিত হয়। শুধু ঠিক হয়, কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিকরা আহত হলে তাদের পরিবারবর্গ ক্ষতিপূরণ পাবে।

যাই হোক, কত খরচ কমিয়ে কত বেশী উৎপাদন করা যায় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এইটাই মালিকদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এর জন্য যত দিকে যে ভাবে সম্ভব তারা মিতব্যয়িতার পরিচয় দেবেই। নানারকম যন্ত্রপাতি ও নতুন নতুন কলকব্জার উদ্ভাবনাও তাদের উৎপাদনব্যয় অনেক কমিয়ে দেয়।

এর পর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দ্রব্যমূল্যের ওঠানামার কথা আলোচনা করেছেন মার্কস। তিনি দেখিয়েছেন কাঁচা মালের দাম ওঠা নামা করলেই লাভের হারের উপর তার প্রভাব পড়বেই। ১৮৪৫ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে তুলোর খুব সংকট দেখা যায়। তুলোর দাম খুব বেড়ে যাওয়ায় তুলা শিল্পের দারুণ ক্ষতি হয়। অনেক কলকারখানা বারো ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে সারা দিনরাতের মধ্যে মাত্র

আট ঘণ্টা করে কাজ চালায়। মালিকদের লাভের পরিমাণ অনেক কমে যায়।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলেও তুলাশিল্পের ক্ষতি হয়। কোন কাঁচা মালের মহার্ঘতা দেখা দিলেই সেই মালের উপর নির্ভরশীল শিল্প বা উৎপাদনব্যবস্থা ব্যাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ফ্যাক্টরী ইন্‌সপেক্টরের এক রিপোর্টে দেখা যায়, তুলা শিল্পের অনেক শ্রমিক বেতন খুব কম পাওয়ায় কাজ ছেড়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ করছে অথবা পাথর ভাঙ্গার কাজ করছে।

এমন কি যে সব কারখানায় পুরো কাজ হত সেই সব কারখানার মালিকরা মন্দাবাজারের মিথ্যা অজুহাত দেখিতে শ্রমিকদের খুব কম বেতন দিত। একেই আগে এমনিই কম বেতন দেওয়া হত শ্রমিকদের, তার উপর সংকটের অজুহাত দেখিয়ে এখন তার দশ ভাগ কমিয়ে দেয়া হলো। কেউ কোন প্রতিবাদ করলেই তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হত। লোক দেখানো রিলিফ কমিটি করে মালিকরা এই ছাঁটাইএর কাজের ভার তার উপর ছেড়ে দেয়।

মার্কস এ প্রসঙ্গে স্তব্য করেন, The whole bourgeoisie stood guard over the labourer. Were the worst dog's. wages offered, and a labourer refused to accept them, the relief Commitee would strike him from its lists. It was in a way golden age for the manufacturers for the labourers had either to starve or work at a price most profitable for the bourgeoisie.

এইভাবে দেখা যায় শিল্পে কোন মন্দা বা সংকট দেখা দিলেই বুর্জোয়া পুঁজিপতিরা সে সংকটকে পুরোদমে শ্রমিক শোষণ ও লাভের অঙ্ক বাড়ানোর কাজে লাগাবে। শ্রমিকদের অভাবের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকাবে। কারণ তারা জানে লাভের অঙ্ক বাড়াবার এইটাই সবচেয়ে সোজা পথ। শ্রমিকরা গরীব, একেবারে নিঃস্ব সর্বহারা,

তারা কম মাইনে নিয়ে বেশী সময় খাটতে বাধ্য হবে। তা না হলে তাদের না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে এই সব বিষয়েই কিছু বাড়তি আলোচনা ও মন্তব্য আছে।

এরপর শুরু হয় দ্বিতীয় অংশ। এই অংশে আছে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয় অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে মার্কস দেখিয়েছেন উৎপাদনব্যবস্থার বিভিন্ন শাখায় কিভাবে পুঁজির গঠনপ্রকৃতিও বিভিন্ন হয় আর তার ফলে লাভের হারের মধ্যেও তারতম্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখায় যত পার্থক্যই থাক, একটা বিষয়ে মিল আছে সব শাখায় আর তা হলো শ্রমিকশোষণ। অর্থনীতি-বিদ এ্যাডাম স্মিথও একথা স্বীকার করেছেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় বিভিন্ন রকমের উদ্বৃত্ত মূল্য ও লাভের হার প্রচলিত আছে। কিন্তু সব দেশের সব পুঁজিবাদী শিল্পের ক্ষেত্রেই বেশী লাভের জন্য শ্রমিকশোষণের নীতি ঠিকই আছে। পুঁজির গঠনপ্রকৃতি ও পরিমাণে পার্থক্যের জন্যও লাভের হারের কম বেশী হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মার্কস দেখিয়েছেন, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি ভাবে গড়পড়তা একটা লাভের হার গড়ে ওঠে। পাঁচটি বিভিন্ন উৎপাদনব্যবস্থার তালিকা রচনা করে তিনি দেখিয়েছেন, পাঁচটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ পুঁজি লগ্নী করা হয়েছিল। পাঁচটি ক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বা শোষণের পরিমাণ এক হলেও পুঁজির তারতম্যের জন্য লাভের হারের তারতম্য ঘটে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস লাভের সাধারণ হারের সমীকরণ করে বাজার দাম কিভাবে উদ্বৃত্ত লাভ সৃষ্টি করে তা আলোচনা করেছেন।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস দেখিয়েছেন শ্রমিকদের বেতনের ওঠা নামা কিভাবে উৎপাদিত বস্তুর মূল্যকে প্রভাবিত করে। কোন

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বেতন বাড়লেই সাধারণত মালিকদের লাভ কমবে। কিন্তু মার্কস বলেছেন, সব ক্ষেত্রে তা নয়। কোন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের বেতন যদি শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়ে তাহলে পরিবর্তনশীল পুঁজি বেড়ে যাবে শতকরা আট থেকে দশ ভাগ। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পদ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাবে শতকরা একশো থেকে একশো দুই ভাগ এবং লাভের হারের পতন ঘটবে অর্থাৎ শতকরা কুড়ি হতে কমে হবে চোদ্দ।

তবে এখানেও আবার কথা আছে। যে সব প্রতিষ্ঠানে মাঝামাঝি ধরণের পুঁজি নিয়োগ করা হয়, অর্থাৎ বেশীও নয় কমও নয়, সেখানে শ্রমিকবেতন শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়লেও সেখানে উৎপাদন ব্যয়ের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যেখানে পুঁজির পরিমাণ কম সেখানে উৎপাদিত জিনিষের দাম বেড়ে যায়; কিন্তু ঠিক সেই অনুপাতে কিন্তু লাভের হার কমে না। আবার যেখানে পুঁজির পরিমাণ বেশী সেখানে শ্রমিকবেতন শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়লেও উৎপাদন খরচ বাড়ে না।

পরের অধ্যায়ে মার্কস বলেছেন কোন উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন মূল্য দুভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। শ্রমিকদের মূল্যমান বেড়ে গেলে বা উদ্বৃত্ত মূল্যের হারে কোন পরিবর্তন দেখা দিলে উৎপন্ন বস্তুর দাম বেড়ে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমে যায় অথবা শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে তাহলেও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমে যায়। তূলো থেকে উৎপন্ন সুতোর দাম অবশ্যই কমে যাবে। কাঁচা তূলো আগের থেকে সস্তায় উৎপন্ন হতে থাকে অথবা নতুন যন্ত্রপাতির জন্য শ্রমিকদের উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যায় আগের থেকে।

তৃতীয় অংশে আছে মোট তিনটি পরিচ্ছেদ। এই অংশের প্রথম পরিচ্ছেদে মার্কস বলেছেন, লাভের হার সাধারণতঃ পরস্পরবিরোধী প্রভাবের ফলে কমের দিকেই যায়। দেশের শিল্পব্যবস্থা যত উন্নত হয়,

যন্ত্রপাতি ও শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি যত বেড়ে যায়, মাল যত বেশী উৎপন্ন হয় ততই উৎপন্ন জিনিষের দাম কমে যায়। উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে গেলে মালিক সে দ্রব্য কম দামে বিক্রি করতেও দ্বিধা বোধ করে না। সেখানে তার লাভের হার কম হলেও মাল বেশী উৎপন্ন হওয়ার জন্য পুষিয়ে যায়।

লাভের হারের পতনের ব্যাপারে মার্কস ছয়টি প্রভাবের কথা বলেছেন। এগুলি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকশোষণ অর্থাৎ শ্রমিকদের বেশী খাটিয়ে উৎপাদন বাড়াবার উন্মত্ত চেষ্টা শ্রমশক্তির স্বাভাবিক মূল্যমান থেকে কম বেতন দেওয়া, বাড়ি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থির পুঁজির উপাদানগুলিকে সস্তা করার চেষ্টা, অপেক্ষাকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও পুঁজিবৃদ্ধি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস বলেছেন, লাভের হার কম হওয়ার পিছনে যে সাধারণ নিয়ম কাজ করে তার মধ্যেও কতকগুলি অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য আছে। যেমন উৎপাদনের সম্প্রসারণ ও উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির মধ্যে বিরোধিতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পুঁজিবৃদ্ধির মধ্যে বিরোধিতা প্রভৃতি।

এরপর শুরু হয়েছে চতুর্থ অংশ। এই অংশে আছে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে আছে পণ্য পুঁজি ও অর্থ পুঁজির বাণিজ্যিক পুঁজিতে রূপান্তর। বাণিজ্যিক পুঁজি বলতে মার্কস বলতে চেয়েছেন সেই পুঁজির সেই অংশের কথা যা নিয়ত প্রচলনশীল অবস্থায় বাজারে ঘোরে।

এই বাণিজ্যিক পুঁজির সঙ্গে পণ্য পুঁজি বা উৎপাদক পুঁজির কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। কারণ অনেক সময় অনেক ব্যবসায়ী শুধু বাণিজ্যের জন্যই পুঁজি নিয়োগ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মার্কস বলেছেন, কোন এক ব্যবসায়ী তিন হাজার পাউণ্ড পুঁজি নিয়োগ করে তাতে প্রতি গজ দুই পাউণ্ড দরে তিরিশ হাজার গজ লিনেন কাপড় কিনল। পরে সে এই কাপড় এমন দরে বিক্রি করল যাতে তার সব

খরচ-খরচা বাদে শতকরা দশ পাউণ্ড লাভ হয়। অর্থাৎ এক বছর পর দেখা গেল তার মোট পুঁজি তিন হাজার পাউণ্ড বেড়ে তিন হাজার তিনশো পাউণ্ড হয়েছে।

এর পরের পরিচ্ছেদে আছে বাণিজ্যিক লাভের কথা। এই বাণিজ্যিক লাভের হার উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের থেকে কম।

এর পর আছে বাণিজ্যিক পুঁজির রূপান্তরের কথা। মার্কস বলেছেন, বাণিজ্যিক বা ব্যবসাগত পুঁজি হলো পণ্য পুজিরই এক বিচ্ছিন্ন অংশ। অর্থাৎ যে অংশে পণ্য বাজারে বিক্রিত হয়ে টাকায় পরিণত হয়। এই পুঁজি কোন ব্যবসায় কতবার রূপান্তরিত হবে সেটা নির্ভর করবে টাকার প্রচলনগতির উপর, প্রচলনের মাধ্যমে টাকা কতবার চক্র আবর্তন করবে তার উপর।

বাণিজ্যিক রূপান্তরের সঙ্গে পণ্যমূল্যের কথাও আলোচনা করেছেন মার্কস এই পরিচ্ছেদে। তিনি বলেছেন কোন উৎপাদন-ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যের মূল্য সেই পণ্য উৎপাদনে কী পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত হয়েছে তার দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি বেশী পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে যদি কম পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত হয় তাহলে সে পণ্যের মূল্য কম হয় এবং তার উদ্বৃত্ত মূল্য কম হয়।

তবে শিল্প পুঁজির থেকে বাণিজ্যিক পুজির প্রকৃতি আলাদা।

এর পরের পরিচ্ছেদে অর্থ পুঁজির কথা মার্কস বলেছেন। এই অর্থ পুঁজির একটা অংশ হাতে রিজার্ভ রেখে দেয় কোন জিনিষ কেনাকাটা বা বেতন মেটাবার জন্য। আর একটা অংশ কারবারে খাটাবার জন্য মোটামুটি অব্যবহৃত রেখে দেয়।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন বাণিজ্যিক পুঁজি সম্বন্ধে কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্যের কথা। বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা শুরু হয় ষোল ও সতের সতকে। যখন নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে ও উপনিবেশ স্থাপনে জগতের ভৌগলিক সীমা বেড়ে যায়। ইউরোপের জাতিগুলি এশিয়া আমেরিকা ও আফ্রিকার

বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জুড়ে এক আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি হয় ঠিক তখনই প্রাচীন সামান্তবাদী উৎপাদনব্যবস্থার পতন ঘটে।

আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায় বিভিন্ন ধরণের পণ্যের চাহিদা আর তার ফলে তার উৎপাদন ও প্রচলন বেড়ে যায়। চীন ও ভারতের কৃষি ও কুটিরশিল্প ভিত্তিক প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার জন্য বৃটিশ তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সেখানে সব বাধা অতিক্রম করে বৃহদায়তন পুঁজিবাদী শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়।

মার্কস বলেছেন সামন্তবাদী উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন দুভাবে হতে পারে। এমনও হতে পারে, উৎপাদক নিজেই বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের সম্প্রসারিত বাজার দেখে তার পুরানো কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা ছেড়ে পুঁজিবাদী ও ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল। অথবা এমনও হতে পারে ব্যবসায়ী বা পুঁজিপতি নিজেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে হাত করতে চেয়েছিল।

এর পর শুরু হয়েছে পঞ্চম অংশ। এই অংশের মূল বিষয়বস্তু হলো, লাভকে সুদ ও কারবারী লাভ এই দুই অংশে ভেঙ্গে দেখানো ও সুদবাহী পুঁজি সম্বন্ধে আলোচনা, এই অংশে আছে মোট ষোলটি পরিচ্ছেদ।

এই অংশে প্রথম পরিচ্ছেদে আছে সুদবহনকারী পুঁজির কথা। ধরে নেওয়া হোক, কোন লোক একশো টাকা পুঁজি ভেঙ্গে একটি মেশিন কিনেছে। এই মেশিনে কোন মাল তৈরি করে সে বছরে কুড়ি পাউণ্ড লাভ করে। তার মানে লোকটি মাত্র একশো পাউণ্ড থেকে মোট একশো কুড়ি পাউণ্ড বাড়াবার ক্ষমতা রাখে। এবার লোকটি যদি নিজে কোন কারবার না করে এই একশো পাউণ্ড অন্য কোন লোককে ধরে দেয় তাহলে সেও এর মত এর থেকে বছরে কুড়ি পাউণ্ড লাভ করবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় লোকটি যদি তার লাভ থেকে পাঁচ

পাউণ্ড আসল বাদে দেয় তাহলেও তার পনের পাউণ্ড লাভ থাকে এবং পনের পাউণ্ড লাভ সে করল একেবারে শুধু হাতে কোন পুঁজি খরচ না করে।

এই পাঁচ পাউণ্ড হলো সুদ আর ওই একশো পাউণ্ড হলো সুদবাহী পুঁজি। মোট একশো পাউণ্ডের ব্যবহারিক মূল্যকে পুঁজি হিসাবে খাটিয়ে কুড়ি পাউণ্ড লাভ করার জন্য সেই লাভের একটা অংশকে এই একশো পাউণ্ডের মালিককে দেওয়ার নাম সুদ দেওয়া। তাহলে সুদ হচ্ছে লাভেরই একটা অংশ যে অংশ শিল্পের উৎপাদকরা অর্থ-পুঁজির মালিককে দেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লাভের অংশকে ভেঙ্গে দেখিয়েছেন মার্কস তার মধ্যে সুদের হার ও স্বাভাবিক সুদের হার কতখানি আছে। গড়পড়তা সুদের হার বা স্বাভাবিক সুদের হারকে কোন দেশে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ধারা বেঁধে দেওয়া যায় না। অনেক সময় প্রয়োজনের তাগিদে ঋণকারী দেনাদারের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়। তবে সাধারণত লাভের হার অনুসারেই সুদের হার নির্ধারিত হয়ে থাকে।

এর পরের পরিচ্ছেদে আছে সুদ ও কারবারী লাভের কথা। সুদ-বাহী পুঁজির সঙ্গে শ্রমিকশোষণের কোন সম্পর্ক নেই। কারবারী লাভের সঙ্গে শ্রমিকবেতনের কোন সম্পর্ক নেই; কারবারী লাভের একমাত্র সম্পর্ক শুধু সুদের সঙ্গে। কারণ যে পুঁজি বা পুঁজিপতি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, একমাত্র তারই হাত থাকে শ্রমিকশোষণে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুদবহনকারী পুঁজিকে মূল পুঁজি থেকে বার করে দিয়ে তার গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মার্কস।

এরপর আছে ঋণ ও ফালতু পুঁজির কথা। ব্যাঙ্ক বিভিন্নভাবে ঋণ দিতে পারে, যেমন ব্যাঙ্ক নোট, চেক, ক্রেডিট এ্যাকাউণ্টস বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির মাধ্যমে।

এর পরের পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন, অর্থপুঁজির সঞ্চয় ও সুদের হারের উপর তার প্রভাবের কথা। তিনি বলেছেন, যে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা শ্রমের সঞ্চিত ফলের মাধ্যমে জ্যামিতিক হারে যে উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করে চলে তা উৎপাদকের মধ্যে অর্থপুঁজি সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এনে দেবেই।

এর পরের পরিচ্ছেদে তিনি আলোচনা করেছেন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ঋণের ভূমিকা, এই উৎপাদন ব্যবস্থায় ঋণের ফল অত্যন্ত কলঙ্কিত। তিনি বলেছেন,

The two characteristics imananent in the credit system are, on the one hand, to develop the incentive of Capitalist production, enrichment through exploitation of the labour of others, to the purest and most colossal form of gambling and swindling and to reduce more and more the member of the few who exploit the social wealth ; on the other hand to constitute the form of transition to a new mode of production.

ঋণদান ব্যবস্থার দুটি কুখ্যাত বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্যের কুফল সমাজের উপর সবচেয়ে বেশী। ঋণদান ব্যবস্থা বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থাকে শুধু উৎসাহিত করে না, শ্রমিক-শোষণের মাধ্যমে তাকে উন্নত করে, অলঙ্কৃত করার চেষ্টা করে; মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সামনে প্রতারণা ও জুয়াচুরির এক বিরাট পথ খুলে দেয়, সামাজিক সম্পদকে এনে দেয় কয়েকজনের হাতের মুঠোর মধ্যে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন পুঁজি ও প্রচলনের মাধ্যম এবং এ বিষয়টুকুও ফুলার্টনের দুটি মত তুলে ধরেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোনাই হচ্ছে অর্থের প্রচলনের মাধ্যম। সোনা

হচ্ছে অর্থ পুঁজি ; ধাতব পদার্থ হলেও একে কোনক্রমেই পণ্য পুঁজি বলা যাবে না।

পরের পরিচ্ছেদে ব্যাঙ্কের পুঁজির প্রধান প্রধান অংশের কথা আলোচিত হয়েছে। এই সব অংশগুলি হলো নগদ টাকা, সোনা, নোট, বিল অফ এক্সচেঞ্জ, সরকারী বস্তু, ট্রেজারি নোট প্রভৃতি।

এর পর মার্কস আলোচনা করেছেন প্রকৃত পুঁজি ও অর্থপুঁজির মধ্যে পার্থক্য।

এর পরের পরিচ্ছেদেও এর জের টেনে তিনি আলোচনা করেছেন অর্থের ঋণগত পুঁজিতে রূপান্তরের কথা।

পরবর্তী পরিচ্ছেদেও অর্থ পুঁজি ও প্রকৃত পুঁজির পার্থক্যের কথা আলোচিত হয়েছে। অর্থ পুঁজির চাহিদা ও যোগান অনুসারেই সুদের হার নির্নীত হয়।

পরের পরিচ্ছেদে ঋণদান ব্যবস্থায় প্রচলন মাধ্যম কি তা দেখানো হয়েছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে কারেন্সি নীতি ও ১৮৪৪ সালের ইংল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ক আইনের কথা আলোচিত হয়েছে।

এর পরের পরিচ্ছেদে মূল্যবান ধাতু হিসাবে সোনার যোগ্যতা ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হারের কথা বলা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ১৮ সালের ব্যাঙ্ক আইনের বৈশিষ্ট্য এই যে এই আইন ইংল্যাণ্ডের সমস্ত সোনাকে আন্তর্জাতিক প্রচলনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

এরপর মার্কস প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন। প্রাচীন প্রাক পুঁজিবাদী সমাজে সুদব্যবস্থার দুটি রূপ ছিল। প্রাচীনকালে এক ধরণের লোক টাকা জমিয়ে মানুষকে টাকা ধার দিয়ে সুদের কারবার করত। তারা ধার দিত মাত্র দুটি শ্রেণীর লোককে। অমিতব্যয়ী জমিদার জোতদাররা চড়া সুদে তাদের কাছে টাকা ধার করত আর সুদ আসল শোধ দিতে

না পারলে তার বিনিময়ে কিছু জমি ছেড়ে দিত। এইভাবে আগে বহু জমিদার সামন্ত ধ্বংস হয়ে যায়।

এ ছাড়া ছোট ছোট কৃষি-উৎপাদক ও কুটির শিল্পের মালিকদেরও টাকা ধার দিত সুদের কারবারীরা। আগেকার কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে কোন বৃহৎ শিল্প বলে কিছু ছিল না। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে ছোটখাটো উৎপাদকেরা নিজের হাতে কাজ করত। নিজেদের কোন অর্থ পুঁজি না থাকায় এই সব গরীব উৎপাদকদের টাকা ধার করতে হত সুদখোরদের কাছ থেকে। এইভাবে টাকা ধার নিতে নিতে একান্ত সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

মধ্যযুগে সুদের কারবার এমন বেড়ে যায় যে লোকে এটা খারাপ বলে মনেই করত না। চার্চের থেকে সুদ নেওয়ার প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও জমি বা কোন কিছু বন্ধক রেখে সুদে টাকা ধার নেওয়া হত। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে গোপনে সুদের কারবার ঠিকই চলত। ১৫৪০ সালে জার্মানীর ধর্মসংস্কারক মার্টিন লুথার উইটেনবার্গে একবার দুঃখ করে বলেন, Fifteen years ago I took pen in hand in usury when it hand speard so charmingly that I could scarcely hope for any improvement. Since then it has become so arrogant that it begins not to be classed as vice, sin or shame, but achieves praise as pure virtue and honour, as though it were performing a great favour aud Christian service for the people.

লুথার পনের বছর ধরে সুদব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখালেখির মাধ্যমে আন্দোলন করেও তার উচ্ছেদ সাধন করতে পারেননি ; বরং তা আরও বেড়ে যায়। সুদ নেওয়াটাকে আর কেউ পাপ বা লজ্জার কাজ বলে মনে করে না, উল্টো সম্মানের কাজ বলে মনে করে। মনে করে এর মধ্য দিয়ে যেন জনগণের সেবা করছে।

১৮৫১ সালে লণ্ডনে নিউম্যান ব্যাঙ্কের ঋণদান প্রথার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, সুদখোর ও ব্যাঙ্কের মালিকদের মধ্যে তফাৎ কোথায়? তফাৎ শুধু এই যে ব্যাঙ্কের মালিকরা ধনীদের টাকা ধার দেয় আর সুদখোররা গরীবদের ধার দেয়।

কিন্তু মার্কস বলেন, সুদের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া নেওয়ার ব্যবস্থাটা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার তাগিদেই গড়ে উঠেছে। এখানে ধনী গরীবের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ সুদ গরীব ছোট চাষী বা কুটিরশিল্পের মালিক ও বিরাট ভূসম্পত্তির মালিক ধনী জমিদার উভয়কেই সমানভাবে শোষণ করে। প্রাচীনকালে রোমের জনসাধারণ ধনী অভিজাত ও গরীব স্বল্পবিত্ত—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অভিজাতশ্রেণীর লোকদের বলা হত প্যাট্রিসিয়ান আর গরীবদের বলা হত প্লেবিয়ান। প্রাচীন রোমেও সুদের কারবার প্রচলিত ছিল এবং ধনী প্যাট্রিসিয়ানরা গরীব চাষী প্লেবিয়ানদের চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে দিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে ফেলে।

তবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সুদব্যবস্থা ও প্রাচীন প্রাক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করে বিশেষভাবে। ক্রমাগত সুদ ও ঋণের চাপে জর্জরিত হতে হতে ছোট ছোট উৎপাদনের মালিকরা সর্বস্বান্ত হয়ে দিনমজুরে পরিণত হয় এবং নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠলে সেখানে ভিড় জমায় কাজের জন্য।

আগেকার দিনে অর্থপুঁজির মালিকদের কাছে সুদই ছিল একমাত্র শোষণের যন্ত্র। কারণ ঋণের টাকায় আগে যে সব ছোট ছোট উৎপাদকেরা কোন কিছু উৎপাদন করত তারা নিজেদের ভরণ পোষণ বাদে যা কিছু লাভ হত তা সব সুদ হিসাবে তুলে দিতে হত দেনাদারের হাতে। আগে যা সুদ ছিল এখন তাই পরিণত হয়েছে লাভ বা উদ্বৃত্তমূল্যভিত্তিক মুনাফা আর জমির খাজনায়।

প্রাচীন সুদ ব্যবস্থা একটি অবাঞ্ছিত অশুভ ঘটনা হলেও এর দুটি

বৈপ্লবিক তাৎপর্য আছে। সুদব্যবস্থা প্রাচীন ভূমিব্যবস্থার মাঝে ফাটল ধরায়। আর ভূমিব্যবস্থার মধ্যে ভাঙন ধরায় সমাজের যে রাজনৈতিক কাঠামোটা এর উপর দাঁড়িয়ে ছিল সেটাও ধ্বসে পড়ে। সম্পত্তিকেন্দ্রিক সামন্তবাদী প্রভুত্বের দিন শেষ হয়ে আসে।

সুদব্যবস্থার আর একটি বৈপ্লবিক প্রভাব হচ্ছে সম্পত্তির উপর অর্থ ও অর্থ পুঁজির প্রাধান্য স্থাপন। প্রাচীনকালে জমিকে সব উৎপাদনের মূল কেন্দ্র বলে ধরা হত। টাকার চেয়ে ভূসম্পত্তির দাম ছিল মানুষের কাছে বেশী। কিন্তু সুদব্যবস্থা প্রচলিত হবার পর থেকে টাকার টাকা প্রসব করার অমিত ক্ষমতা ধরা পড়ে যায় মানুষের কাছে। তখন থেকে মানুষ টাকার উপর নজর দেয় বেশী। তখন থেকে moneyed wealth independent of landed property বা ভূসম্পত্তিনিরপেক্ষ অর্থ সম্পদকে বেশী মূল্যবান ভাবতে শেখে মানুষ।

এর পর শুরু হয় ষষ্ঠ অংশ। এই অংশের বিষয়বস্তু হলো উদ্বৃত্ত মুনাফার জমির খাজনায় রূপান্তর। এই অংশে মার্কস বলেছেন, উদ্বৃত্ত মূল্যের যে অংশটি জমির মালিক খাজনা হিসাবে পায়, তার কথা। এই অংশটি এগারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদে আছে এক বিস্তৃত ভূমিকা। ভাববাদী জার্মান দার্শনিক হেগেল বলতেন, জমির উপর স্বাধীন ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের আছে। এই প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সুচিত হয়। হেগেলের মতটি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে মার্কস বললেন,

According to this, man as an individual must endow his will with reality as the soul external nature, and must therefore take possession of this nature and make it private property. If this were the destiny of the "individual" of man as an individual, it would follow

that every human being must be a landowner, in order to become a real individual.

জমির উপর মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা সম্বন্ধে মার্কস বললেন, হেগেল যেন বলতে চেয়েছেন জমি ছাড়া ব্যক্তি হিসাবে মানুষের কোন দাম নেই। বাস্তব জগতে জমিই হচ্ছে প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য ও বড় অংশ, তার আত্মাস্বরূপ। এই জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে মানুষ শুধু বাইরের প্রকৃতিকে দখল করছে না বা তার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করছে না, সঙ্গে সঙ্গে সে তার নির্বিশেষ ইচ্ছাশক্তিকে একটি বিশেষ বাস্তব রূপ দান করেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার ব্যক্তিত্বকে বাস্তব জগতে প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে নিজেকে এক বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য মণ্ডিত করে তুলছে।

হেগেলের এই ধারণার সমালোচনা করে মার্কস বললেন, হেগেলের এ কথাকে যদি মেনে নিতে হয় তাহলে প্রতিটি মানুষকে সত্যিকারের ব্যক্তি হিসাবে সার্থক হতে হলে তাকে জমির মালিক হতে হবে। কিন্তু জমির মালিকানা সম্বন্ধে এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এক ধরণের সমাজব্যবস্থার ফলেই জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত কোন দার্শনিক কারণে বা ভাববাদী তাগিদের ফলে নয়। আদিম যুগে সমাজব্যবস্থা ছিল সম্প্রদায় ভিত্তিক; মানুষ তখন ছিল ব্যক্তিত্বহীনভাবে সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে। সমাজের সব জমির উপর ছিল সামাজিক মালিকানা। এই আদিম সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কৃষিকার্যের ব্যাপক প্রসারের ফলে একেবারে যখন ভেঙে যায় তখনই গড়ে ওঠে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সমাজ আর প্রতিষ্ঠিত হয় জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা। বর্তমানে আবার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর মালিকানার মোহ আসছে কমে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে ভূমিব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন।

জমির খাজনাকে ঠিক সুদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না।

জমির খাজনা হচ্ছে সেই টাকা যে টাকা জমির মালিক তার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভাড়া খাটিয়ে বছরে পায়।

মার্কস বলেছেন জমিতে দুইভাবে পুঁজি নিয়োগ করতে পারা যায়। অস্থায়ীভাবে সার প্রভৃতির মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বাড়াবার জন্য অনেক সময় কিছু পুঁজি নিয়োগ করা হয় আবার অনেক সময় খাল কেটে বা খামার বাড়ি তৈরি করেও স্থায়ীভাবে পুঁজি নিয়োগ করা হয়। জমির উপর এইভাবে পুঁজি নিয়োগ করে ও জমিতে বাড়তি ফসল ফলিয়ে যা পাওয়া যায় বা পুঁজির যে সুদ পাওয়া যায় তা হচ্ছে জমির খাজনারই একটি অংশ যে অংশ চাষীরা জমির মালিককে দেয়।

জমির খাজনার হার অতিশয় বাড়িয়ে দিয়ে জমির মালিকরা শোষণ করে প্রজাদের। আয়ার্ল্যাণ্ডে ঠিক তাই হত। সেখানে প্রজারা খাজনা বিলি করা জমিতে দীর্ঘদিন খেটে ও অনেক পুঁজি নিয়োগ করে জমির উন্নতি সাধন করত। কিন্তু জমির মালিকরা খেয়াল খুশিমত যখন তখন জমি থেকে উচ্ছেদ করত প্রজাদের।

এই অন্যায় উচ্ছেদ বন্ধ করার জন্য আইরিশ টেন্যান্সি রাইটস বিল বা আইরিশ প্রজাস্বত্ব আইন পাশের জন্য দাবী জানানো হয়। যদি কোন জমির মালিক কোন প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায় তাহলে সে জমিতে উক্ত প্রজা যে শ্রম ও পুঁজি নিয়োগ করেছে তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে জমিদারকে বাধ্য করা হবে এই আইন বলে।

এই আইন পাশের দাবীকে নস্যাৎ করে দিয়ে পামারষ্টোন রসিকতা করে বলেন, "The house of commons is a house of landed proprietors." অর্থাৎ গোটা হাউস অফ কমন্সটাই ত ভূসম্পত্তিশালী লোকদের বাড়ি।

তার মানে এই যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের সব সদস্যই ছিলেন মোটা

মোটা ভূসম্পত্তির মালিক। সুতরাং জমির মালিকদের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করা এই সব সদস্যদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন সাধারণ মন্তব্যসহ জমির খাজনার তারতম্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

পরের পরিচ্ছেদে জমির খাজনার তারতম্যগত প্রথম রূপটি দেখিয়েছেন মার্কস। রিকার্ডো বলেছেন, Rent is always the different between the produce obtained by the employment of two equal quantities of Capital and labour.

অর্থাৎ সমান পরিমাণ পুঁজি ও শ্রম নিয়োগ করে যে ভিন্ন ধরণের উৎপাদন পাওয়া যায়, খাজনা হচ্ছে সব সময় তারই তারতম্যগত ফল। মার্কস বলেছেন, রিকার্ডো কথাটা বলেছেন ঠিক, তবে এর সঙ্গে 'সমপরিমাণ জমিতে' এই কথাটা জুড়ে দিতে হত।

মার্কস আরও বলেছেন খাজনা সব সময়ই তারতম্যগত। কারণ উৎপাদন ব্যবস্থায় খাজনার কোন স্থায়ী ভূমিকা নেই। পণ্য মূল্য নির্ধারণেও খাজনার কোন স্থায়ী ভূমিকা নেই। বরং পণ্য মূল্যের দ্বারাই নির্ধারিত হয় খাজনার হার।

পরের পরিচ্ছেদে মার্কস জমির খাজনার তারতম্যগত দ্বিতীয় রূপের কথা আলোচনা করেছেন, এই রূপ হচ্ছে জমির গুণগত বা উর্বরতা শক্তিগত তারতম্যের রূপ।

এরপর তিনটি পরিচ্ছেদে মার্কস খাজনার তারতম্যগত রূপের তিনটি পরিণামের কথা বিশ্লেষণ করেছেন। এর প্রথম পরিণাম হচ্ছে উৎপাদনের স্থায়ী মূল্য। খাজনা এক ধরণের উদ্বৃত্ত মুনাফা। কোন জমিতে যে পরিমাণ নিয়োজিত হয় তার দ্বারাই নির্ধারিত হয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দাম।

এর পরের পরিচ্ছেদে মার্কস বলেছেন, একই জমিতে যদি আরও

বেশী পুঁজি নিয়োগ করা হয় তাহলে উৎপাদনের মূল্য আরও কমবে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে তিনি দেখিয়েছেন জমির উর্বরতাশক্তি যদি কম থাকে তাহলে তাতে পুঁজি বেশী নিয়োগ করলেও কোন ফল হবে না; তাতে উৎপাদন মূল্য বাড়বে।

এর পর তিনি দেখিয়েছেন অনুন্নত অনুর্বর জমির খাজনার মধ্যেও আছে তারতম্য।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে তিনি বলেছেন নির্বিশেষ জমির খাজনার কথা। কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে জমির উর্বরতাশক্তির বৃদ্ধি হয়েছে। সেই খাজনারও পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক।

এর পরের পরিচ্ছেদে খনি ও জমির দামের মধ্যে খাজনার যে অংশ আছে সেই অংশের কথা আলোচনা করেছেন। খাজনার হার না বাড়লেও জমির দাম পড়তে পারে। কারণ জমিতে যে পুঁজি নিয়োগ করা হয় সেই পুঁজির সুদ বাড়লে জমির দাম বাড়ে। আবার জমির খাজনার হার বাড়লেও জমির দাম বাড়ে।

মার্কস বলেছেন যেখানে কোন না কোনরূপে খাজনার অস্তিত্ব আছে, যেখানে জমি খনি বা মাছ চাষের পুকুর বা জলপ্রপাত প্রভৃতি প্রকৃতির সম্পদের উপর মানুষ কোনভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করছে সেখানে মানুষ চেষ্টা করবে কত বেশী লাভ সে করতে পারে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে মার্কস পুঁজিবাদী জমির খাজনা সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়মের কথা বলেছেন। এর মধ্যে শ্রমগত খাজনা, অর্থ খাজনা প্রভৃতির কথা আছে।

এর পর শুরু হচ্ছে সপ্তম অংশ। এই অংশে আছে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে আছে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার ত্রয়ী সূত্রের কথা। মার্কস বলেছেন কোন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল সূত্র হলো তিনটি—পুঁজি, জমি ও শ্রম। পুঁজির ভিতর

আছে আবার মুনাফা ও সুদ, ভূমির ভিতর আছে জমির খাজনা আর শ্রমের ভিতর আছে বেতনের কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন প্রতিযোগিতাগত ভ্রান্তির কথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি বিভিন্ন উৎপাদনগত সম্পর্কের কথা আলোচনা করেছেন। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় কোন কিছু উৎপন্ন করতে হলে মানুষকে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের আওতায় আনতে হয়।

এর পর পঞ্চম এবং শেষ পরিচ্ছেদে মার্কস আলোচনা করেছেন পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী বিন্যাসের কথা। এই ধরণের সমাজে আছে প্রধান তিনটি শ্রেণী বিন্যাসের কথা। এই ধরণের সমাজে আছে প্রধান তিনটি শ্রেণী পুঁজিপতি, বেতনভোগী শ্রমিক ও জমিদার।

এইখানেই শেষ হয়েছে মার্কসের দাস ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি। এর পর প্রকাশকালে সম্পাদনা করতে গিয়ে এঙ্গেলস একটি পরিচ্ছেদ পরিশিষ্ট হিসাবে যুক্ত করেছেন। তাতে আছে মূল্য ও মুনাফার হার ও নিয়মের কথা আর আছে ষ্টক এক্সচেঞ্জের কথা।

একুশ

১৮৭৮ সালে জার্মানীর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে সাবধান করে দিলেন মার্কস, পার্টির মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ রয়েছে তার ফলে ভাঙ্গন ধরতে পারে পার্টিতে। আর হলোও ঠিক তাই। অক্টোবর মাসে বিসমার্ক জার্মানী সমাজবাদবিরোধী Anti Socialist Excepti-

onal Law নামে আইন পাশ করতেই মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠল পার্টির মধ্যে। পার্টির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই সমস্যা হয়ে উঠল।

বিভিন্ন পার্টি নেতার কাছে চিঠি পাঠিয়েও হুফবার্গ, বার্নস্টাইন প্রমুখ নেতাদের সুবিধাবাদের নিন্দা করলেন। আবার পার্টির মধ্যে যারা বিপ্লব সম্বন্ধে অসার অর্থহীন বড় বড় কথা বলে তাদেরও নিন্দা করলেন।

জার্মানীর পর ফ্রান্সের দিকে নজর দিলেন মার্কস। ফ্রান্সে তখন গুয়েসদে লাফার্গে প্রমুখ শ্রমিক নেতারা সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলেন। মার্কস গুয়েসদের দলকেই সমর্থন করলেন।

আসল কথা তখন, ফ্রান্স জার্মানী ও ইংল্যাণ্ডে এক দল পেটি বুর্জোয়া ভুলপথে চালিত করছিল শ্রমিকদের। তাছাড়া শ্রমিকদের মধ্যেও তখন ছিল দুটো দল। একদল ভাল মাইনে পেত বলে তাদের জীবনযাত্রার মান একটু উঁচু ছিল; এজন্য তাদের সংসদীয় পথে নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্ররোচিত করা হত। শুধু তাই নয়, তাদের ভুলিয়ে অনেক সময় কতকগুলো বুর্জোয়া পার্টির সঙ্গেও হাত মিলিয়ে চলতে বাধ্য করা হত। তাদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হত। কিন্তু যে সব শ্রমিক খুব কম বেতন পেত তাদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। সুতরাং তারা উচ্চবেতনভোগী ও অপেক্ষাকৃত সংগতিসম্পন্ন শ্রমিকদের মত ও পথকে সমর্থন করতে পারত না।

১৮৭৮ সালে রাশিয়া ও তুর্কীর মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে মার্কস তুর্কীকে সমর্থন করেন। তিনি লেবনেখটের কাছে লেখা একটি চিঠিতে বলেন, আমরা দুটো কারণে তুর্কীদের সমর্থন করি। প্রথম কারণ হলো এই যে তুর্কীর সাধারণ জনগণ ও চাষীদের অবস্থার কথা আলোচনা করে মনে হয়েছে তারা যেন ইউরোপীয় কৃষকদেরই প্রতিনিধি।

দ্বিতীয় কারণ হলো, রাশিয়া যদি হেরে যায় তাহলে তার সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের কাজ খুব দ্রুত হবে।

এই চিঠি লেখার তিন মাস আগে মার্কস সোর্জকে একখানি

চিঠিতে লিখেছিলেন, রাশিয়ার এই সংকট ইউরোপের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। আমি রাশিয়ার অবস্থা সরকারী ও বেসরকারী সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে খুঁটিয়ে দেখেছি। সরকারী সূত্র থেকে কোন তথ্য খুব কম লোকেই পায়। তবে এ বিষয়ে পিটারসবার্গের আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে সাহায্য করেছেন। তাতে মনে হয়েছে, রাশিয়া বিপ্লবের মুখে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেখানে বিপ্লবের পরিস্থিতি পুরোপুরি তৈরি। রাশিয়ার অর্থনীতি, রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী ও রাশিয়ার রাজশক্তির উপর আঘাত হেনে তুর্কীরা রাশিয়ার বিপ্লবকে কয়েক বছর এগিয়ে দিয়েছে। রুশ সমাজ আজ আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক সব দিক থেকে ভাঙ্গনের মুখে।

তবে এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাশিয়ারই জয় হয়। কারণ বিসমার্ক গোপনে রাশিয়াকে সাহায্য করে এবং ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু তুর্কীও একটা ভুল করেছিল বড় রকমের। তাদের দেশের শাসনকর্তা সেরাইল ছিল জারের বন্ধু। সেই সেরাইলের শাসনব্যবস্থা বিপ্লবের মাধ্যমে আগে উচ্ছেদ সাধন না করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত হয়নি।

তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী ও বাকুনিনপন্থীরা সকলেই সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রেণী সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে তীব্র করে তুলতে চাইছিলেন। কিন্তু কারা কোন পথে কাজ করবেন এই নিয়ে ছিল বিরোধ। মার্কসের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার পর বাকুনিনের এ্যানার্কিষ্ট দল কিছুদিন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার বিকল্প হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠল না। শ্রমিকদের তারা কোন পথ দেখাতে পারল না এবং সে কথা শ্রমিকরা বুঝতে পারল। প্রথমে জেনেভা ও ব্রাসেলস্-এ অনুষ্ঠিত দুটি কংগ্রেসই ব্যর্থ হলো। শ্রমিকদের বর্তমান বাস্তব সমস্যাগুলো সম্বন্ধে কোন সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে পারল না।

এদিকে জার্মানীতে বিসমার্ক যে সমাজবাদবিরোধী আইন পাশ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে সেখানে শ্রমিকদল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে যেতে লাগল। মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে এই শ্রমিকদলের আর কোন বিরোধ রইল না। দমনমূলক নীতি হিসাবে বার্লিন ও তার আশপাশের জেলাগুলিতে সামরিক আইন জারি করা হলো। প্রায় ষাট জন সমাজবাদীকে নির্বাসিত করা হলো দেশ থেকে। এই সব নির্বাসিতদের চাকরি ও ভিটেবাড়ি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হলো। আর্থিক সংকটের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসী অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে।

অন্যদিকে ফরাসী দেশের সমাজবাদীদের সঙ্গে সব সময় মতের মিল না হলেও তারা ঠিক কাজ করে যাচ্ছিল। এমন কি জেনি লঙ্গেৎ নামে মার্কসের যে বড় মেয়েটির ফ্রান্সে বিয়ে হয়েছিল, তার সঙ্গেও সব সময় মতের মিল হত না। মার্কস একবার এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন, লঙ্গেৎ হচ্ছে শেষ প্রুধোঁপন্থী আর লাফার্গে হচ্ছে শেষ বাকুনিনপন্থী। ১৮৮২ সালে তিনি লিখেছিলেন, Longuet is the last Proudhonist and Lafargue is the last Bakunist. To the devil with them both.

ওরা উচ্ছন্নে যাক। যা খুশি তাই করুক।

তবে আশার কথা ১৮৭৬ সাল থেকে বিখ্যাত বাগ্মী জুলস গুয়েসদে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ফরাসী দেশে। গুয়েসদে আগে এ্যানার্কিষ্ট ছিলেন। তাঁর ঈগালিতে নামে একটি পত্রিকা ছিল। মার্কসের দাস ক্যাপিটাল প্রথম ফরাসী ভাষায় অনূদিত হলেও খুব একটা গভীরভাবে তা তিনি পড়েননি তবু মার্কসের নীতির সঙ্গে তিনি ছিলেন মোটামুটি একমত।

১৮৭৯ সালে গুয়েসদের দল শ্রমিক কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া তাঁর ঈগালিতে পত্রিকাখানি আবার নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাতে লাফার্গে

নিয়মিত লিখতেন। মার্কস ও এঙ্গেলসও মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন।

১৮৮০ সালে একবার লণ্ডনে আসেন গুয়েসদে। এসে মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে তাঁদের দলের নির্বাচনী কার্যসূচী নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর কর্মসূচী মোটামুটি সমর্থন করেন মার্কস এবং ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মনে করেন।

ইংল্যাণ্ডে মার্কস প্রায় তিরিশ বছর বসবাস করেন এবং কাজ করেন। তবু সেখানকার শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি মার্কসের। সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল পেটি বুর্জোয়াদের হাতে। বুর্জোয়া শিল্পপতি পুঁজিপতিরা টাকা দিয়ে সুবিধা সুযোগ দিয়ে এই সব নেতাদের হাত করে ভোঁতা করে দিয়েছিল সেখানকার শ্রমিক আন্দোলনকে।

কিন্তু রাশিয়ায় দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছিল মার্কসের প্রভাব। তাঁর দাস ক্যাপিটাল অন্য সব দেশের চেয়ে রাশিয়ায় স্বীকৃতি পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী। রাশিয়ার সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক মার্কসের এ বই যত্নের সঙ্গে পড়েছিল। বিশেষ করে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহু ছাত্র উৎসাহিত হয়েছিল এ বই পড়ে। ফলে রাশিয়ায় দিনে দিনে বেড়ে যায় মার্কসের সমর্থকের সংখ্যা। বন্ধুর সংখ্যাও বেড়ে যায় আগের থেকে।

তবে তখন Party of people's will ও Party of Black Distribution নামে রাশিয়ার দুটি রাজনৈতিক দলের উপর বাকুনিনের প্রভাব খুব বেশী ছিল। বাকুনিন বলতেন, রাশিয়ার অনুন্নত কৃষকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে সব জমির সামাজিক মালিকানা।

কিন্তু মার্কসের কথা হলো পশ্চিমের দেশগুলিতে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার আঘাতে ভূমি-ব্যবস্থার যেমন ভাঙ্গন ধরেছে তেমনি ভাবে রাশিয়াতেও ভূমিপ্রথার

পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তারপর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে রাশিয়ার কৃষকরাও অংশ গ্রহণ করবে। অবশেষে রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা জমির সামাজিক মালিকানা লাভ করবে। কিন্তু রাশিয়ার কৃষকরা ঠিকমত উন্নত না হলে এখন তাদের হাতে এই মালিকানা দেওয়া ঠিক হবে কি?

তবে অবশ্য মার্কস এ প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই দিলেন। সাম্যবাদী ইস্তাহারের এক নূতন অনুবাদ প্রকাশিত হলে তার ভূমিকায় মার্কস লিখলেন, রুশবিপ্লব যদি পাশ্চাত্যের শ্রমিক বিপ্লবের সূচনারূপে কাজ করতে পারে তাহলে দুটি বিপ্লবই পরস্পরের সম্পূরক হয়ে উঠবে।

তিনি আরও বললেন রাশিয়ার ভূমি আন্দোলন যদি সফল হয় তাহলে তা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পথ দেখাবে।

রাশিয়ার দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে পার্টি অফ পিপলস উইল দলটিকেই তখন সমর্থন জানালেন মার্কস। কারণ তখন এই দলই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে জারকে ভীত করে তুলেছিল ও অনেকখানি বেকায়দায় ফেলেছিল। এই ভাবে এই দলটি যখন দেশে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে তোলার চেষ্টা করছিল অন্য দলটি অর্থাৎ পার্টি অফ ব্ল্যাক ডিষ্ট্রিবিউশান কোন কাজ না করে শুধু প্রচার করে ফাঁকা কথা বলে কিস্তিমাৎ করার চেষ্টা করছিল। এ দলে প্লেখানভের মত মার্কসবাদী থাকা সত্ত্বেও মার্কস পার্টি অফ পিপলস উইল দলকেই. বিশেষভাবে সমর্থন জানালেন।

এবার ইংল্যাণ্ডেও সমাজবাদী আন্দোলন আগের থেকে একটু বেশী মাত্রায় দেখা দিতে লাগল। ১৮৮১ সালে জুন মাসে সেখানে হিণ্ডম্যানের লেখা একটি ছোট্ট বই প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির নাম ইংল্যাণ্ড ফর অল! তখন ইংল্যাণ্ডে বি'ভিন্ন পেটি বুর্জোয়া, আধা বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীর দল মিলে যে ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন গড়ে তুলেছিল সেই সংযুক্ত সংস্থার নীতি ও কর্মসূচী এই পুস্তি-কাটিতে ছিল।

এই পুস্তিকাটিতে শ্রম ও মূলধনের কথা বলতে গিয়ে হিণ্ডম্যান মার্কসের দাস ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ড হতে মার্কসের বহু ভাবধারার কথা আক্ষরিকভাবে তুলে দেন। কিন্তু এজন্য কোন ঋণ স্বীকার করেননি হিণ্ডম্যান। তিনি মার্কসের নাম বা তাঁর লেখা বই-এর নাম কোনটাই করেননি। তবে পুস্তিকাটির ভূমিকার শেষে শুধু লিখেছিলেন, তিনি এই কাজের জন্য এক বিরাট চিন্তাশীল লেখকের ভাবধারার কাছে ঋণী।

কিন্তু কে এই বিরাট চিন্তাশীল লেখক তাঁর নাম করতে লজ্জা পেয়েছিলেন হিণ্ডম্যান। কারণ তিনি মনে করতেন এবং স্পষ্ট বলতেন, কোন ইংরেজ কোন বিদেশীর কাছ থেকে কোন কিছু শিখতে চায় না।

এই ঘটনায় দুঃখিত হয়ে হিণ্ডম্যানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে :দেন মার্কস। অবশ্য হিণ্ডম্যানকে কোনদিনই বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না তিনি । তাঁর মতে হিণ্ডম্যান ছিলেন একটা ফুটো ঢাক যার কোন সারবত্তা নেই।

এই বছরের ডিসেম্বর মাসে কোন এক ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় মার্কসের জীবন ও চিন্তা সম্বন্ধে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটিতে তখন 'লীডারস্ অফ মডার্ণ থট্' নামে ধারাবাহিক আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছিল, এ আলোচনা ছিল তারই একটি অংশ। ার্কস সম্বন্ধে লিখেছিলেন বেলফোর্ট ব্যাক্স নামে একজন লেখক।

এই আলোচনাটিতে অনেক তথ্যগত ভুল ছিল। তবু লেখাটি পড়ে খুশি হন মার্কস। কারণ লেখাটি পড়ে উন্নাসিক ইংরেজরা অনেক কিছু শিক্ষা পাবে। তাঁর উৎসর্গীকৃত সারা জীবনের সমস্ত শ্রমের অমূল্য ফসল সম্পর্কে সমগ্র ইংরাজ জাতির পক্ষ থেকে এ যেন প্রথম স্বীকৃতি। প্রথম মূল্যায়ন। সুতরাং কিছু তথ্যগত বিকৃতি সত্ত্বেও এদিক দিয়ে লেখাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

লেখাটি দেখে জেনি মার্কসও খুব খুশি হন। তিনি তখন রোগশয্যায় তবু রুগ্ন অবস্থাতেই যত্নের সঙ্গে মার্কস সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের চিন্তাশীলদের ধারণাসম্বলিত এ আলোচনাটি পড়েন। স্বামীর আদর্শে দীক্ষিত, স্বামীর চিন্তায় চিন্তিত, স্বামীর সাহচর্যে গৌরবান্বিত জেনি মার্কস স্বামী সম্পর্কে এই মূল্যায়নে খুশি হন।

আর রুগ্না স্ত্রীর এই খুশি দেখে মার্কস্ নিজেও কম খুশি হননি। সোর্জকে লেখা একখানি চিঠিতে বলেন, আমি লেখাটি পাই ৩০শে নভেম্বর; আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর শেষ দিনগুলি বেশ কিছুটা আনন্দে কাটে এর ফলে। তুমি জান এই সব লেখা পড়তে সে কত ভালবাসে।

নিজের স্বাস্থ্য একরকম ভেঙ্গে গিয়েছিল ১৮৭৮ সাল থেকেই। তখন থেকেই কোন ভারী কাজ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারেননি। তার উপর স্ত্রীর অসুখ চিন্তিত করে তুলেছিল মার্কসকে।

এ অসুখ সামান্য অসুখ নয়। ক্যান্সার। মার্কস জানতেন, জেনি মার্কসও জানতেন এ অসুখ আর কোনদিন সারবে না। তাই ১৮৮১ সালে জেনি একবার জিদ ধরলেন তিনি ফ্রান্সে যাবেন মেয়েদের একবার শেষ দেখা দেখতে। মার্কসের দুই মেয়েরই ফ্রান্সে বিয়ে হয়েছিল।

জেনি মার্কস ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কস শয্যাগত হয়ে পড়লেন ব্রঙ্কাইট ও প্লুরিসিতে। ছোট মেয়ে টুসি ও লেঞ্চেন সেবা করে যেতে লাগল অক্লান্তভাবে। রুগ্ন শয্যাগত মার্কস দম্পত্তির শেষ জীবনের একটি মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকেন টুসি কয়েকটি কথায়।

টুসি বলেন, মা তখন শুয়ে থাকতেন সামনের বড় ঘরখানায়। বাবা থাকতেন পিছনের ঘরখানায়। দুজনেই রুগ্ন, দুজনেই শয্যাগত। সুতরাং দেখা হত না। হওয়া সম্ভব ছিল না। যাই হোক বাবা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। মা তখনও শয্যাগত। সকালের দিকে বাবা

রোজ কোন রকমে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতেন মার বিছানার দিকে। দুজনে কিছুক্ষণ কথা বলতেন। কথা বলতে বলতে কেমন যেন সজীব হয়ে উঠতেন তাঁরা। মনে হত বার্ধক্যের সব বাধা ঠেলে মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন ধূসর জমিগুলোকে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে তাঁরা চলে যেতেন ফেলে আসা যৌবনের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোতে। দেখে কখনও মনেই হত না, রোগ ও বাধর্ক্য জর্জরিত এক পুরুষ মুমুর্ষু এক মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছেন শেষবারের মত।

এইভাবে দুজনের মধ্যে একজনের শেষের দিন ঘনিয়ে এল। ১৮৮১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে মারা গেলেন জেনি মার্কস।

মার্কসের ব্রঙ্কাইট তখনও সারেনি। দুরারোগ্য রোগের উপর এই দুঃসহ শোকের আঘাত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত এসে পড়ল। মন আরও ভেঙ্গে গেল। আর তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল রুগ্ন দুর্বল দেহের উপর।

মার্কসকে সারিয়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে লাগলেন বন্ধুবর এঙ্গেলস। শুধু চেষ্টা নয়, মৃত্যুর ক্রমপসারিত গ্রাস থেকে মার্কসের মহান জীবনকে ছিনিয়ে আনার জন্য লড়াই করে যেতে লাগলেন অক্লান্তভাবে।

ডাক্তার বলল, শুধু ওষুধ ও পথ্য নয়, জলবায়ুর পরিবর্তন চাই। এঙ্গেলস তারও ব্যবস্থা করে দিলেন। ওয়াইট নামে ছোট একটি দ্বীপে চলে গেলেন মার্কস। সঙ্গে সেবার জন্য গেল টুসি আর লেঞ্চেন। তখন ১৮৮২ সালের মার্চ মাস।

মাসখানেক সেখানে থাকার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। তারপর মে মাসে চলে গেলেন আলজিয়ার্সে। সেখানে তখন যেমন ঠাণ্ডা তেমনি বৃষ্টি। জল হাওয়া অত্যন্ত খারাপ। তাই তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন কেনসএ।

বড় মেয়ে জেনি লঙ্গেত্ থাকত তখন ফ্রান্সে। প্যারিসের কাছে আর্জেন্তিউন নামে এক শহরে। জুন জুলাই দুটো মাস তিনি রইলেন

বড় মেয়ের কাছে। বেশ কিছুটা সুস্থতা অনুভব করলেন দেহে মনে।

তারপর ভাবলেন এত দূর যখন এসেছি তখন মেজ মেয়ে লরার সঙ্গেও একবার দেখা করে যাই।

লরা তখন থাকত জেনেভায় লেকের পাশে আর্জেন্তিউন থেকে সোজা লরার কাছে জেনেভায় চলে গেলেন মার্কস। পুরো আগস্ট মাসটা সেখানেই কাটালেন। সেপ্টেম্বর মাস পড়তেই আবার তৈরি হলেন লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্য। তাঁর মনে হলো, এবার তিনি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সেখানে গিয়ে আবার কাজ শুরু করে দিতে পারবেন নতুন উদ্যমে।

লণ্ডনে ফিরে এলেন সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। অক্টোবর মাসটা লণ্ডনেই রইলেন। রোজ তার বাড়ি থেকে তিনশো ফিট উঁচুতে হ্যাম্পষ্টেড হীদে বেড়াতে যেতেন। ওঠানামা করতে ক্লান্তি বোধ করতেন না।

কিন্তু নভেম্বর মাস পড়তেই লণ্ডনে দেখলেন দারুণ ঠাণ্ডা আর কুয়াসা। সর্দির রোগ তাতে আবার বেড়ে যেতে পারে এই ভয়ে আবার ওয়াইট দ্বীপ চলে গেলেন মার্কস। কিন্তু গিয়ে দেখলেন সেখানকার জলবায়ুও খুব খারাপ। আর তার ফলে রোগটা আবার নতুন করে জানান দিল।

ফলে মুক্ত বায়ু সেবনের জন্য বার হতে নিষেধ করল ডাক্তার। ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হলো দিনের পর দিন।

এই সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা অদ্ভুত কথা মনে হত মার্কসের। মনে হত, সারাজীবন ধরে এত খেটেও কিছু করা হলো না। কাজের কাজ কিছুই হলো না। অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে জীবনের অনেক কাজ, অচিন্তিত রয়ে গেছে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক দিক। আর এই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত রোগ যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে শিরায় শিরায় বয়ে যেত মানসিক অতৃপ্তির একটা ঢেউ।

শুধু তাঁর প্রিয় বিষয় রাষ্ট্রিক অর্থনীতি নয়, সমাজবাদ সাম্যবাদ নয়, বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকও হাতছানি দিয়ে বার বার ডাকত তাঁকে। সৃষ্টি করত অপ্রতিরোধ্য আগ্রহ আর বুদ্ধিগত কৌতূহল।

এমন সময় বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ একটা আঘাত পেলেন মার্কস। বড় মেয়ে জেনি লঙ্গেত্ হঠাৎ মারা গেল ১৮৮৩ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে। ওয়াইট দ্বীপের সেই বদ্ধ ঘরের রোগশয্যাতে শুয়ে শুয়েই কথাটা শুনলেন মার্কস। কেমন যেন বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে রইলেন। আঘাতের পর আঘাত তাঁর অনুভূতি শক্তিকে বিকল করে দিয়েছে যেন। তিনি যেন সমস্ত শোক-দুঃখের ঊর্ধে উঠে গেছেন।

ব্রঙ্কাইটের সেই দুরন্ত আক্রমণ বুকে করেই পরের দিন লণ্ডনে ফিরে এলেন মার্কস। বাইরে আর ভাল লাগল না। স্ত্রীর স্মৃতিসিক্ত ঘরে এসে কন্যার মৃত্যুশোকটাকে লঘু করার চেষ্টা করলেন যেন।

জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারি এল। ফুসফুসের এক দিকে একটি ফোড়া হলো। পনের মাস ধরে ক্রমাগত ওষুধ খেয়ে আসছেন। তাই ওষুধ খেয়েও আর কোন ফল পেলেন না। উল্টো ক্ষিদেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তবে ডাক্তাররা একেবারে আশা ছাড়লেন না। কারণ ব্রঙ্কাইট একরকম সেরে গেছে।

মার্কসের নিজেরও মনে হতে লাগল, তিনি এ যাত্রাও সেরে উঠবেন। মায়ের মত অক্লান্তভাবে নিবিড়ভাবে সেবা করে চলেছে লেঞ্চেন। বন্ধুবর এঙ্গেলস প্রতিদিন নিয়মিত খবর নিয়ে যাচ্ছেন। মনে হলো, আবার তিনি সেরে উঠবেন। আবার তিনি কাজ করতে পারবেন।

কেউ না ভাবলেও তবু সেই অপ্রত্যাশিত শেষের দিনটি ঘনিয়ে এল। সেই ভয়ঙ্কর দিনটির একদিন আগে এঙ্গেলস লেবনেখটকে একখানি চিঠিতে লেখেন, মার্কসের মত প্রতিভাধর পুরুষ ইউরোপ ও

আমেরিকার সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনকে আর তাঁর অমূল্য চিন্তার ফসল দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলছেন না, একথা আমি ভাবতেও পারছি না। আজ আমরা যে যা হয়েছি বা যে যা করেছি তা শুধু তাঁর জন্যই সম্ভব হয়েছে। সমসাময়িক শ্রেণীসংগ্রাম আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তা শুধু তাঁর চিন্তা ও কর্মের জন্যই। তিনি না এলে আমরা সবাই একটা গোলক ধাঁধার মধ্যে বিপন্নভাবে ঘুরে বেড়াতাম। সারা জীবন ধরে ব্যর্থতার একটা চক্রকে শুধু আবর্তন করতাম।

সেদিন ১৪ই মার্চ। ১৮৮৩ সাল।

অন্য দিনকার মত সেদিনও বিকালে অর্থাৎ বেলা ঠিক আড়াইটার সময় মার্কসের বাড়িতে তাঁর অসুখের খবর নিতে গিয়েছিলেন এঙ্গেলস। গিয়ে দেখেন লেঞ্চেনের চোখে জল।

এঙ্গেলস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

লেঞ্চেন বলল, আজ একটু রক্ত বেরিয়েছে মুখ দিয়ে। তাতে অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছেন।

এঙ্গেলস লেঞ্চেনকে সাহস দিয়ে বললেন, এতে এত ভাববার কি আছে। ডাক্তারকে জানালেই ওষুধ দিয়ে রক্ত বন্ধ করে দেবে। তুমি যাও, দেখে এসোগে এখন কেমন আছেন।

লেঞ্চেন উপরের ঘরে চলে গেল মার্কস যে ঘরে থাকতেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে লেঞ্চেন বলল, উনি চেয়ারে বসে রয়েছেন। তবে কেমন যেন একটা ঝিমুনির ভাব রয়েছে। আপনি উপরে গিয়ে দেখুন।

সঙ্গে সঙ্গে উপরের ঘরে চলে গেলেন এঙ্গেলস। গিয়ে দেখেন মার্কসের অসার দেহটি চেয়ারের উপরেই ঢলে পড়েছে। ঘরের ভিতর ঢুকে তাড়াতাড়ি হাতের নাড়ী টিপে দেখলেন এঙ্গেলস, নাড়ীর স্পন্দন গেছে একেবারে থেমে, শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে না। যে দু মিনিটের জন্য

নিচে নেমে এসেছিল লেঞ্চেন সেই দু মিনিটের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন মার্কস। অথচ দেখে তা বোঝাই যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল চুপচাপ বিশ্রাম করছেন অথবা নিশ্চলভাবে কিছু ভাবছেন। আগে যেমন ভবতেন দুনিয়ার সর্বহারাদের কথা, তেমনি আজও তাই ভাবছেন। বিশ্বগত দুঃখবোধের এক বিশাল সমুদ্রে নিঃশেষে নিঃশব্দে তলিয়ে গেছে যেন মন প্রাণ আত্মা।

এঙ্গেলসের মনে হলো যে উদ্বেগ আর অন্তর্বেদনার ভারী আর কালো পাথরটা এতদিন তাঁর বুক চেপে বসেছিল সেটা গলে জল হয়ে গেল এইমাত্র। যতদিন অসুখে ভুগছিলেন মার্কস ততদিনই ভয়ঙ্কর ভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন তাঁর জন্য। আজ তাঁর বুকটা হালকা হলো।

শোকের বিহ্বলতায় কেটে গেল গোটা একটা দিন। ১৫ই তারিখে সন্ধ্যেবেলাই কয়েকটি দরকারী চিঠিপত্র লিখলেন এঙ্গেলস। সোর্জকে লিখলেন, গত ছয় সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সকালে বড় রাস্তা থেকে মার্কসের বাড়িটা দূব থেকে ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করতাম আমি। তাঁর ঘরের জানালার খড়খড়িগুলো বন্ধ আছে কিনা ভয়ে ভয়ে দেখতাম।

এইভাবে প্রিয়তম রুগ্ন বন্ধুর সম্ভাবিত মৃত্যুর আসন্নতায় সতত সন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাতেন এঙ্গেলস।

কিন্তু যে ভয়াল মৃত্যু আসবে আসবে বলে বড় ভয় ছিল, যার অবাঞ্ছিত আগমনের অলস আশঙ্কায় প্রতিক্ষণে কেঁপে কেঁপে উঠত সারা অন্তরটা, সেই মৃত্যু সত্যি সত্যিই একদিন এসে গেলে নিজের মনের মাঝেই অদ্ভুত এক সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন এঙ্গেলস। আর সেই সান্ত্বনা দিয়ে আরও পাঁচজনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

মার্কসের ঘনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরাগীদের বোঝাতে লাগলেন এঙ্গেলস। বললেন, দেখুন ওষুধ আর চিকিৎসাবিদ্যার কলাকৌশলের দ্বারা আরও কয়েক বছর হয়ত বাঁচিয়ে রাখা যেত আমাদের প্রিয় মার্কসকে। কিন্তু অসহায় ও অকর্মণ্য অবস্থায় সেভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি হত বলুন!

অসমাপ্ত কাজকে ফেলে রেখে বেঁচে থাকা এবং সে কাজ কখনও করতে না পারার অন্তর্বেদনা মৃত্যুর থেকে অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক হত তাঁর পক্ষে।

অবশ্য এপিকিউরাসের মত মার্কস কখনই মৃত্যুর জয়গান গাইতেন না। তিনি কখনও বলতেন না যে মৃত্যু কখনই তার পক্ষে দুর্ভাগ্যের নয়, যারা বেঁচে থাকে মৃত্যুটা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে তাদের কাছেই। যে মৃত্যু জীবনের আরব্ধ কাজকে শেষ করতে দেয় না, আকাংখিত ফলকে লাভ করতে দেয় না সে মৃত্যু অবশ্যই দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের। কিন্তু ভগ্ন ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নিয়ে দুরারোগ্য রোগ নিয়ে অক্ষম দেহমনের ব্যথাহত আশাহত চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকায় কী লাভ? তার থেকে মৃত্যু অনেক ভাল। তার থেকে এই যে আমরা তাঁকে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর সমাধির মাঝে তাঁকে সমাহিত করতে চলেছি এটা অনেক ভাল।

সমাধির দিন ঠিক হলো ১৭ই মার্চ শনিবার। কোন রকম সমারোহ বা জাঁকজমকের ব্যবস্থা করা হলো না। শুধু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো মার্কসের। এঙ্গেলস ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ফ্রান্স থেকে আসা দুই জামাই লাফার্গে ও লঙ্গেত্, জার্মানীর লেবনেখট আর ছিলেন কমিউনিষ্ট লীগের আমল থেকে ঘনিষ্ট দুজন পুরনো কমরেড লেসনার ও লকনার। এছাড়া ছিলেন বিজ্ঞান জগতের দুজন প্রসিদ্ধ লোক—রসায়ন বিদ্যার স্কর্নোমর আর জীববিদ্যার ল্যাঙ্কেস্টার।

মার্কসের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে এক ভাষণ দান করেন এঙ্গেলস। প্রিয়তমকে বিদায় জানান শেষবারের মত। এই সংক্ষিপ্ত বিদায়ভাষণের মাধ্যমেই সমগ্র মানব জাতির কাছে মার্কসের অবদানের গুরুত্বটি সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেন এঙ্গেলস।

এঙ্গেলস তাঁর ভাষণে বলেন, ১৪ই মার্চ বেলা পৌনে তিনটের সময় এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর

মৃত্যুর দুই মিনিটের মধ্যেই আমরা তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি তিনি একা চেয়ারে শেষনিদ্রায় অভিভূত হয়ে রয়েছেন।

এই মহান পুরুষের মৃত্যুতে সারা ইউরোপ ও আমেরিকার সংগ্রামী সর্বহারা শ্রেণী যে ক্ষতির সম্মুখীন হলো তার যথাযথ পরিমাপ এখনই সম্ভব নয়। এই মৃত্যুর ফলে যে বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হয়েছে চিন্তার জগতে তার গুরুত্ব আমরা শীঘ্রই বুঝতে পারব।

ডারউইন যেমন জীব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবর্তনবিধি আবিষ্কার করেন, মার্কস তেমনি আবিষ্কার করেন মানুষের ইতিহাসের বিবর্তন-বিধি। আগেকার আদর্শবাদীরা যে কথাটাকে আমল দেননি সেই সহজ সরল কথাটিকে সকলের সামনে তুলে ধরেন মার্কস। সে কথাটা হলো এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি চর্চা করার আগে মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।

এ কথার মানে এই যে যে পদ্ধতিতে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী এই সব অতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উৎপন্ন হয় সেই পদ্ধতি এবং এক একটি বিশেষ যুগের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তরের উপরেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্মীয় চিন্তা আর সাংস্কৃতিক ভাবধারা সুতরাং কোন দেশের কোন যুগের রাজনীতি, ধর্ম, শিল্প সংস্কৃতি প্রভৃতির গুণাগুণ বিচার ও ব্যাখ্যা করতে হলে সে যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তা করতে হবে। আগে কিন্তু তা করা হতো না। মনে করা হত, মানুষের রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত চিন্তার উপরেই নির্ভর করে কোন যুগের উৎপাদনপদ্ধতি ও সমাজব্যবস্থা।

শুধু তাই নয়। সমসাময়িক যে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা বুর্জোয়া সমাজের জন্ম দিয়েছে সে উৎপাদনব্যবস্থা কোন নিয়মে চলে তাও দেখিয়ে দিয়েছেন মার্কস। তার উপর আবার উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব আবিষ্কার করেন মার্কস। এই তত্ত্বের আলো এমন এক অন্ধকারকে দূর করে যে অন্ধকারের মাঝখানে আগেকার বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও সমাজবাদী চিন্তাশীলরা অসহায়ভাবে হাতড়ে বেড়াতেন।

একটি মানুষের জীবনে এই দুটি বিষ্কারই যথেষ্ট। এমন কি, যে কোন একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার যে কোন মানুষের পক্ষে এক পরম সৌভাগ্যের কথা। মার্কস কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই চিন্তা ও গবেষণা করেছেন। এমন কি, গণিতের ক্ষেত্রেও কয়েকটি স্বতন্ত্র আবিষ্কার আছে তাঁর।

এতক্ষণ আমি বিজ্ঞানের মানুষ হিসাবে মার্কসের একটি কথাচিত্র আঁকলাম। কিন্তু বিজ্ঞানের মানুষ ত গোটা মানুষ নয়; গোটা মানুষের আধখানা। মার্কস মনে করতেন, বিজ্ঞানই হলো ইতিহাসের চালিকা শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি বৈপ্লবিক। তাই তিনি বিশুদ্ধ তত্ত্ব নিয়ে অনেক সময় মাথা ঘামালেও এমন কিছু আবিষ্কার করে আনন্দ পেতেন যা এক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে। এজন্য বিদ্যুৎবিজ্ঞানের প্রতি এবং বিশেষ করে মার্সেল ডেপ্রেৎসের আবিষ্কারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল তাঁর।

কারণ মার্কস ছিলেন মনেপ্রাণে বিপ্লবী। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনের জন্য সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তির জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় ভেবেছেন তারই সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

এই সর্বহারা শ্রেণীকে মার্কসই প্রথম শ্রেণী হিসাবে এর গুরুত্ব দান করেন। তাদের মুক্তির জন্য যে সব অবস্থা ও পরিস্থিতির দরকার তার প্রতিও তাদের সচেতন করে তোলেন। সংগ্রামই ছিল তাঁর জীবন। তাঁর মত এত দূর নিবিড়তা একাগ্রতা ও সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম খুব কম লোকেই করেছেন। ১৮৪২ সালের রাইনিশে ৎসাইটুঙ, ১৮৪৪ সালের প্যারিসের ভোরওয়ার্টস, ১৮৪৭ সালে ডয়েশ্চে ব্রাসেলার ৎসাইটুঙ, ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ সালের নয়ে রাইনিশে ৎসাইটুঙ, ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন, তারপর বহু পুস্তিকা, প্যারিস ব্রাসেলস ও লণ্ডনের সংগঠনমূলক কার্যকলাপ এবং সবশেষে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা তাঁর আপোষহীন অক্লান্ত সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করছে।

এই আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা ছাড়া মার্কস যদি আর কিছু নাও করতেন তাহলেও এই একটিমাত্র কৃতিত্বই গৌরবোজ্জ্বল করে রাখত তাঁর সারা জীবনকে।

যেহেতু মার্কস ছিলেন সব সময় একজন সক্রিয় বিপ্লবী, সেইহেতু অনেক ঘৃণা ও নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। বিভিন্ন সরকার তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দান করেছে। বুর্জোয়া, অতি-গণতান্ত্রিক ও রক্ষণশীলরা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার করেছে। এই সব নিন্দা ও অপবাদকে তুচ্ছজ্ঞান করে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন। শুধু যখন তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেছেন তখনই তার উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু এইসব নিন্দা ও অপবাদ সত্বেও প্রভুত সম্মান ও ভালবাসায় ভূষিত হয়েই মারা গেছেন মার্কস। পূর্বে সাইবেরিয়ান হতে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী আজ শোকাকুল তাঁর মৃত্যুতে। আজ আমি জোর গলায় বলতে পারি যে তাঁর বহু প্রতিপক্ষ থাকলেও তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু একজনও ছিল না।

তাঁর নাম এবং কার্যাবলী শত শতাব্দী কাল ধরে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ভাষণ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শোকের বন্যা নেমে এল এঙ্গেলসের চোখে।

হাইগেট সিমেট্রিতে স্ত্রীর কবরের পাশে সমাহিত করা হয় মার্কসকে। তাঁর সমাধির উপর স্মৃতিস্তম্ভে শুধু লেখা হয়:

জেনি ভন ওয়েস্টফ্যালেন

কার্ল মার্কসের প্রিয়তমা পত্নী

জন্ম: ১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮১৪

মৃত্যু: ২রা ডিসেম্বর, ১৮৮১

কার্ল মার্কস

জন্ম: ৫ই মে, ১৮১৮

মৃত্যু: ১৪ই মার্চ, ১৮৮৩